একুশটি বাংলা গল্প

আদান-প্রদান

একুশটি বাংলা গল্প

সম্পাদক

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

एकः सूते सकलम्

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-0703-7

প্রথম প্রকাশ : 1977 (শক 1899)

ষষ্ঠ মুদ্রণ : 2002 (শক 1924)

প্রচ্ছদ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য কৃত তৈলচিত্র

মূল্য : 40.00 টাকা

Ekushti Bangla Galpo *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর হাতেই ছোটগল্প প্রাণ পেয়েছে। আশ্চর্য বিকাশ লাভ করেছে। ছোটগল্পের সব দিকেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি, সমাজ-সমস্যা, দার্শনিকতা, কাব্যধর্মিতা, রোমান্স, ইতিহাস, ব্যঙ্গ—সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি গল্প লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে বিচিত্র শস্যে সমৃদ্ধ করেন।

বর্তমান সংকলনে আমাদের চেনাকালের ছোটগল্প ক্ষেত্র থেকে গল্পগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ঠিক আমাদের চেনাকালের নন। রবীন্দ্র ও শরৎ-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে গত চল্লিশ বছরের বাঙালী মানসিকতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে। সে কারণে শরৎ পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের পর্ব থেকে সাম্প্রতিক পর্ব পর্যন্ত যে বিচিত্র গল্পসম্ভার, তার থেকেই গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্তী যে পর্ব, তারই নাম কল্লোল-পর্ব। এই পর্বের সময়সীমা ১৯২৩ থেকে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ। কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠীর ছোটগল্প লেখকরা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও ভারতে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন সত্ত্বেও মোটামুটি শান্তি ও সুস্থিতির মধ্যে গল্প লিখতে পেরেছিলেন। এই পর্বেই দেখা দিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), প্রবোধকুমার সান্যাল, ভবানী মুখোপাধ্যায়। *বিচিত্রা* ও *শনিবারের চিঠি*'র পাতায় দেখা দিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, বিমল মিত্র। এই পর্বেই দেখা দিয়েছেন পরশুরাম (রাজশেখর বসু) উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকৌতুক হাস্যরসের গল্প নিয়ে।

কল্লোল-পরবর্তী পর্ব বলতে যে সময়টাকে আমরা বুঝি, তার পূর্বসীমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, উত্তরসীমা স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও দেশবিভাগ (১৯৩২-৪৭)। অল্পবিস্তর

এই দশটি বছর বাংলার সমাজে ও রাষ্ট্রে কালান্তরের পর্ব। মন্বন্তর, বিমান-হানা, কণ্ট্রোল ও রেশনিং, মিলিটারি সাপ্লাই ও কালোবাজার, সমাজজীবনের অধোগতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক মূল্যবোধের বিনাশ, দাঙ্গা স্বাধীনতা, দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু স্রোত—এই পর্বের মধ্য দিয়ে এত সব বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

এই পর্বে যাঁরা গল্প লেখায় হাত দিয়েছেন, সাহিত্যচেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এই আলোড়িত বিপর্যস্ত যুগ সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। এই পর্বের সামাজিক বাতাবরণ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। এই বাতাবরণ তাঁদের দৃষ্টিকে কিছুটা ব্যাহত, তীক্ষ্ণ ও আবিল করে তুলেছে। কল্লোল পর্বের রোমাণ্টিকতা, বোহেমিয়ান মনোভাব ও নোঙরছোঁড় প্রেমের অভিযান এই পর্বের গল্পে অনুপস্থিত। আমাদের সমাজে এই পর্বে পরিবর্তন দ্রুত ও অসংখ্য। সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে কতো ভাঙাগড়া কতো সমস্যা, কতো অসাধারণ ব্যতিক্রম সবকিছু মিলে যে পরিবর্তনের প্রবল প্রবাহ তা গল্পকারের কৌতূহলকে ও বোধশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। সুপ্রচলিত বিধিনিয়ম শিথিল হয়েছে, কতো উৎকেন্দ্রিকতাও অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে, কতো সূক্ষ্ম অতৃপ্তিতে মানুষ পীড়িত, কতো রুচিবিকারে নতুনের স্বাদ প্রত্যাশা, কতো নতুন শপথ আর অঙ্গীকারে জীবনসংগ্রামে নতুন রূপ—যুদ্ধপূর্ব যুগে তা ছিল অচিন্তনীয়। যুদ্ধ এক ভয়াবহ ভূমিকম্প। তার ফলে ভদ্রতার আবরণ, নীতির রক্ষাকবচ, পারিবারিক মানসম্ভ্রম, মায়া-মমতা, আনুগত্য, ধর্মসংস্কার—সবই এই ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়েছে। তারই মাঝে শোনা যায় নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন আর শপথের উচ্চারণ।

এই সব পরিবর্তন যাঁদের ছোটগল্পে আভাসিত হয়েছে, তাঁরা হলেন সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এই সঙ্গে পূর্বাগত যে সব গল্পকারের নাম স্মর্তব্য, তাঁরা হলেন জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ কল্লোলগোষ্ঠীভুক্ত লেখক, এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, বাণী রায়, সুশীল ঘোষ, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বিচিত্রা-শনিবারের চিঠি গোষ্ঠীভুক্ত লেখকরা।

এই কাল-পর্বের পরেই এলো রক্তাক্ত খণ্ডিত স্বাধীনতা। এলো উদ্বাস্তুর স্রোত, এলো ব্যাপকতর সামাজিক ভারসাম্য-বিচ্যুতি। স্বাধীনতার তোরণদ্বারে যে আশা ও আনন্দের বাণী উচ্চারিত হল তাকে ছাপিয়ে উঠলো উদ্বাস্তু আর বঞ্চিতের কান্না। এই বিক্ষুব্ধ রক্তাক্ত স্বদেশভূমিতে দেখা দিলেন নতুন আর একদল গল্পলেখক—সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সৈয়দ মুজতবা আলী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত দেবসরকার, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, রঞ্জন, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখা সান্যাল,

গৌরকিশোর ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, আশীষ বর্মণ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, দীপক চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী ও আরও অনেকে।

এই পর্বে গল্পলেখকরা অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্বের গল্পকারদের সহযাত্রী। বস্তুত এ দুই পর্বের লেখকদের আলাদা করে দেখা যায় না। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—এঁদের সকলেরই জন্ম ১৯১৬ থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনামুহূর্তে কলকাতা তথা বাংলার সার্বিক পালাবদলের উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তে এঁরা যৌবনে পদার্পণ করেছেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এঁরা দাপটের সঙ্গে লিখে চলেছেন। সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের বিচিত্র পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে তিরিশ বছরের (১৯৪০-৭০) মধ্যে লেখা এঁদের ছোট গল্পসমূহ।

বাংলা ছোটগল্পের আর একটা পর্ব এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সঙ্কুচিত হয়েছে। এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত যে তরুণ গল্পকারবৃন্দ, তাঁদের জন্ম হয়েছে ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে। বস্তুত এঁরা নতুন প্রজন্মের লেখক। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, লোকনাথ ভট্টাচার্য, শঙ্কর এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত গল্পলেখক।

এই নতুন প্রজন্মের গল্পকারদের সঙ্গে অব্যবহিত পূর্ব পর্বের গল্প-লেখকদের কোনো মিল নেই। এরা এক নতুন গোষ্ঠী।

এরা আগেকার কিছুই দেখেনি, কোনও উত্তরাধিকারের কৃতজ্ঞতা বা স্মৃতিহীন, এরা জন্ম নিতে বা বাড়তে থাকল ব্লাক আউটে, দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায়, রক্তাক্ত স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, উদ্বাস্তু কলোনিগুলির কিনারে বা বাইরে। পূর্বতন গোষ্ঠীভুক্ত লেখকের দৃষ্টিতে এরা নতুন ব্লাড-গ্রুপ। পূর্বেকার লেখকদের সঙ্গে নেই কোনো আত্মীয়তা। এরা যখন বড় হতে শুরু করেছে যৌথ জীবনের সৌম্য সৌধ ততদিনে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, শ্রদ্ধা ভক্তি এসব খালি শেখানো কথা। নারীপুরুষের সম্পর্ক অন্য রকম, অর্থাৎ মৌল তাগিদগুলো ঠিকই আছে; পুরানো কোনও মায়াবী স্মৃতি নেই। বৈরী বিশ্বে বাস করার জন্যে তারা তৈরি হচ্ছে, কখনোও একজোট হয়ে, বা হবার ভান করে; আসলে এরা আরও বেশি নিঃসঙ্গ, একা, কিছু না হলেও ক্ষুব্ধ সততই, প্রতিকার খুঁজছে অশেষ বিকারে, নতুবা স্নায়ুজ্বরে।

তরুণ গল্পলেখকদের এই রূপে দেখেছেন পূর্ববর্তী প্রজন্মের লেখক। মনে হয় দুই প্রজন্মের লেখকরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। কল্লোল-পর্বের লেখকদের সঙ্গে দ্বিতীয়

বিশ্বসমকালীন লেখকদের মানসিক ব্যবধান; দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ যতটা, তরুণ লেখকদের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বসমকালীন লেখকদের ব্যবধান তার চেয়ে অনেক বেশি। কল্লোলের রোমাণ্টিকতা পরবর্তী পর্বে ছিল না, কিন্তু জীবনে আনন্দ ও মূল্যবোধে শ্রদ্ধা ছিল; আজকের তরুণ লেখকদের তা নেই। এক্ষেত্রে ব্যবধান দুস্তর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য।

ব্যবধান কেবল মানসিকতায় নয়, ভাষায় ও আঙ্গিকে; কেবল জীবনদৃষ্টিতে নয়, জীবনের নানা উপকরণের অভিনব ব্যবহারে। এ থেকে প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথেই বাংলা ছোটগল্পের চরম সিদ্ধি নয়।/বাংলা ছোটগল্প বারবার এগিয়েছে, মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজেছে বারবার, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কখনো ভাঁটা পড়ে নি, জীবনকে নতুন ভাবে দেখার উৎসাহ কখনো ফুরিয়ে যায় নি। কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত মেনে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছোটগল্প নির্বাচনের তাগিদে যে সংকলন করেছি তা সকলের মনঃপুত হবে, এমন ভরসা করি নে। কিন্তু যেখানে নানা শর্ত ও সীমারেখা মেনে চলতে হয় সেখানে এছাড়া কোনো পথ নেই। রবীন্দ্র-শরৎ-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের তিন পর্বের গল্পসম্ভার এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী যে কোনো নির্বাচনেই মন ভরে না। তাই পাঠকদের সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার উপায় নেই।

এই ছোট গল্প সংকলন থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপালের দুটি গল্প (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আহ্বান' আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা') শেষ মুহূর্তে বাদ দিতে হল, কারণ বছর খানেক চেষ্টা করেও এঁদের কপিরাইট সমস্যার কোনোমতেই সমাধান করা গেল না। আশা করি পাঠকসমাজ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৭১) শরৎচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্যের অধিনায়ক। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য : 'মাটিকে এবং মানুষকে ও জানে, এর সঙ্গে ওর যোগ আছে। এই যোগ বাইরের নয়, একেবারে অন্তরের।' রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ও সাহিত্য আকাদেমির ফেলো ছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত লেখক।

শেষ কথা

লাট ভরতপুর, পরগনে পূর্বচক, সম্পত্তিটা খুব বড় সম্পত্তি। গাছের পাতা কুলোর মতো, ডাল ঢেঁকির মতো; ঘষা হরিচন্দনের মতো মোলাম মাটি—গায়ে মাখলে গা জুড়িয়ে যায়, ফসলের বীজ পড়বার অপেক্ষা—দেখতে দেখতে ফসলে ভরে যায় মাঠ। তা ছাড়া ভরতপুরে না পাওয়া যায় কী? সোনার সম্পত্তি কথাটাও কথার কথা নয়। আগে লোকে নদীর বালি থেকে সোনার দানা বের করত। মাটির তলায় সত্যিই সোনা আছে। প্রজারা সব বেকুবের দল। চাষ করে খায়, মার খেয়ে হাসে, বলে, তুমি কি আমার পর? পরণে ঠেঁটি কাপড়, কপালে তিলক-কাঁটা, গলায় তুলসীমালার কণ্ঠী, কালো রঙ। এ থেকেই বেকুবত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। চাষ করে যায়। চাষীর দল সব। জমিদারপক্ষ বলে, চাষা। আগে, খেত দেত চাষ করত, তামাক টানত, পূজা-অর্চনা করত, ঘুমুত। এখন আর সে কাল নাই, কলি বোধহয় চারপো পুরা হয়ে উঠেছে, তারই ফলে আজকাল আধপেটা খায়, রোগে হাঁপায়, কোনো রকম চাষ করে, ভগবানকে কেউ-কেউ ডাকে, কেউ ডাকে না, অর্থাৎ কেউ কাঁদে, কেউ বসে বসে দাঁত খিঁচোয়।

পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন ভরতপুরের জমিদার। আগে ছিল, মঙ্গলকোটের মিঞাদের জমিদারি। সাউ মশায়েরা তখন এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। মিঞাদের ঘরোয়া ঝগড়া বাধলে, এক পক্ষ সাউদের কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। ধার সহস্রধারায় যখন বাড়ে, তখন কী আর রক্ষা থাকে? তার উপর এই যে চাষী প্রজাদের মাতব্বর, তারাও সেকালে মামলায় প্রায় সবাই সাক্ষী দিয়েছিল এই সাউদের তরফে।

যাক ওসব কথা। তবে এখন ওরা নিজেদের গালে—: ও কথাও থাক, পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নাই। বিস্তারিত বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। একেবারে হালের কথাই ভালো। পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন জমিদার। গাঁয়ে-গাঁয়ে কাছারি, কাছারিতে কাছারিতে নায়েব, বড় কাছারিতে বড় নায়েব। এছাড়া পদ্মাপার নিজের দেশ থেকে আমদানি করা পাইকের দল এনে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে

ফেলেছেন সাউ মশায়েরা। এ ছাড়াও সাউ মহাশয়দের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে এসে বহু দোকানদানি খুলে ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অনেক কলকারখানাও বসিয়েছেন, এখানকার অনেক লোক আজকাল কলেও খাটে। এইসব লোকরাও কেউ বা দাঁত খিঁচোয়---কেউ বা কাঁদে। তা কাঁদুক আর দাঁত খিঁচোক—দিন চলছিল ভালয়-মন্দতে। জমিদারের কর্মচারীদের সঙ্গে গাছের মালিকানি নিয়ে ঝগড়া করে, জমির স্বত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়ে, পাইকদের খোরাকী রোজ প্রভৃতি নিয়ে 'না—না' করে, সাউ দোকানদারদের সঙ্গে নুনের দর, তেলের দর, কাপড়ের দর নিয়ে বাক্-চাতুরি করে, কলকারখানার মজুরি নিয়ে বিসম্বাদ করে নানা টক-ঝকের মধ্য দিয়ে দিন চলছিল এক রকম করে। ঘানির চারপাশে চোখঢাকা বলদের শিঙ নেড়ে পাক খাওয়ার মতো সবই চলছিল তেলও বের হচ্ছিল—সে নিচ্ছিল কলু, আর খোলও হচ্ছিল—তা খাচ্ছিল বলদে।

হঠাৎ ভূমিকম্পে নড়ে উঠার মতো সব নড়ে উঠল। ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল। সাউ জমিদার মশায়দের সঙ্গে হলদীবাড়ির 'সাঁই' জমিদারদের সীমানা নিয়ে ফৌজদারি বেধে গেল। বেমক্কা ফৌজদারি, বলা নাই, কওয়া নাই, নোটিশ নাই, পত্র নাই, সাঁইবাবুদের পাইকদের দল হঠাৎ বন-বাদাড় ভেঙে, লাঠি-সোঁটা-সড়কি-বল্লম নিয়ে ভরতপুরের পাশের লাট—লাট ধর্মপুরে চড়াও হল। কাছারিতে ঢুকে---মারধর খুনজখম করে দখল করে নিল সব। সাউবাবুদের দল এসে ভরতপুরের কাছারিতে ঢুকল। শুধু তাই নয়, সাঁইদের লোকজনদের ব্যাপার দেখে ভরতপুর সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ ঘটে গেল। লাঠি-সোঁটায় তেল মাখিয়ে তলোয়ারে শান দিয়ে এমন তোড়জোড় আরম্ভ করলে যে, ভরতপুরে ঢুকেও যে তারা শেষ পর্যন্ত একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে,—এতে আর কারও সন্দেহ রইল না। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ভরতপুরের কাছারিতে কাছারিতে সাজ-সাজ রব উঠল।

চাষীদের দল সব চমকে উঠল। দুই লড়ায়ে ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুঘাষের মতো দশা তাদের। তারা সব চঞ্চল হয়ে উঠল।

বুড়া লালমোহন পাণ্ডে ভরতপুরের চাষীদের চাঁই। খাটো করে চুল ছাঁটা, দাঁতগুলি সব পড়ে গেছে, আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, বুড়া ভাবনায় মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

দলে দলে ভরতপুর লাটের লোকেরা এসে বুড়োকে ঘিরে বসল।

সসম্মানে হাত জোড় করে বুড়ো ফোকলা দাঁতে, মায়ের কোলের শিশুরা যে হাসি হাসে আপনার বাপ খুড়ো ভাই বোনদের দেখে, সেই হাসি হেসে বললে, আসুন পঞ্চ।

সকলে বসে গেল। তারপর বললে শুধু একটি কথা, কত্তা? ওই একটি কথাতেই সব ওদের বলা হয়ে গেল। কর্তাও সব বুঝে নিলে।

বুড়ার সুখেও হাসি, দুখেও হাসি, ভাবনাতেও হাসি, বুড়া ভাবতে ভাবতে হাসতে লাগল।

গৌরপুরের একজনা বললে, সাউবাবুরা আমাদের জমির মালিকানি মানছে নাই। আমরা কেনে ছাড়ব সুবিধে? সাউয়েরাও জমিদার, সাঁইয়েরাও জমিদার—তা সাঁইয়েরা যদি আমাদের জমির মালিকানি মানে, তবে উনাদের হয়েই সাক্ষী দাও না কত্তা।

বুড়া ঘাড় নাড়তে লাগলো, উঁ-হু। পাপ হবে।

একজনা বললে, তবে আমরাও জুটে-পুটে লাগাই ফৌজদারি, এস!

বুড়া ঘাড় নাড়লে, উঁ-হু।

কেনে, ভয় লাগছে নাকি?—একে ছোকরা রুখে উঠল।

বুড় হাসলে। সে হাসির সামনে ছোকরা এতটুকু হয়ে গেল। বুড়া হেসে বললে, ভয় নয় রে ভাই, পাপ হবে।

তবে? তবে কি করবে বল? কিসে পাপ হয় না, তাই বল?

হুঁ। দাঁড়া রে ভাই। মনকে শুধাই। মন শুধাক ভগবানকে তবে তো!

রতনলাল বললে, যা চটপট ঠিক করে ফেল কত্তা। তুমি যা বলবে, তাই করব আমি।

বুড়া হাসলে; রতনের উপর তার অনেক ভরসা। ভারী ভালো ছোকরা। আর তেমনই কি সাহস!

ঠুকঠুক করে বুড়া কাছারিতে এসে উঠল, রাম রাম গো লায়েব মশয়!

কে, লালমোহন? এস এস।

হ্যাঁ, এলম একবার।

এলম-টেলম নয়। লেগে যাও, সব কোমর বেঁধে লেগে যাও একবার। সাঁই-বেটাদের একবার মেরে বেচপাট করে দিতে হবে। একধার থেকে কেটে ফেলতে হবে।

বুড়া হাসলে। কি যে বলেন লায়েব মশয়?

কেন?

ওই! কেটে ফেলালে রক্ত পড়বে যে গো! মরে যাবে যে লোকগুলান! পাপ হবে যে! বুড়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

নায়েবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল বুড়ার এই ভণ্ডামি দেখে। তবুও লোকটা খাতিরের লোক, তাই রাগ করেও ভদ্রভাবে বললে, হুঁ, বুঝেছি। ওদের রক্ত দেখে তোমার চোখে জল আসছে! বুঝতে পারছি সব। বলে খসখস করে কয়েক ছত্র লিখে আবার বললে, আর আমাদের পাইকদের যে খুন-জখম করেছে, রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তার বেলায়—

বুড়ার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখের জল দ্বিগুণ হয়ে গেল হে ভগবান! সে কথা শুনে ইস্তক কাঁদছি লায়েববাবু, আঃ—হায় হায় হায়! কত লাগল তাদের দেখি, সে চোটগুলান, মনে হয়, আমারই বুকে পড়ল গো!

নায়েব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা ভণ্ড-পাষণ্ড, না সত্যই সাধু? ভেড়ার শিঙে ধাক্কা লাগলে নাকি হীরের ধারও ভেঙে যায়, ঠিক তেমনই নায়েবের ইস্পাতের ভ্রমরের পাক দেওয়া শক্ত ধারালো বুদ্ধিও বুড়ার ভোঁতা বুদ্ধির ঘরের দরজায় ঠিক গর্ত করতে পারছে না। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নায়েব বললে, তা হলে? তা হলে কি করতে হবে শুনি?

তাই তো বুলছি গো আপনকাকে। চোখের জলের মধ্যেই আবার বুড়ার হাসি ফুটে উঠল।

কি বলছ?

বুলছি, আমাদের জমির মালিকানাটি মেনে লাও তুমরা, সব পাইক বরকন্দাজ লিয়ে তফাৎ হয়ে যাক, দেখ সাঁইদের আমরা রুখে দি।

রুখে দেবে? ফৌজদারি কি বোঝ তোমরা? চাষ কর, খাও। লাঠি ধরতে জান? সড়কি চালাতে জান?

বুড়া হাসলে।

হাসছ যে?

আপনকার কথা শুনে হাসছি গো। আমরা লাঠি-সড়কি ধরবই নাই যে।

তা হলে কি করে রুখবে?

উয়ারা আসবে, আমরা পিঠ পেতে দাঁড়াব, লাও, মার লাঠি। বুক পেতে দিব, চালাও সড়কি। আমাদের রক্ত পড়বে, মাটি লাল হয়ে যাবে, আমরা মরব। তখন উয়াদের আক্কেল হবে, বুকগুলান টনটন করবে, চোখে জল আসবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। উয়ারা লাজ মেনে ফিরে যাবে।

নায়েব হা—হা করে হেসে উঠল, এই তোমার বুদ্ধি?

বুড়া কিন্তু আশ্চর্য। সে এতটুকু অপ্রতিভ হল না। তারও দন্তহীন মুখে সেই আশ্চর্য ছেলেমানুষী হাসি ফুটে উঠল। হয় গো, হয়। হয় গো, হয়। আমার মন শুধালে যে ভগবানকে। ভগবান যে বুললে গো! আপনকাদের মন যে ভগবানকে কিছু শুধায় না গো! না হলি বুঝতে পারতে আমার কথা।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী, বুড়ার বুড়ীটি ঠিক ক্ষ্যাপার ক্ষেপীর মতো।

সমস্ত শুনে সে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। চিন্তাটা তার বুড়ার মতোই সাউনায়েবের জন্য চিন্তা। এ তো সহজ কথা, সোজা কথা। উয়ারা কেনে বুঝতে লারছে? হ্যাঁ গো বুড়া?

সেই তো গো বুড়ী।

তবে কি হবে? কি করবে তুমি?

আমি? অনেক ভেবে বুড়া হাসলে, হ্যাঁ হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কি?

আমি মরব।

মরবে?

হ্যাঁ, আমি মরব। আমি যদি মরি, তবে তখন উয়ারা মনে দুখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। তখুন আমাদের কথা ঠিক উয়াদের সমঝে আসবে।

বুড়ী কিছুক্ষণ ভাবলে। ভেবে সে খুশি হয়ে উঠল। হেসে বারবার ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ ঠিক বুলেছ তুমি।

বুলি নাই? হেসে বুড়া বুড়ীর দিকে তাকালে।

হ্যাঁ। তাই কর তুমি। মর। মরে উয়াদিগে বুঝায়ে দাও।

বাইরে থেকে ডাকলে রতনলাল, কত্তা!

বেটা। আয় রে বেটা, আয়। লালমোহনের মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

রতনলাল এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। বললে সব এসে দাঁড়িয়ে আছে কত্তা। কি হল, কি করব তাই বল। রতন যেন আগুনের শিখার মতো জ্বলছে।

বুড়া বাইরে এসে জোড়হাত করে বললে, নমো পঞ্চ।

তার আগেই কিন্তু একটা গণ্ডগোল ঘটে গেল। সাউবাবুদের পাইক-বরকন্দাজ এসে সব ঘিরে দাঁড়াল। সাউবাবুদের সদর-নায়েব চারু শীল, জাঁদরেল নায়েব। সে কারও তোয়াক্কা রাখে না, সে এখানকার নায়েবকে হুকুম পাঠিয়েছে পাগলটাকে পাকড়ে আটকে রাখ। শুধু পাগলা নয়, রতনলাল-টতনলাল চেলাচামুণ্ডা তামাম আদমী আটক করো—বিলকুল।

বুড়া হেসে বললে, চলো। রতনলাল প্রভৃতি চেলাদের দিকেও চেয়ে বললে, চলো বেটালোক।

বুড়ী একগাল হেসে এগিয়ে এসে বলল, আমি?

সাউবাবুদের লোক বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে হুকুমও আছে।

বুড়ী বললে, দাঁড়া বাবা, জেরাসে সবুর করো বেটা : বুড়ার কৌপীন, আমার কাপড় আর সেই লোটাটা নিয়ে নিই। ওই লোটাটাতে জল না খেলে আমার তিয়াস মেটে না।

বুড়া হেসে ঘাড় নাড়ে, হাজার হলেও মেয়েলোক কিনা। লোটার মায়া ছাড়তে পারে না।

সাউবাবুরা বুড়াকে আটক করলেও খুব যত্ন করেই রাখলে। সে দিক দিয়ে তারা

এতটুকু কসুর রাখলে না। বুড়া কিন্তু সেই বুড়া, আটকের মধ্যে থেকেও হাসে; ভগবানকে ডাকে, আর ভাবে। মনে মনে বলে, ভগবান, আমার মনকে বুলে দাও, কি করব? মরব? আমি মরলে উয়ারা দুখ পাবে? তুমি উয়াদিগে জ্ঞান দিবে?

বুড়ী আটকের মধ্যেই ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায়, বুড়ার খাবারটি করে, বিছানা মানে কম্বলটি ঝাড়ে, লোটাটি ঝকঝকে করে রাখে। তার যেন এ অবস্থাটা খানিকটা ভালোই লাগে। বুড়াকে অনেকটা কাছে পেয়েছে। বাইরে তো বুড়ার হাজার কাজ, এক লহমার ফুরসৎ হয় না দুটা কথা বলবার, ঘরোয়া কথা বলবার। সব কথাই তার ভরতপুরের কথা, নয়তো মানুষের কথা। আজ এখান, কাল সেখান, এ আসছে, সে আসছে, লোকজনেই বুড়াকে ঘিরে রেখে দেয়; এখানে বুড়ার অনেকটা কাছে আসতে পেরেছে সে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই বুড়ীর ভুল ভেঙে গেল। বুড়া সেই বুড়া। লোকের ভিড় নাই, কিন্তু বুড়ার মাথায় ভাবনার ভিড় এতটুকু কমে নাই। লোকে বাইরে বলত, বুড়াটি পাথর। বুড়ীর মনে হয়, কথাটি মিথ্যা নয়।

সে বলে, বুড়া!

উঁ? বুড়া তার দিকে তাকায়, বুড়ীর মনে হয়, বুড়া তার দিকে চেয়ে নাই, চেয়ে আছে ওই—ওই কোন্ দিক্‌দিগন্তরে, অনেক দূরে, সেই পাহাড়ের মাথায় আছে যে ঠাকুরের মন্দির, সেই মন্দিরের চূড়ার দিকে।

কি ভাবছ?

ভাবছি? বুড়া হাসে।

হেসো না বুড়া, এ হাসিটি তোমার ভালো লাগছে নাই আমার।

হুঁ। ছোট্ট একটি হুঁ বলে বুড়া চুপ করে যায়।

ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় বুড়ী, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলে, ভগবান, বুড়াকে বাঁচিয়ে রাখ! না হলে এত ভাবনা ভাববে কে?

হঠাৎ একদিন বুড়া বললে, আমি মরব।

বুড়ীর বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হল, কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটে বলবার উপায় নাই। বুড়া তা হলে এমন হাসি হেসে শুধু বলবে, ছি! তাতেই বুড়ী মরমে মরে যাবে। সে শুধু বললে, কেনে বুড়া? মরবে কেনে?

মরব। সাহাবাবুরা বুলেছে, আমি বাইরের লোকগুলিকে বুলে এসেছিলাম, ফৌজদারী দাঙ্গা করতে। বাইরের লোকগুলির সঙ্গে বাবুদের পাইকের মারপিট হয়ে গিয়েছে। আমাদের লোকগুলান উদিকে মেরেছে, অনেক ক্ষেতি করেছে। বাবুরা বুলছে, ই সব আমার শিক্ষা।

রতনলাল বললে, তার লেগে তো কত্তা, বাবুদের পাইকরা লোকদেরও খুব মার দিয়েছে।

বুড়া ঘাড় নেড়ে হাসলে। বললে, শুধু তাই নয় রতন। আমাদের লোকেরা মারলে যখন, তখন লোকদের পাপ হল। আমি মরি, মরে ভগবানকে বুলব, ভগবান তুমি পাপটি ক্ষমা কর, শুধু আমাদের পাপ লয়, ওই পাইকদের পাপও ক্ষমা কর। আর—

আর কি কত্তা?

বুড়া হাসলে। তবে তো উয়ারা বুঝবে, আমি পাপী লই।

বুড়া মরণপণ করে বসে। খায় না, দায় না, চুপ করে পড়ে থাকে।

বুড়ীর কথাবার্তা সব ফুরিয়ে গেল। তার দিকে একবার ফিরে চাইবারও ফুরসৎ নাই। কান্না লজ্জা, বুড়ীর কাঁদবারও উপায় নেই।

আটকখানার বাইরে হৈ-চৈ উঠে, ভগবান, আমাদের কর্তাকে বাঁচিয়ে দাও।

রতনলাল আর সব চেলারা যেন উদাস হয়ে গিয়েছে।

বুড়ী আর থাকতে পারে না। সে বুড়াকে কিছু বলতে সাহস করে না। সে ভগবানকে মনে মনে ডাকে, বলে, বুড়াকে বাঁচাও দেবতা। এগুলি লোকের মুখের দিকে চাও। আমার মুখের দিকে চাও। বুড়ীর মনে হয়, বুড়ার চেয়ে ভগবানেরও মন নরম।

বুড়ীর মনে হয়, ভগবান যেন হাসছেন।

বুড়া সত্যিই মরে না। মরণের সব লক্ষণই হয়েছিল, সাউবাবুরা বড়ো বদ্যিও পাঠিয়েছিল, তারাও বলেছিল, আমাদের অসাধ্য। না খেলে মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। তবু বুড়া বাঁচে। আশ্চর্য বুড়া, সব সময়ের মধ্যে একটিবারও তার মুখের সেই খোকার ঠোঁটের হাসির মতো হাসি মিলিয়ে যায় নাই। ধীরে ধীরে সব মরণ-লক্ষণ মিলিয়ে গেল, চোখের ঘোলা রঙ ঘুচে গিয়ে সাদা পদ্মের পাপড়ির আভা ফুটে উঠল, মুখের রঙ ফুটে উঠল মায়ের কোলের ছেলের মুখের মতো ঝকমকে রেশ। বুড়া বললে, আমি বাঁচলাম। ভগবান আমার মনকে বুললে, তোর পাপ নাই।

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, বুড়া আমি এইবার মরব।

কেনে?

আমার শরীর খারাপ লাগছে। আর—

আর কি?

বুড়ী কিন্তু কিছুতেই সে কথা বললে না। শুধু হাসলে।

বুড়ী সত্যিই মারা গেল। জ্বর হল সামান্য। সেই জ্বরেই মারা গেল। মরবার সময় একদৃষ্টে সে চেয়ে ছিল বুড়ার মুখের দিকে।

পাথরের বুড়া। লোকে মিথ্যে বলে না।

হঠাৎ বুড়ীর মনে হল, লোকের কথা মিথ্যে, মিথ্যে; সত্যি নয়, সত্যি নয়। বুড়ার চোখে জল। হাঁ, হাঁ, বুড়ার চোখে জল।

সে বললে, বুড়া!

চোখের জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ী, কি বুলছ, বল?

মরণ ভারী সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারী সুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়ল, ঝরে পড়ল বুড়ীর কপালের উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ী বললে, না, থাক।

প্রথম প্রকাশ : শনিবারের চিঠি, ১৯৪৪

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পেশায় চিকিৎসক। দীর্ঘকাল ভাগলপুরে ডাক্তারি করেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন, বিষয়বস্তুর দীপ্তিতে ও গঠনচাতুর্যে তাঁর জুড়ি নেই। এঁর গল্প-উপন্যাস এক চরিত্রচিত্রশালা, যার অফুরাণ বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

ভোটার সাবিত্রীবালা

তাহার নামটি একটু অদ্ভুত গোছের ছিল। রিপুনাশ। তাহার বড়দার নাম ছিল তমোনাশ। কিন্তু কালের এমনই গতিক যে কেহই কিছু নাশ করিতে পারে নাই। নিজেরাই নষ্ট হইয়াছিল। তমোনাশের জীবনে একটুও আলো প্রবেশ করে নাই। অ আ ক খ পর্যন্ত শেখে নাই সে। একেবারে নিরক্ষর ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল বলিয়াই দুইজনেরই দুইটি সংস্কৃত নামকরণ হইয়াছিল। তাহাদের পিতা ছিলেন টোলের পণ্ডিত, মোহনাশ তর্কতীর্থ। লোকে সংক্ষেপে বলিত মোহন পণ্ডিত। সমাজে আজকাল সংস্কৃত পণ্ডিতদের আর কদর নাই। অতিশয় দরিদ্র ছিলেন তিনি। পুরোহিতগিরি করিতেন। তিনি যখন মারা যান তখন তমোনাশের বয়স ছয় বৎসর, রিপুনাশের তিন। তাহাদের মা রাঁধুনী-বৃত্তি করিয়া সংসার চালাইতেন। তামোনাশের বয়স যখন ষোল তখনই সে লায়েক হইয়া উঠিল। মস্তানি করিয়া বেড়াইত। একটা গুণ্ডার দলই ছিল। তাহার নাম ছিল তম্‌না। গুণ্ডামি করিয়া কিছু রোজগার করিত সে। কিছু টাকা মাকে আনিয়া দিত। কিছু টাকা নিজের আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করিত। কিন্তু এ জীবন সে বেশি দিন চালাইতে পারে নাই। গুণ্ডামি করিতে গিয়া ছুরিকাহত হইয়া মারা গেল একদিন। তাহার দেহটা ফুটপাথে কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর পুলিসবাহিত হইয়া গেল মর্গে, ময়না তদন্তের জন্য। ডাক্তাররা তাহার দেহটা ছিন্নভিন্ন করিলেন। অবশেষে সেটা ডোমেরা অধিকার করিল। তমোনাশের মা তাহার মৃত পুত্রের শবদেহটা আর দাবি করিলেন না। লোকজন জোগাড় করিয়া শবদেহটার সৎকার করিতে যে টাকা লাগে সে টাকা তাঁহার ছিল না। চারিদিকে ধার জমিয়া গিয়াছিল, আর ধার বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না তাঁহার। ডোমেরা তমোনাশের শরীরের অস্থিগুলি বাহির করিয়া পরিষ্কার করিল এবং অবশেষে সেগুলি 'অ্যানাটমি'র ছাত্রদের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা রোজগার করিল। এইখানেই তমোনাশের জীবনবৃত্তান্ত শেষ। তমোনাশের মা সাবিত্রী খুব একটা কাঁদেনও নাই। তাঁহার চোখেমুখে প্রচ্ছন্ন একটা অগ্নি কেবল ধকধক করিয়া জ্বলিত। তাহা বাঙ্ময় নয়, দৃশ্যও নয়, কিন্তু নিদারুণ। সাবিত্রী যাঁহার বাড়িতে রাঁধুনী ছিল সেই ভদ্রলোক তমোনাশের মৃত্যুর পর সাবিত্রীর

দুই টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাবিত্রী রাজি হয় নাই। সংক্ষেপে কেবল বলিয়াছিল 'দরকার নেই।' রিপুনাশ রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া যাহারা জীবন অতিবাহিত করে, যে কোনও মজা, যে কোন হুজুকে, যে কোনও মোটর অ্যাক্সিডেন্ট, যে কোনও রাস্তার ভিড় যাহাদের আকৃষ্ট করে তাহারাই ছিল রিপুনাশের সঙ্গী। দলের মধ্যে তাহার নাম ছিল 'রিপুন।' রিপুন কিন্তু তম্‌নার মতো বলিষ্ঠ ছিল না। রোগা-রোগা চেহারা। বাজারের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত, মুটেগিরি করিয়া রোজগার করিত কিছু। বিড়ি খাইতে শিখিয়াছিল। প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ি কেনার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা মাকেই আনিয়া দিত। এই ভাবেই চলিতেছিল। রিপুনের বয়স যখন ষোল-সতের তখন হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল। সে এক ঝাঁকা কপি বহিয়া আনিয়া এক মোটরওলা-বাবুর মোটরের কেরিয়ারে সেগুলি সাজাইয়া রাখিতেছিল গলার ভিতরটা কেন যেন কুটকুট করিতে লাগিল। কাশি শুরু হইয়া গেল। মোটওয়ালাবাবু তাহার প্রাপ্য মজুরি বারো আনা পয়সা দিয়া চলিয়া গেলেন। রিপুন ফুটপাথে বসিয়া কাশিতে লাগিল। হঠাৎ কাশির সহিত এক ঝলক রক্ত। রিপুন কিছুক্ষণ রক্তটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাড়ি চলিয়া গেল।

সাবিত্রী তাহাকে লইয়া গেলেন পাড়ার ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি বুক-পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—যক্ষ্মা হয়েছে। আরও বলিলেন, আমাকে কিছু ফি দিতে হবে না। কিন্তু ওষুধ আর ইনজেকশন কিনতে হবে। তাছাড়া ভালো খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। ডিম, মাখন, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি। সাবিত্রী নীরবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ-মুখের অদৃশ্য অগ্নিশিখার বার্তা সম্ভবত ডাক্তারবাবুর মনে গিয়া পৌঁছিল। তিনি বলিলেন—তোমার যদি সামর্থ্যে না কুলোয় হাসপাতালে ভরতি হওয়াই ভালো। তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেইটে নিয়ে তুমি হাসপাতালে যাও। চিঠি লইয়া সাবিত্রী সাতদিন হাসপাতালের ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করিল। কিছুই হইল না। একটি রোগী বলিল—এখানেও বিনা পয়সায় হয় না, ঘুষ দিতে হয়। এ কথা শুনিবার পর রিপুন আর হাসপাতালে যায় নাই। অত টাকা পাইবে কোথায় সে? বিনা চিকিৎসাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। আবার সে রাস্তায় ঘুরিয়া মুটেগিরি শুরু করিল। একদিন তাহার এক সঙ্গী তাহাকে বলিল—দেখ্ মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। তুই যদি কোনক্রমে ছ মাস আলিপুর জেলে কাটাতে পারিস, তোর যক্ষ্মা ভাল হয়ে যাবে—'

'জেলে গেলে যক্ষ্মা সেরে যাবে, বলিস কি?'

রিপুন কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করিল না।

সঙ্গী বলিল—'হরু জেল থেকে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। তার যক্ষ্মা হয়েছিল। সেখানে খুব ভালো হাসপাতাল আছে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। তুই জেলে চলে যা।'

কয়েক দিনের মধ্যেই রিপুন ট্রামে পকেট কাটিতে গিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িল। সবাই যথেষ্ট প্রহার করিল তাহাকে এবং শেষে পুলিসের হাতে সঁপিয়া দিল।

আদালতে বিচারক বলিলেন—'তুমি তোমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য উকিল দিতে পার। উকিল নিয়োগ করবার সামর্থ্য যদি না থাকে আমরাই তোমার পক্ষে উকিল দিতে পারি একজন—'

রিপুন হাত জোড় করিয়া বলিল—না হুজুর, উকিলের দরকার নেই। পুলিস যা বলছে তা সত্য। আমি চুরিই করব বলে ওই ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম।

বিচারক রায় দিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাসের জেল।'

রিপুন হাত জোড় করিয়া বলিল—'ধর্মাবতার, টাকা আমি দিতে পারব না। কিন্তু আমাকে এক মাস জেল না দিয়ে ছ মাস জেল দিন।'

বিচারক অবাক হইলেন। 'ছ মাস জেল চাইছ কেন?'

'আমার যক্ষ্মা হয়েছে। শুনেছি আলিপুর জেলে যক্ষ্মার ভালো চিকিৎসা হয়। ছ মাসে সেরে যায়।'

বিচারকের রায় কিন্তু বদলাইল না। জেলের হাসপাতালে কিছু অসুখ সারিল না। রিপুন কাশিতে কাশিতেই জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল একমাস পরে। ইহার পর আরও একমাস বাঁচিয়া ছিল সে। একদিন গভীর রাত্রে খুব কাশিতে কাশিতে উঠিয়া বসিল এবং মায়েরই পায়ের উপর প্রচণ্ড রক্ত বমি করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল বেচারা। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল সাবিত্রী। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে আগুনের হলকা বহির হইতে লাগিল। এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিল না সে।

ইহার মাস দুই পরে নির্বাচন হইয়াছিল। সাবিত্রীবালা একজন ভোটার। তাহার দ্বারে মান্যগণ্য একজন ভোটপ্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি তুলিয়া বলিল, 'আপনাকে ভোট দেব? কি উপকার করেছেন আমার? আপনি যখন গদিতে ছিলেন—তখন আমার বিদ্বান স্বামী সামান্য ভিকিরির মতো মারা গেছেন। আমার বড় ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, শেষে সে গুণ্ডা হয়ে ছুরির ঘায়ে মারা গেল। ছোট ছেলেটা ম'ল যক্ষ্মায়, তার কোনও চিকিৎসা হল না, সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন, কাউকেই ভোট দেব না—'

ভোটপ্রার্থী ভদ্রলোক বলিতে গেলেন—'কিন্তু দেখুন গণতন্ত্রে—'

কিন্তু সাবিত্রী তাঁহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—'

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল সাবিত্রী।

দেশ : ৩০ মাঘ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)
কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান লেখক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, জীবনী, শিশুসাহিত্য, নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর সহানুভূতি, অপরিমেয় মমতায় তাঁর গল্প-উপন্যাস সমৃদ্ধ। বিচারবিভাগে কাজ করেছেন, জেলা জজ-পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। সমাজের নানাস্তরে তাঁর বিশ্লেষণীদৃষ্টি চালিয়েছেন।

সারেঙ

মা নাসিমকে মেরেছে। মা মেরেছিল মারুক, কিন্তু ও মারবে কেন? ও কে?

গরু-বাছুর রাখি না রাখি, চাষ-রোপণ করি না করি, তাতে ওর কী? জমি খিল যায় তো যাবে, তাতে ওর কী মাথা-ব্যথা! ঘরের খড় বদলানো দরকার কি না দরকার তা আমরা দেখব। ভিজতে হলে ভিজব আমরা মায়ে-পোয়ে। ওকে ছাতি মেলতে ডাকবে না কেউ।

না, গোলবানু বলে, এবার থেকে তত্ত্বপালন করবে গহরালি।

কে গহরালি? নাসিম ঘাড় ঝাড়া দিয়ে তেড়ে ওঠে।

মস্ত লোক। জমি আছে পাঁচ কানি। কাচারি আছে দরজায়। দায়েরী মোকদ্দমা আছে ক নম্বর।

তাতে আমাদের কী?

ওকে ধরলে জমি জায়গা ঠিক থাকবে, খাওন পরনের কষ্ট থাকবে না; খড়-কুটার বদলে ঢেউ-টিনের ঘর উঠবে এক দিন।

চাই না। আমাদের এই ভাঙা ঘরই ভালো। আমরা শাক-লতা খেয়ে থাকব। তুই ওকে তাড়িয়ে দে।

শক্ত মার দিলে গহরালি। সঙ্গে সঙ্গে গোলবানুও হাত মেলাল।

বাপজান বেঁচে থাকলে এমন কেউ মারতে পারত না তাকে। মাঠে যাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি করত না। সে জাল নিয়ে বিলে-বাওড়ে বেড়িয়ে পড়ত মাছ ধরতে। বাপজান বলত, হাটে তোকে কাটা-কাপড়ের দোকান করে দেব একখানা। তার চেয়ে আমাকে একটা নৌকা কিনে দাও। বলত নাসিম। মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভালো লাগে।

বাপজানের নৌকা কিনে দেবার সাধ্য ছিল না। নাসিম এখনো এত বড় হয় নি যে কেরায়া নৌকা বেয়ে খেটে খাবে। তার জাল কবে ছিঁড়ে গেছে। তবু জালের টান সে ভুলতে পারে না। নদীর ধারে চুপটি করে বসে থাকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

সে শুনেছে, মা নিকা বসবে গহ্‌রালির কাছে। এক ঘরের মানুষ হয়ে থাকবে তারা। নাসিমের আর জায়গা কোথায়? হাত্‌নেয়, পাছ-দুয়ারে। লোকে যখন মাকে জিজ্ঞেস করবে, এ কে, তখন মা বলবে, আমার আগের পুরুষের সন্তান। কার ভাতে আছিস্? যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে নাসিমকে, সে বলবে, গহ্‌রালির ভাতে। বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে নাসিমের।

মাইল খানেক দূরে ব্রাঞ্চ লাইনের ইস্টিমার থামে। পাট-ক্ষেতের পাশে। জেটি বা ফ্লাট নেই, বাদামগাছের গুঁড়ির সঙ্গে জড়িয়ে স্টিমার পার ঘেঁষে দাঁড়ায়, আশ্চর্যরকম গা বাঁচিয়ে। সটান পারের উপরেই সিঁড়ি পড়ে দুখানা। সিঁড়ির এ-ধার থেকে ওধারে বাঁশের লগি ধরে দাঁড়ায় দুজন খালাসী। নামা-ওঠা করে যাত্রীরা। বাদামগাছের তলায় বসে ছোট একটি টিনের বাক্সতে করে টিকিট বেচে ঘাট-সরকার। যারা নামে তাদের থেকে টিকিট কুড়োয়, ফাঁকি দিয়ে যে ভাসতে পেরেছে তার সঙ্গে এক ফাঁকে কথাটা সেরে রাখে। তারপর উঠে আসে স্টিমারে, হিসাব-কিতাব করতে, জাহাজের বাবুর সঙ্গে। ঘাট-সরকার নেমে না যাওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি তোলে না। একখানা তুললেও আরেকখানা রেখে দেয়। লগি লাগে না ঘাট-সরকারের।

ডোবা দেশ, প্রায় সময়েই জল থাকে দাঁড়িয়ে। গাছের গোড়াটাই যা—একটু ট্যাকা-মতন। যাত্রীরা জল ভেঙে গিয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরে। হাতে-ঠেলা ডোঙা আছে একখানা। মালামাল থাকলে তার শরণ নেয়। বাচ্ছা-কাচ্ছারা কাঁধে-কাঁখে করে পার হয়। ছুটুলে বউ হলে পাঁজাকোলে করে।

'সিঁড়ি তোল্।' দোতলার থেকে সারেঙ হুকুম দেয়।

ঘাট-সরকার এখনো নামে নি বুঝি? না, এই নেমে গেল আঁকা-বাঁকা পায়ে। তুলে নিল শেষ সিঁড়িটা। হড়-হড়-হড়-হড় করে মোটা শিকলে বাঁধা নোঙর উঠে আসতে লাগল।

একটা লোক তাড়াতাড়িতে নামতে পারে নি বুঝি। লোক কোথায়? দশ-বারো বছরের ছেলে একটা। প্যাসেঞ্জার না কি? কে জানে? জাহাজ দেখতে উঠে এসেছিল হয়তো হবে। তবে নেমে যেতে বল পরের ঘাটে, পাতাকাটায়। শেষবেলায় ভাটিতে তরতরিয়ে বেয়ে যেতে পারবে একমাল্লার নৌকোয়। অন্ধকার হয়ে যাবে, ঘরে যাবে কি করে? আহা, বাপ-মা কত ভাববে না-জানি।

ছোট ইস্টিমার, উপরের ঢালা ডেকে শুধু থার্ড ক্লাশ। সামনের দিকে ফাস্ট ক্লাশের দুটো পায়রার খোপ, আর তারই সামনের খোলা কোণাচে জায়গাটুকুতে সারেঙের হুইল। নাসিম একেবারে সেখানে এসে হাজির হল।

প্রথমটা কেউ দেখেও দেখে নি। ভেবেছে কলের কায়দা দেখবার জন্যে এমনি উঠে এসেছে বুঝি। কিন্তু, না, নড়ে না ছেলেটা।

'কি চাই?' চটি পায়ে, কিস্‌তি টুপি মাথায়, সারেঙ হুঁকো ফুঁকছিল দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

'হুজুরের যদি চাকরের দরকার থাকে আমাকে রাখতে পারেন।'

'তোর দেশ কই?' সারেঙ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নাসিমের মুখের দিকে।

'এখানেই হুজুর, কনকদিয়া।'

'মা বাপ আছে?'

'কেউ নাই।'

আবার কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল সারেঙ। বলল, 'কাজ করতে পারবি তুই?'

'কি-কি কাজ হুজুর?'

'রাঁধা-বাড়া, ধোয়া-মোছা, কাপড়-কাচা, বাসনমাজা—এই সব আর কি। পারবি? বেশ, লেগে যা তা হলে। মুফত একটা ছোকরা যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি?' হুইলের লোক ইয়াদালির সঙ্গে একবার চোখ তাকাতাকি করে : অন্তত হুঁকোটা তো সাজতে পারবে, গা-হাত-পা টিপে দিতে পারবে তো দরকার হলে।'

ইয়াদালি বললে, 'মাইনে পাবে না কিছু?'

'মাইনে না হাতি!' সারেঙ ঝামটা দিয়ে উঠল : 'সোতের শ্যাওলা দিয়ে তরকারি রান্না করে খেতে হবে! বয়ে গেছে আমার! অমনি থাকতে চায় তো থাকবে, নইলে নামিয়ে দেব জোর করে! কি, টিকিট আছে?!

'না, হুজুর, মাইনে চাই না আমি।!

জাহাজে যে জায়গা পেয়েছে এই নাসিমের বেশি। বাপ নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই তার অনেক! অজানার টানে যে ভাসবে অকূলে এই তার মহাসুখ।

'ভালো করে কাজ-কর্ম করতে পারলে জাহাজেই বহাল করব এক সময়। প্রথমেই সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে-ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ। কে বলতে পারে? আগে বিনি-মাইনের চাকর, শেষকালে এই জাহাজের জমিদার। সারেঙ তার শাদা শীর্ণ দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল।

কিন্তু প্রথম দিনই রাত্রে নাসিম মার খেল সারেঙের হাতে। বে-খেয়ালে ভেঙে ফেলেছিল একখানা কাঁচের বাসন। আর যায় কোথা। বলাকওয়া নেই, মুখে-মাথায় ঘাড়ে-পিঠে পড়তে লাগল চাঁটির পর চাঁটি। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিম। বেশি গোলমাল করবে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে দেবে কালো জলে।

ব্যথার চেয়ে আশ্চর্য লাগল বেশি নাসিমের। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। এই এখানকার রেওয়াজ। সবাইকেই মার খেতে হয় সারেঙের কাছে। যারা সিঁড়ি দেয়, যারা পাটাতন ধোয়, যারা আছে লঙ্গরের কাজে, দড়িকাছির কাজে, যারা বা লাইট ঘোরায়, তাদের কাজের এতটুকু গল্তি বা গাফিলতি হলেই শুরু হয় মারধোর। নিচে মেস্তরির এলাকা। তাকে ঘিরে কাজ করে কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা,

ইঞ্জিনওয়ালা। কিন্তু চরম শাসনের বার সারেঙের হেপাজতে। ভুল করেছে কেউ, এক কল ঘোরাতে আরেক কল ঘুরিয়ে দিয়েছে, এক ডাণ্ডা টানতে আরেক ডাণ্ডা টেনেছে, তা হলে আর রক্ষা নেই। লাথি-চড়, জাত-বেজাতের গালাগালি, জুতাপিটি পর্যন্ত! তাতেও না শানায় চাকরি থেকে বরখাস্ত।

কেনই বা হবে না শুনি? কোম্পানি শুধু সারেঙকে চেনে, সারেঙকে বোঝে। জাহাজের জেলা-মেজিস্টেট সে। সমস্ত দায়িত্ব তার। চল্‌তি-পথে ইস্টিমার যদি নৌকো ডুবিয়ে ফেলে, খেসারৎ দিতে হবে সারেঙ সাহেবকে। দুর্যোগে পড়ে খোদ ইস্টিমার যদি ডুবে যায়, দায়ী কে? কোম্পানির সাহেবরা নয়। যত-কিছু মামলা-মোকদ্দমা চলতি-পথের ইস্টিমার নিয়ে সমস্ত ফলাফল সারেঙ সাহেবের। আর যদি ঝড়-তুফান থেকে ইস্টিমার পাড়ে ভিড়ানো যায় তার পুরস্কারও এই সারেঙ সাহেবের প্রাপ্য। মেস্তরি-খালাসীরা যতই হাঁক-ডাক দৌড়-ঝাঁপ করুক, যতই কায়দা-কেরামতি দেখাক, টাকার তোড়ার এক-আধটু ছিটেফোঁটাও কারুর বরাতে জুটবে না। যত মেডেল সব সারেঙ সাহেবের গলায় ঝোলানো।

'কী হল হঠাৎ?'

ইস্টিমার চরে ঠেকেছে। চোরা চর, কুয়াশায় ঠাহর হয়নি। চাকা বসে গেছে মাটির মধ্যে শিগ্‌গির যে ছাড়ান পাবে এমন মনে হয় না। খবর পাঠাতে হবে বন্দরের ডকে, জালি-বোটে করে লোক পাঠাতে হবে কাছের যে ইস্টিশানে টরে-টক্কা আছে। সেও এমন কিছু ধারা-ধারি নয়। বেশির ভাগ ইস্টিশানই তো গাছতলা বা ক্ষেত-খোলা। কম্‌সে-কম সাত-আট ঘণ্টা লেট আজ নিঘ্‌ঘাত। মধ্যিখানে যত ঘাটে যাত্রীরা ইস্টিমারের আশায় বসে আছে তারা সমস্ত রাত আজ দূরে ধোঁয়া দেখবে আর হুইসেল শুনবে।

দোষ কার?

দোষ শুখানির, দোষ সেকেণ্ড মেটের। লম্বাচওড়া জোয়ান মরদ সব এখন আর মারতে আরাম লাগে না, নিজেরই হাতে পায়ে চোট লাগে। কিন্তু যাবে কোথায়? এই মাসের পুরো মাইনে বরবাদ হয়ে যাবে এদের। খোরাক কিনতে হবে নিজের পয়সায়।

সারেঙ যেন এই জাহাজের ইজারাদার। মোকররি ইজারা। যত খরচ সরঞ্জাম বাবদ, মেরামত বাবদ খালাসী-মেস্তরি মাইনে বাবদ—হিসেব করে একটা মোটা টাকা সারেঙের হাতে ধরে দেয় কোম্পানি। সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করার মালিক এই সারেঙ। যাকে খুশি পুরো মাইনে দেয়, যাকে খুশি জরিমানা করে। যাকে খুশি খোরাক কাটে, যাকে খুশি জবাব দেয়। এর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, ফয়সালা নেই। ভিতরের শাসন নিয়ে কোম্পানি মাথা ঘামায় না, সে দেখে, ঘাট থেকে ঘাটে মালে-মানুষে বোঝাই হয়ে ইস্টিমার মোটা মুনাফার মাশুল আনতে পারে কি না।

সমস্ত ইস্টিমার তাই সরেঙের কথায় ওঠে-বসে। সব কর্মচারী তার তাঁবেদার।

ইস্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।

'কেঁদে কিছু লাভ হবে না।' পাশে থেকে বললে মকবুল। 'এমনি অনেক মার খেতে হবে। মার খেতে খেতে তবে প্রমোশন।'

মকবুলও প্রথম ঢোকে চাকর হয়ে। পাকের কাজে নয়, সারেঙের ধোপা-মুচির কাজে। তিন বছর পর সে সিঁড়ি পেয়েছে। পরে পাবে পাটাতন, তারপরেই দড়ি-কাছি। মার না খেলে উন্নতি নেই জাহাজে

'সাহেবের সুদৃষ্টি না হলে কিছুই হবার নেই। দশ-বারো বছর পর সাহেবের যদি দয়া হয়, সার্টিফিকেট দেবে। পরে সেই সার্টিফিকেটের জোরে দেওয়া যাবে সারেঙগিরি পরীক্ষা।' মুরুব্বির মতো বলে থার্ড মেট, আফসারউদ্দিনি। 'সেই সার্টিফিকেট না হলে সবই ফক্কা। তাই ভারী হাতে সারেঙের পায়ে তেল মাখান চাই। তারপর পাশ করে একবার হয়ে নিতে পারলে পায় কে। তখন জমিদার তবিলদার সব একজন।'

'না হে না, এর মধ্যে একটু কথা আছে। যারা চাটগাঁর লোক তাদের দিকেই সাহেবের একটু টান বেশি।' গলা খাটো করে বলে বিলায়েত আলি, বয়লারের খালাসী। 'নিজের বাড়ি চাটগাঁ কি না। বলে চাটগাঁ ছাড়া সারেঙ কোথায়? কথায় আছে, সারেঙ শুঁটকি দরগা, এ তিন নিয়ে চাটগাঁ। ধান ডাকাত খাল, এ তিন নিয়ে বরিশাল। সারেঙি করা তো ডাকাতি করা নয়।'

'তোর বাড়ি কোথায় রে চ্যামরা?' সবাই জিজ্ঞেস করে একসঙ্গে। 'এ দেশে।' হতাশ মুখে বলে নাসিম। আর সবাইরও মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

পরদিন বেদম মার খেল আবদুল। জল মাপতে গিয়ে একটা লোহার কাঠি হরিয়ে ফেলেছে।

মারের সময় কেউ ধরতে আসে না, ছাড়াতে আসে না। এ একেবারে গা সওয়া, নিত্যকার ব্যাপার। তবু চোখ ছাপিয়ে কান্নার কম্‌তি নেই। নদীর জলে চোখ মুছতে মুছতে আবদুল বলে, 'মাইনের থেকে দাম আর তার সুদ তো কেটে নেবেই, তবু মেরে খামেখো জখম করবে।'

তবু প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই। নিজের সমর্থনে দুটো কথাও বলা যাবে না। মার ঠেকাবার জন্যে শক্ত করা যাবে না শরীরের হাড়-মাংস।

নাসিম ভাবে এরা সবাই বুঝি তার মত নিরাশ্রয় বাপ মা-মরা।

তা কেন? সবাই সিঁড়ি থেকে শুরু করে উঠতে চায় জাহাজের 'ফানিলে'। সবাই সারেঙের সার্টিফিকেট চায়। মার দিতে না দিলে এ হাতে কলম ধরবে কেন?

তাই সেদিন যখন মকবুলের সঙ্গে জল-তোলা নিয়ে ইয়ার্কি মারতে গিয়ে একটা বালতি নাসিম নদীতে ফেলে দিল তখন মার খেতে তার আর লজ্জাবোধ হল না। অপমানের জ্বালা পর্যন্ত লাগল না তার মনে। মকবুলের সঙ্গে, সমস্ত খালাসীর সঙ্গে সে দোস্তালি অনুভব করলে।

'তোর কি! মাইনে নেই, শুধু মারের উপর দিয়েই গেল।' মকবুল কান্নার মধ্যে থেকে বললে, 'আর' আমার পুরো মাইনেটাই বালতির অন্দরে কেটে নেবে। পরে মাসকাবারে বলবে, আমার থেকে আগাম নে। টাকায় দু আনা করে সুদ দিবি। জাহাজে বসেই মহাজনি করে। কেউ আমাদের দেখবার শোনবার নেই।' বলে উপরের দিকে তাকায়। যেন উপরআলা শুনছেন এই আর্তের ফরিয়াদ।

'অন্য জাহাজে চলে যেতে পারিস্ না?'

'তুই আছিস্ কোন তালে? এক জাহাজ থেকে ছাড়ান নিলে আর কোনো জাহাজে ঠাঁই নেই। সারেঙেদের মধ্যে সাঁট আছে। তাই তো মার খেয়েও মুখ বুজে থাকি যেন বরখাস্ত না করে। একবার বরখাস্ত করলেই বরবাদ হয়ে গেলাম। পানি ছেড়ে তখন গিয়ে হাল ধরতে হবে।'

'আর কোন্ জাহাজেই বা তুই যাবি?' পাশ থেকে ইয়াদালি ফোড়ন দেয় : 'সব জাহাজেই এই রেওয়াজ।'

'এমনি পালিয়ে যাওয়া যায় না?'

সবাই হেসে ওঠে। সিঁড়ি থেকে 'ফানিলে' ওঠবার সাধনায় যারা জাহাজে ঢুকেছে, তাদের কাছে এটা নেহাৎ আজগুবি শোনায়।

'আর পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়।' গম্ভীর মুখে বলে সেকেণ্ড মেট। 'তোর না-ঠিকানা সাহেবের নোটবুকে টোকা আছে। পালাবি আর পুলিশে এজাহার যাবে। বলবে আমার জেবের থেকে মানিব্যাগ নিয়েছে, ঘড়ি নিয়েছে। কোম্পানি লড়বে সারেঙের হয়ে। ছিলি জাহাজে, যাবি জেলে।'

তবে এমনি করে দিন যাবে নাসিমের? এই একঘেয়ে জলের শব্দ শুনে শুনে? মাইনে নেই, খিত-ভিত নেই, এমনি করেই ভাসবে সে দিন রাত?

'সাহেবকে খুশি করতে চেষ্টা কর, তা ছাড়া আর পথ নেই। দ্যাখ্ একবার সিঁড়ি ধরতে পারিস কি না?'

আর কী করে সে খুশি করবে! যা কাজ তার উপরে সে সাহেবের গা-হাত-পা টেপে, গোসলের আগে তেল মেখে দেয়, চুলে বিলি কাটে। পাকের সময় শুখানি সাহায্য করতে আসে বলেই তার হাড়-মাংস এখনো আলাদা হয় নি। তবু মন নেই, মাইনে নেই। বরং জরিমানা বাবদ কিছু তার কাটতে পারে না বলে সাহেবের বড় আপশোষ। তাই মাঝে-মাঝে তাকে উপোস করিয়ে রাখে। সে সে-বেলার লঙ্কা-পেঁয়াজের খরচ বাঁচায়।

চাল-নুন-লঙ্কা-পেঁয়াজ সারেঙ জোগান দেয়। আর সব যার যার মর্জি মাফিক। তেল আর মশলা, মাছ আর তরকারি। মাসান্তে মাইনের টাকার থেকে যার যার চাল-নুন-পেঁয়াজ-মরিচের খরচ কেটে রাখে সারেঙ। তাও তার মর্জি মাফিক।

'যদি মন চাস সারেঙের, চুরি কর।' কে যেন বলে ফিস্ফিসিয়ে।

এই ইস্টিমারের সঙ্গে মাঝে মাঝে বার্জ বাঁধা থাকে। তাতে বস্তা বোঝাই চাল যায়, নুন যায়, লঙ্কা যায়। বার্জের সঙ্গে লোক থাকে। তার সঙ্গে কী বন্দোবস্ত সারেঙ-মেস্তরির, স্টোর-রুমের উপর আবার মুনাফা মারে।

না, তার ভাল লাগে না। কোন আশা নেই নাসিমের। একদিন অন্তর একদিন একই রাস্তা দিয়ে ইস্টিমার ঘোরাফেরা করে। যেখানে আসার সময় সন্ধ্যাবেলা সেখানে আসতে কখনো মাঝ রাত, কখনো বা পরদিন ভোর, শুধু এইটুকুই যা বৈচিত্র্য। নইলে একঘেয়ে জলের শব্দ, যাত্রীর ভিড়, নোঙর ওঠা-নামার হড়্-হড়্, সিঁড়ি ও কাছি ফেলবার সময় সেই ডাক-চিৎকার। ভালো লাগে না তার। ক'দিন পর-পর ঘুরে ঘুরে ইস্টিমার কনকদিয়ায় ফিরে আসে। নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল, ভাবতে পারত না নাসিম। আগে আগে মনে হত নদী না-জানি চলে গেছে কোন সমুদ্দুরে। এই দেশে থেকে কোন দূর-বিদূরের বিদেশে।

নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনও একলাটি এসে বসে নাসিম। ঘন কালো জলে জুনিরাত ঝিলমিল করছে। আজ কনকদিয়া এসেছে মাঝ-রাতে। বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে কোথায় তার বাড়ি-ঘর! তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে কথা। মা'র মুখ। মনে করে, তার মা নেই। তার মা কবে মরে গেছে। মা'র মরামুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।

বড় চুরি না করতে পারে, ছোট ছিঁচকে চুরি কেন করতে পারবে না? দা হাতে করে ডাব বেচতে এসেছে গাঁ-গেরামের লোক। সারেঙ সাহেবের জন্যে কিনলে দুটো দশ পয়সায়। জাহাজে উঠে এসে, সিঁড়ি যখন তুলে নিয়েছে, নাসিম সারেঙের কাছ থেকে একটা একানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ডাঙার উপর। আর ছ' পয়সা? নাসিম জিভ উলটিয়ে মুখ ভেঙচাল। বেচনদার ছোঁড়াটা নদী থেকে কাদা তুলে ছুঁড়ে মারল নাসিমের দিকে। জাহাজ তখন সরে এসেছে লাগল না ছিটে-ফোঁটাও। সারেঙ আর নাসিম দুজনে একসঙ্গে হাসতে লাগল।

এমনি মাছ এনেছে বেচতে। বাঁশপাতা আর গাং-খয়রা : তাও কিছু হল চাতুরী করে। দুধ এসেছে হাঁড়িতে, বাঁশের চোঙায় মেপে দেবে। দাম দেব জাহাজে উঠে। ক্ষেতের টাটকা শশা-খিরাই এনেছে ঝুড়িতে করে। ঘুসো চিংড়ি দিয়ে তরকারি হবে, না হয়, অমনি কাঁচা খাব। তোমার দাম মারা যাবে না। আমি সরেঙ সাহেবের চাকর।

এতদিনে একটা নিমা পেয়েছে নাসিম। একখানা পানিনামছা লুঙ্গি পাবে কবে?

চারটে পয়সা চাইল নাসিম।

এমন স্পর্ধার কথা সারেঙ তার জীবনে শোনে নি। চোখ কপালে তুলে সারেঙ বলল, 'কী বললি? পয়সা?'

কী ভীষণ হারামি কথা না-জানি বলে ফেলেছে এমনি ভয়তরাসে চোখে তাকাল নাসিম।

'কী করবি পয়সা দিয়ে?'

'চা খাব এক খুরি।'

অমনি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় পড়ল তার গালের উপর। ঘুরে ছিটকে পড়ল নাসিম। সারেঙ গর্জে উঠল : 'এমন বেতরিবৎ। আমার কাছে কিনা বিড়ি চায়! বিড়ি কিনবে! কোন দিন শুনব বোতল কিনবে! তেরিবেরি করবি তো নদীর গহীনে নিখোঁজ করে দেব।'

চোখের জলে আবার মা'র কথা মনে পড়ে নাসিমের। মরে গেলে মা'র মুখ কেমন দেখাবে তাই সে অন্ধাকারে জলের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। মা'র মরামুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর পায় এই মার সহ্য করতে। মাগো বলেও যদি সে কাঁদতে না পারে, তবে নিঃশব্দে হজম না করে উপায় কি।

তবু এই অত্যাচারিতে দল একত্র হয় না। খোদ উপরআলা ছাড়া আর কারু কাছে তাদের নালিশ নেই। মুক্তিও নেই এই জাহাজের খোল থেকে। কবে কে সিঁড়ি পাবে কবে কে পাটাতন, দড়িকাছি, নোঙর-লাউট বা মেস্তরির ইলাকা—তারি আশায় সবাই দিন গোনে। কে কী ভাবে সারেঙের মন কাড়তে পারবে। সুদ দিয়ে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে, মার খেয়ে। চমৎকার গভর্নমেণ্ট চালাচ্ছে সারেঙ সাহেব।

সেই রাত্রেই এক প্যাসেঞ্জারের এক জোড়া জুতো সরাল নাসিম। সারেঙ তা সটান নদীর মধ্যে ফেলে দিলে। বললে, 'বুদ্ধিকে তোর বলিহারি। আমি জুতো মসমসিয়ে বেড়াই আর আমাকে পুলিশে ধরুক। পরদিন নাসিম জোগাড় করলে একটা টিনের স্যুটকেস। সেটাও গেল গভীর গহ্বরে। সেটার মধ্যে মোকদ্দমার নথি, পরচা-দাখিলা, ক' কেতা বেজাবেদা নকল।

কিছুতেই মনের মত হতে পারছে না নাসিম। পারবি, পারবি, আস্তে আস্তে পারবি। সারেঙের চাউনিটা তাই যেন তাকে বলে কানে-কানে। তার অক্ষমতার জন্যে সারেঙ রাগ করলেও তাকে যে সরাসরি মারে না তাতেই নাসিম উৎসাহ খোঁজে।

কোম্পানির আলোতে তেজ নেই বৃষ্টি নামলে তেরপল নেই, মেয়ে-পুরুষের আলাদা কামরা নেই, তবু সবাইর চোখে ঘুম আছে। এমন ভদ্রযাত্রী নেই যে তাস খেলে বা গান বা খোসগল্প করে। চাষা-ভুষোর লাইন। বন্যার তোড়ের মত যারা খাটে, তার তলে-তলে মাংসপিণ্ড হয়ে যারা ঘুমোয়।

ঘুমের আগোছালে ট্যাঁক থেকে কার বেরিয়ে এসেছে টাকার পুঁটলি। নাসিম তা হাত-সাফাই করে তুলে নেয় আলগোছে। একবার ভাবে গুনে দেখি কত আছে। ভাবে পালিয়ে যাই পরের ইস্টিশনে। কিন্তু কে জানে, কী অদম্য আকর্ষণে সারেঙের কাছেই নিয়ে আসে। প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বাঘের মুখে গরুর মতো। যে শুধু মারে,

যে হাসিমুখে কথা কয় না, ন্যায্য অধিকারের কানাকড়িত দেয় না হাতে ধরে, তাকেই খুশি করতে আগ্রহ হয়। যে অনবরত চুকলি শোনে, একের থেকে অন্যকে আলাদা করে রাখে তারই মন পাবার জন্যে কাড়াকাড়ির ধুম পড়ে যায়। কে কাকে হটিয়ে দেবে, চলে তার টেক্কাটক্কি।

'মোটে সাত টাকা সাড়ে ন' আনা। বলে মুকবুল : এতে কী হবে! দুকুড়ি সাত না হওয়া পর্যন্ত খেলা থাকে না, বলে আমাদের সরেঙ সাহেব।'

তবু কাপড়-চোপড়ের চেয়ে নগদ টাকা ভালো। সবচেয়ে ভালো যদি হয় কিছু জেওর, সোনা-রূপা। দাম কত আজকাল! কাগজের টাকা তার কাছে রদ্দি, ওঁচা।

একখানা নতুন লুঙ্গি হয়েছে এত দিনে। এবার একটা হাফ-সার্ট।

কিন্তু গয়না কোথায় চাষার বউ-ঝিয়ারীদের? বড় জোর নাকে আংটি চুংটি হাতে কাচের চুড়ি। সোনাদানা নেই কোথাও।

না, আছে। নতুন-বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। গলায় সোনার হাসনা, হাতে বটফুল। পায়ে রূপোর খাড়ু, আঙুলে গুজরী। ফরসা রঙের শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে ঘুমিয়ে আছে এক পাশে। বরযাত্রীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক্-ওদিক্। কে কোথায় চেনবার উপায় নেই। নিফাঁক ভিড় আজ জাহাজে। তবু এরি মধ্যে ফাঁক খুঁজছে নাসিম।

নতুন-বউর গলার কাছে নাসিম হাত রাখল, নরম তার গলার কাছটা। আঙুল কাঁপল না নাসিমের। একটানে ছিঁড়ে ফেলল হাসনা।

'চোর! চোর!' ভিড় ঠেলে ক'পা এগুতে না এগুতেই নাসিমকে ধরে ফেলল যাত্রীরা। তারপর সবাই তাকে মার লাগাল। প্রচণ্ড মার! যে এসে জিজ্ঞেস করছে কী হয়েছে সেও পরক্ষণে মার লাগাচ্ছে। বামাল সরাতে পারে নি চোর বউর বিছানার গোড়াতেই ফেলে এসেছে। তাতে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে তো! হার তো ছিনিয়ে নিয়েছে গলা থেকে। মার, মার, চাঁদা তুলে মার!

'বাবাগো—'নাসিম চিৎকার করে উঠল।

আচকান গায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, চটি গায়ে সারেঙ এসে হাজির। বলে 'কী হয়েছে? কেন মারছো আমার ছেলেকে?' ছেলে। সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সারেঙ সাহেবের ছেলে। কে বললে, 'ও আপানার চাকর ছিল তো জানতাম।'

চাকর! মিথ্যে কথা ও আমার বিয়ার ঘরের ছেলে আমার মা-হারা সন্তান। ওকে মারে কে?'

'ও গয়না চুরি করেছে নতুন দুলহিনের। গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে হাসনা।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না। চল, আমি নিজে পুছ করিগে বিবিকে।'

সারেঙ এগিয়ে এল নতুন-বউর নজদিগে। বললে, 'আপনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছে কেউ?'

পরদার বিবি ঢাকা-মুখে গলা খাটো করে বললে, 'না! ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।'

লতাবাড়ি ইস্টিশান দেখা যায় কাছাকাছি; বরের পার্টি নামবে এইখানে। জাহাজ ঢিমে হয়ে এল। নোঙর নামতে লাগল হড়হড় করে।

কাছির বাঁধ পড়ল গাছের সঙ্গে।

'সিঁড়ি দে। সিঁড়ি দে।' উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সারেঙ : 'নাসিম কই? নাসিমকে ডাক। সে আজ সিঁড়ি ধরবে।'

খালাসীদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেল। নাসিমের দীক্ষা হল এতদিনে, এত অল্প দিনে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই কপাল ফিরল তার। আর যারা ধরা পড়েনি তারা এখনো নাকানিচুবুনি খাচ্ছে। সিঁড়ি থেকে পাটাতনে প্রমোশন পাচ্ছে না। আর এ সিঁড়ি, কাল পাটাতনে, পরশু শুখানি, পরে একেবারে সারেঙ কাপ্‌তেন, জাহাজ নাখোদা।

'ধর্, ধর্, ও ছেলেমানুষ ও একা কেন পারবে? তোরা সবাই মিলে ওকে সাহায্য কর্।' উপর থেকে জোরালো গলায় হুকুম হাঁকে সারেঙ।

সার্চ লাইটের আলোয় নাসিমের জলে ভরা চোখ দুটি চকচক করে ওঠে।

নতুন-বউ নেমে যাবে লতাবাড়ি। পায়ে গুজরী বাজিয়ে আসছে।

আলো পড়েছে অনেক দূর। গাছ-গাছালির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে লগি ধরছে নাসিম। দুলহিনকে বলছে, 'টলে পড়ে যাবেন। লগি ধরুন।'

'না', লগি না ধরেই টলতে লাগল নতুন-বউ।

পিছন থেকে কে ধাক্কা মারল নাসিমকে। চমকে চেয়ে দেখে, সেই লোকটা, ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে যে তাকে বেশি মেরেছে আলোতে চিনল তাকে এতক্ষণে। গহরালি।

আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু। ঘন করে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। গায়ের চাদরটা বোরখার মত চাপিয়ে দিয়েছে গায়ের উপর। ঘাটে অনেক বিরানা পুরুষের আনাগোনা।

ধরাধরি করে সিঁড়ি তুলতে লাগল নাসিম একের পর আরেক চিল্‌তে। পারের কাছেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা-মুখ। তার উপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে। উড়ছে তার শাদা আচকান, শাদা দাড়ি। দিনরাত করে যে সূয্যি, যেন তার মতো চেহারা।

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—)

জন্ম ওড়িশায় ঢেঙ্কানলে। সব্যসাচী লেখক। প্রধান উপন্যাস ছয় খণ্ডে 'সত্যাসত্য (১৯৩২-৪২)। তিন খণ্ডে 'রত্ন ও শ্রীমতী' (১৯৫৬-৭৩)। গল্পের রূপবৈচিত্র্য আর বক্তব্য—দুয়ের প্রতিই তাঁর ঝোঁক। কাহিনীসর্বস্ব গল্পে তাঁর আস্থা নেই। সাহিত্য-জীবনের শুরুতে লিখতেন ওড়িয়া, ইংরেজি এবং বাংলায়। এখন লেখেন কেবল বাংলায়।

রানীপছন্দ্

লঞ্চ পাওয়া গেল অনেক দিনের অপেক্ষায়। কয়েকটি পরিদর্শনের কাজ বাকী ছিল। বছর শেষ হবার আগে ইনস্পেকশন শেষ হওয়া চাই। দুধারে নদীতীরের দৃশ্য, সামনে রাঙামাটি অঞ্চলের পাহাড়ের সারি, কর্ণফুলীর বুকে লঞ্চ ভাসিয়ে দিতে না জানি কেমন রোমান্টিক লাগে। সঙ্গে কাগজ কলম নিয়েছিলুম। বহু কাল পরে কবিতা লিখব। সহযাত্রী বলতে সারেঙ, সুখানি ও তাদের দলবল আর আমার চাপরাশি খানসামা। তাদের উপর কড়া হুকুম ছিল কেউ যেন আমার কাছে না ঘেঁষে।

ডেক চেয়ারে বসে নোঙরা তোলা দেখছি, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দারোগা সাহেব। হাতে একখানা চিঠি। কী ব্যাপার! আবার কোথায় কি বাধল! আমাকে কি এরা স্টেশন ছাড়তে দেবে না! চিঠিখানা খুলে দেখা গেল, তা নয়। কলকাতা থেকে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এসেছেন। তাঁকেও যেতে হবে রাউজান। তিনি যদি আমার সঙ্গে যান, তাহলে কি আমার খুব বেশি অসুবিধা হবে? নয়তো তাঁকে একদিন চট্টগ্রামে বসে থাকতে হয়। পুলিশের লঞ্চ কাল ফেরবার কথা আছে।

অসুবিধা হবেই তো। কিন্তু সে কথা কি লেখনীর মুখে জানানো যায়! হয়ে গেল আমার কবিতা লেখা। মনে মনে বাপান্ত করলুম আর দেঁতো হাসি হেসে বললুম, 'সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।' দারোগা সাহেব গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে লম্বা-চওড়া সেলাম করলেন। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, আপত্তি করলে এমন কী অভদ্রতা হতো! এমন কী জরুরী কাজ যে লঞ্চের জন্যে একদিন বসে থাকলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে!

শিষ্টাচারে খান বাহাদুরের জুড়ি মেলে না। তিনি কী বলে যে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন বাংলাভাষায় শব্দ খুঁজে পেলেন না। ইংরেজি ও উর্দূর আশ্রয় নিলেন। পাঞ্জাবী মুসলমান। বয়সে অনেক বড়। গোঁফ দাড়ী রাখেন না বলে কতকটা কমবয়সীর মতো দেখায়। হাসিখুশি দিলদরিয়া মেজাজের লোক। ইতিমধ্যেই খবর নিয়ে জেনেছেন যে, আমি একজন সাহিত্যিক। বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমার অনেক দিনের সাধ। সে আলাপ যে এইভাবে হবে তা কে জানত!

সত্যি, আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না আপনার নির্জনতা ভঙ্গ করতে। আমি তো একদিন বসে থাকতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু এস পি আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল আপনার সঙ্গে লঞ্চে। শুনেছেন বোধ হয় খবরটা?'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কই না! কোন খবর?'

"খুব খারাপ খবর।' ভদ্রলোক আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'তা নইলে, মশায়, ট্রাঙ্ক কল পেয়ে সোজা কলকাতা থেকে ছুটে আসি? আরে ছি ছি! শেমফুল! বেশরম!'

আমি রীতিমতো উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু জানতুম খান বাহাদুর আপনা থেকেই বলবেন, ভান করলুম যেন পরের কেচ্ছায় আমার কিছুমাত্র রুচি নেই।

"আপনারা সাহিত্যিক, আপনারা কথায় কথায় বলেন, সত্য শিব সুন্দর। কিন্তু আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছয় বয়সের অভিজ্ঞতা বলছে, যা সত্য তা সুন্দর নয়। যা সুন্দর তা শিব নয়। আমি যদি কোনা দিন কেতাব লিখি আমি কী লিখব শুনবেন? লিখব, সুন্দর মেয়েরা প্রায়ই মন্দ হয়, মন্দ মেয়েরা প্রায়ই সুন্দর হয়।' এই বলে খান বাহাদুর হো-হো- করে হেসে উঠলেন।

হাসলুম আমিও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললুম, 'আমাদের বাংলাদেশে নয় কিন্তু।'

ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে বললেন, 'না, বাংলাদেশে নয়! বাংলাদেশে কাজ করে করতে চুল পেকে গেল, দাদা! আর এই যে রাউজান যাচ্ছি—'

'রাউজান।'

'রাউজান যাচ্ছি এটা কি বাংলাদেশের বাইরে!'

আলাপ দেখতে দেখতে জমে উঠল। আমি আমার খানসামাকে ডেকে পাঠাতেই তিনি বলে উঠলেন, 'আরে না, না, দাদা। আপনি আমার মেহমান।'

কেমন করে আমি তাঁর মেহমান হলুম! লঞ্চ তো বলতে গেলে আমার। কিন্তু কে শোনে আমার কথা! বিকেলের চা'র অর্ডার তিনিই দিলেন। লঞ্চ ততক্ষণে সদরঘাট ছেড়ে দিয়েছে।

পাশাপাশি দু'খানা ডেক চেয়ার পেতে পাহাড়ের দিকে মুখ করে জাঁকিয়ে বসলুম। খান বাহাদুর বলতে লাগলেন, 'যে সে লোক নয়, দাদা। একটা সার্কলের ইনস্পেক্টর। এককালে আমি ওর এস পি ছিলুম। ওর কাজ দেখে তারিফ করেছি। মাথা পাগলা নয়; কবি নয়,—মাফ করবেন বেয়াদবি। সচ্চরিত্র বলে সুনামও ছিল ওর। এমন মানুষ কিনা চাকরির মায়া কটিয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে না তাকিয়ে—বিবি নেই, নইলে আফসোসের বাত হতো—এমন মানুষ কিনা হঠাৎ উধাও হলো।'

'উধাও হলো!' আমি চমকে উঠলুম।

'আর বলেন কেন লজ্জার কথা!' খান বাহাদুর রেশমী রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন,

চোখ মুছলেন। 'গিয়েছিল খুনী মামলার তদন্ত করতে। বর্মী মেয়ে, মশায়। শয়তান কী লড়কী। তোরা বাঙালী মুসলমান, তোদের বরাতে সইবে কেন! বিয়ে করে এনেছিল রেঙ্গুন থেকে। যে লোকটা খুন হয়েছে তার কথা বলছি। অমন রূপসী নাকি বর্মাতেও নেই। সতীন আছে দেখে অমনি খসমের গলায় ছুরি দিয়েছে।'

'আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলুম। কই, এ মামলার খবর তো আমার কাছ আসে নি!'

'যা বলছিলুম। গিয়েছিল তদন্ত করতে। দারোগাই করেছিল তদন্ত। তবে মেয়েটা বাংলা বোঝে না বলে ইনস্পেক্টারকেও যেতে হয়েছিল। ওই তদন্তই ওর কাল হলো। একদিন দুদিন যায়, তদন্ত আর ফুরোয় না। শেষ কালে দেখা গেল আসামীও নেই, অফিসারও নেই। হো-হো! হা-হা!'

হাসির কথা নয়। নারীহরণের মামলায় আমি কোনদিন কাউকে ছাড়ি নি। আমি বেশ একটু উষ্ণ হয়ে বললুম, 'এতদিন আপনারা করছেন কি? কেন ওকে গ্রেপ্তার করা হয় নি? এ শুধু ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয়। কোর্টের ব্যাপারও বটে।'

খান বাহাদুর একটু কঠিন হয়ে বললেন, 'কোর্টের ব্যাপার কিনা সেইটাই তো প্রশ্ন। মেয়েটা বিধবা, সুতরাং ফুসলানির অভিযোগ টেকে না। মেয়েটার বয়স হয়েছে, সুতরাং হরণের অভিযোগ খাটে না। কোন ধারায় আপনি ওকে অপরাধী করবেন, শুনি?'

আমি নিরুত্তর। বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'তারপর যদি ওরা বিয়ে করে থাকে? না, দাদা, অত সহজ নয়। চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে সকলে পারে, কলকাতার পুলিশ দপ্তর থেকে সে ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে আপনার হাত নিসপিস করলেও তার আগে আইনটা একটু পড়া লাগবে।'

সত্যি তাই। বড়ো মাছটা ছিপ থেকে ফস্কে গেলে যেমন কষ্ট হয়, তেমনি কষ্ট হলো আমার। খান বাহাদুর কিন্তু এর জন্য দুঃখিত নন। বললেন, 'শুনছি ওরা পার্বত্য চট্টগ্রামে গা ঢাকা দিয়েছে। সেখান থেকে বর্মা চলে যাবে হাঁটা পথে। তারপর ক'দিন রূপসীর অনুগ্রহ থাকবে কে জানে। লোকটাকে বাঁদর নাচিয়ে একদিন জবে করবে কি লাথি মারবে খোদা জানেন। সুন্দর মুখ দেখলে আমি দূর থেকে সেলাম করে সরে পড়ি।'

আইনের বই আমার সঙ্গে ছিল না। সেইজন্যে জোর করে বলতে পারছিলুম না যে আসামীকে যদি কেউ ফেরার হতে সাহায্য করে আইনে তার সাজা আছে। মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছিলুম, তা লক্ষ্য করে ভদ্রলোক বললেন, 'যা দিনকাল পড়েছে আপনি হয়তো ভাবছেন আমি পুলিশ বলে পুলিশের জন্যে আমার দরদ, আমি মুসলমান বলে মুসলমানের জন্যে আমার দরদ। সত্যি বলছি, তা নয়। আমি পুরুষ বলে আমার দরদ পুরুষের জন্যে, মেয়েটাই নরহরণ করেছে।'

এ কথা শুনে আমার ভিতরে যে ফেমিনিস্ট ছিল, সে প্রতিবাদ না করে পারল না। সে বলল, 'যার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিভ্যালরি আছে সে কখনো নারীকে দোষ দিতে পারে না। দোষ সব সময় পুরুষের। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কারুরি নয়। নিয়তির।'

'হাঁ হাঁ। এ বাত ঠিক। নিয়তির।' খান বাহাদুর প্রীত হয়ে বললেন, 'ঠিক এইরকম নিয়তির খেলা দেখছি আমার প্রথম যৌবনে। আমার এক বন্ধুর জীবনে। বন্ধুটি হিন্দু। আপনি হয়তো মনে করবেন, এ কী কথা! হিন্দু কবে থেকে মুসলমানের বন্ধু হলো? কিন্তু আজকের এই বিশ্রী আবহাওয়া বিশ বছর আগে ছিল না। মহাযুদ্ধের শেষে আমরা দুজনে যখন মিলিটারী থেকে বেরিয়ে পুলিশের চাকরি পাই, তখন কে হিন্দু কে মুসলমান! আহা, সে সব দিন কি আর ফিরবে না!'

তাঁর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। স্মৃতির সরণি বেয়ে তিনি বিশ বছর নিচে নেমে গেলেন, যেখানে সঞ্চিত ছিল পুরাতন মদিরা। অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'ঘটনাটা কতকালের পুরোনো। আমারই মনে ছিল না। হঠাৎ কেমন করে মনে পড়ে গেল। এই যে, বেশ স্পষ্ট মনে পড়েছে। দেখতে দেখতে সব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।'

তাঁর দিকে চোখ ফেরালুম। তিনি কি সেই মানুষ না আর কেউ! একজন নওজোয়ান অর্ধশয়ান হয়ে স্বপ্ন দেখছে। হু-হু করে ছুটে আসছে বাতাস। বাতাসকে ঠেলা দিয়ে ছুটে চলেছে লঞ্চ। জল দুভাগ হয়ে চিরে-চিরে যাচ্ছে কাটা কাপড়ের মতো। ঢেউ পড়ে থাকছে পিছনে। ঢেউয়ের দোলা লেগে উঠছে ও নামছে পেছিয়ে যাওয়া সাম্পান।

খান বাহাদুর বলতে লাগলেন।

দুই

মেহেরবান সিং রাজপুত ঘরানা। আমার পুর্বপুরুষেরাও রাজপুত ছিলেন। যে যাই বলুক, রক্তের টান বলে একটা কিছু আছে। রাজপুতের সঙ্গে আমি যতটা আত্মীয়তাবোধ করি এ দেশের মুসলমানদের সঙ্গেও ততটা নয়। তা বলে হিন্দু ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই। ধর্মের বেলা আমি গোঁড়া মুসলমান। তখন সেই সারেঙ সুখানি চাপরাশি খানসামা আমার আপনার লোক। আর মেহেরবান সিং আমার একজন দোস্ত।

কিন্তু ওর মতো দোস্ত তখনকার দিনে কেউ আমার ছিল না। রোজ আমাদের দেখা হতো। আর দেখা হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত খোশগল্পে আর দিবাস্বপ্নে। তখনকার দিনে সিনেমা ছিল না এখনকার মতো। আমাদের যেখানে চাকরি সেখানে মাঝে মাঝে সিনেমা আসত কিছু দিনের জন্যে। সে ক'টা দিন আমরা দুজনে একসঙ্গে

সিনেমায় যেতুম। তামাশা দেখতুম। অন্যান্য অফিসারদের মতো আমরা গান শুনতে বাঈজীর বাড়ি যেতুম না। দুজনেই ছিলুম পিউরিটান কিসিমের লোক। ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, আমার বিবি তখন বাপের বাড়িতে। ও চায় শিক্ষিতা মেয়ে। তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না।

এখন হয়েছে কি, পাঞ্জাবের ঐ ক্যান্টনমেন্ট শহরটিতে এক মিলিটারি কন্ট্রাক্টর ছিল, তার অনেক লাখ টাকা। আমরা যখন সেখানে যাই, তখন সে মারা গেছে। তার সম্পত্তির অর্ধেক পড়েছে তার বড়ো বৌয়ের হিস্‌সায়, অর্ধেক তার ছোট বৌয়ের হিস্‌সায়। বড়ো বৌ থাকে ঠাকুর দেবতা নিয়ে। আর ছোট বৌ থাকে আমোদ-প্রমোদ নিয়ে। দুজনের একজনেরও বালবাচ্চা হয় নি। যে যার নিজের মহলে থাকে। নিজের দাসদাসী, নিজের গাড়িজুড়ি। বিলকুল আলাগ বন্দোবস্ত। লোকে বলত বড়ো রানী, ছোট রানী, কারণ স্বামীর রাজা খেতাব ছিল।

আমরা যখন সেখানে যাই তখন সকলের মুখে শুনি সূরযভান যেমন সুন্দরী তেমন সুন্দরী কেউ কোথাও দেখে নি। কিন্তু সুন্দরী হলে হবে কী, তার চালচলন তেমন ভালো নয়। সে পর্দা মানবে না। ক্লাবে যাবে। সাহেবদের সাথে নাচবে। স্টেশনের যত অফিসার সবাইকে ডেকে পার্টি দেবে। কেউ তাকে দুবার একই শাড়ী পরতে দেখছে বলে শোনা যায় না। তার জুতো কমসে কম দু-পাঁচশো জোড়া হবে। সে নাকি দুধের সর মাখে আর দুধের হাউজে গোসল করে। আর সেই দুধ নাকি পরে বাজারে বিক্রি হয়।

জোর গুজব সে যাকে একবার নেকনজরে দেখবে তার আর কোনো কামনা অতৃপ্ত রাখবে না। সে যাই হোক না কেন। তার বিচার নেই, সে ধন চায় না, উপহার চায় না। কেবল তার পছন্দ হলে হলো। পছন্দ কিন্তু সহজে হয় না।

জয়েন করার দু-তিন সপ্তাহ পরে আমার নামেও সূরযভানের নিমন্ত্রণপত্র এলো। গার্ডেন পার্টির নিমন্ত্রণ। মেহেরবানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলুম তার নামেও এসেছে। কিন্তু সে যাবে না। কেন যাবে না? কারণ, সে অমন স্ত্রীলোকের সংস্রব রাখতে চায় না।

আমি রসিকতা করে বললুম, 'এক জাতের আম আছে, তার নাম রানীপসন্দ্। তোমার ইচ্ছা করে না রানীপসন্দ্ হতে?'

'আমি তো আম নই। আমার আত্মসম্মান আছে। চিরকাল পছন্দ করে এসেছে পুরুষ। পছন্দের অধিকার পুরুষের। এ ক্ষেত্রে তা নয়। সূরযভান আমাকে চোখ দিয়ে যাচাই করবে। আর চাইকি আমাকে না পছন্দ করবে!' বলতে বলতে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

'কেন? স্বয়ংবর তো রাজপুতদেরই প্রথা।'

হাঁ, কিন্তু স্বয়ংবরে যারা না পছন্দ হতো তারা লড়াই করে কেড়ে নিত। তা ছাড়া

কিসের সঙ্গে তুলনা! কোথায় কুমারীর স্বয়ংবর আর কোথায় বিলাসিনীর লীলামৃগয়া।'

মেহেরবানকে আর এ নিয়ে উত্ত্যক্ত করলুম না। আমি একাই গেলুম। সুন্দরী বটে সূরযভান। কী করে তার বর্ণনা দেব! আমি আপনার মতো কবি নই। অন্ধকার রাত্রে আতসবাজি ছাড়লে যেমন আসমান উজালা হয়, নানা রঙের তারা ফুটে ওঠে, ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই যে যা দেখছি তা বারুদ গন্ধক সোরা ইত্যাদির খেল, তেমনি বহুজনের মেলায় সূরযভানের উদয়। প্রত্যেকেই বেশ কিছুটা আত্মসচেতন হতো। আয়না থাকলে আয়নায় মুখ দেখে নিত। কে জানে মুখখানা রানীপসন্দ্ কি না!

তারপর যতবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি ততবার গেছি। রানীপসন্দ্ হতে নয়। এমনি আতশবাজি দেখতে। কিন্তু মুশকিল হলো মেহেরবানকে নিয়ে। সে না পারে যেতে, না পারে থাকতে, না পারে বদলি হয়ে পালাতে। তার গর্ব তাকে যেত দেয় না। তার কৌতূহল তাকে থাকতে দেয় না। তার কর্তব্যবোধ তাকে পালাতে দেয় না। আমি বুঝতে পারি সে ছটফট করছে। তাকে বলি, 'তুমি ছুটি নিয়ে বাড়ি যাও। সাদী করো।' সে চুপ করে শোনে। উত্তর দেয় না।

একদিন সূরযভান আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, মেহেরবান সিং আপনার বন্ধু না? তিনি কেন আসেন না? আপনি তাঁকে নিয়ে আসতে পারেন না?

আমি কোনমতে পাশ কাটিয়ে যাই। সত্যি কথা বলি কী করে? সদা সত্য কথা বলিও, পাঠ্যপুস্তকেই শোভা পায়। কিন্তু ফিরে গিয়ে মেহেরবানকে খুলে বললুম। সে ও কথা শুনে কেমন যেন দিশেহারা বোধ করলো। খুশি হবে, না রাগ করবে, না কী করবে বুঝতে পারলো না। আমাকে ফেলে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

পরের বার সূরযভানের পার্টিতে দেখি মেহেরবান হাজির। আমিই পরিচয় করিয়ে দিলুম। আয়না কোথায় পাব? থাকলে একখানা এনে দিতুম। তবে তার দরকার হলো না। সূরযভানের চোখই তো আয়না। সেই সুন্দর কালো চোখে মেহেরবান দেখতে পেলো তার আরক্ত মুখ। এক-দু সেকেণ্ডের মধ্যে কত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল। কেউ টের পেল না। আমি ছাড়া।

মেহেরবানকে আমি ক্ষ্যাপাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সাহস হয় নি। তার চেহারা দেখে পেছপাও হয়েছি। সে কলের মতো কাজ করে যায়। ডিউটি বাজিয়ে যায় সম্মানে। আমার সঙ্গে মেলামেশারও বিরাম নেই, তবু ভিতরে বদলে যেতে থাকে। আপনা থেকে আমাকে যদি কিছু বলে ত শুনি। গায়ে পড়ে আমি কিছু বলিনে।

তার সর্বশরীর উন্মুখ হয়ে রয়েছে একজনের জন্যে। সমস্ত মন পড়ে আছে ওর কাছে। অথচ স্বীকার করবে না। মুখে বলবে অন্য কথা। বলবে, 'আমি ওকে ঘৃণা করি। ওর অঙ্গ দূষিত। ওর সঙ্গ দূষিত। ওটা একটা গণিকা ভিন্ন আর কী! টাকা নেয় না, এই যা তফাৎ। আমার যদি খেয়াল হয় আমি সরাসরি কোনো এক গণিকার

কাছে যাব। সেখানে আমার পছন্দ খাটবে। আমি দাম দিয়ে ভোগ করব। কিসের দুঃখে সূরযভানের দ্বারস্থ হবো! হলে যে সে-ই আমাকে পছন্দ করবে, সে-ই দাম দিয়ে ভোগ করবে। আমি কি রানীপসন্দ্?'

এমনি কত লেকচারই না শুনতে হতো দিনের পর দিন। তার ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। সে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। আমার কাছে কবুল করবে না যে সে আকৃষ্ট হয়েছে। আমি বুঝি সবই, কিন্তু জানতে দিই না যে আমি বুঝি। আমি বলি, 'কেউ তোমাকে যেতে সাধছে না। তুমি না গেলে যে কেউ কিছু মনে করবে তাও নয়। সূরযভান যেমন সবাইকে নিমন্ত্রণ করে তেমনি তোমাকেও করে। কাকে ওর পছন্দ কাকে নয় তা কি ও প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দেয়? ওসব ইসারায় ঠিক হয়ে যায়। অনেকরাত্রে কোনো এক সঙ্কেতস্থলে ওর গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কোনো এক জনকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়। কেউ কেউ লক্ষ্য করে কিনা সন্দেহ। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে যায় আরেক জায়গায়।'

'পাজি মেয়েমানুষ! বদমায়েস মেয়েমানুষ!' মেহেরবান তেতে উঠে গালাগাল দেয়। 'ডাকু মেয়েমানুষ! শয়তান মেয়েমানুষ!' আর যা যা বলে তা অশ্রাব্য অশ্লীল।

আমি প্রতিবাদ করি, 'তোমার তো কোনো লোকসান করে নি। তুমি কেন ইতর ভাষায় আক্রমণ করছ? এটা কেমন ধারা সভ্যতা?'

কয়েকদিন পরে মেহেরবান বলে, 'সেদিন যে বলেছিলে সব ঠারে-ঠোরে কি হয়ে যায়, কী ঠার? বাজারে একখানা চটি বই পাওয়া যায়। তাতে একরকম ঠার আছে।'

আমি বলি, 'তোমার তাতে কাজ কী? তুমি তো যাচ্ছ না। না যাচ্ছ?'

'আমি যাব ঐ খানকিটার বাড়ি। অসম্ভব। আমার নাম মেহেরবান সিং। আমরা হলুম চৌহান রাজপুত। অবস্থার ফেরে পুলিশের চাকরি করতে হচ্ছে। তা বলে কি আমাকে অধঃপাতে যেতে হবে! শেষকালে তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে! তুমি রাঠোর বংশধর।'

কী আর করি। চুপ করে শুনে যাই। লোকটা দিন দিন বাউরা হয়ে উঠেছে। যা করতে তার প্রাণ চায় তা করলে তার মান যায়। আর কী দুর্বার আকর্ষণ ওই সুন্দরী নারীর! ঐ মন্দ নারীর! চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যাবে লোহাকে।

আমার বরাত ভালো আমাকে চায় নি। কিন্তু মেহেরবানকে যেন টোনা করেছে। বশীকরণ বলে একটা বিদ্যা আছে, তা তো আগে বিশ্বাস করতুম না। ক্রমে প্রত্যয় হলো। মেহেরবান আমার পাশের বাসায় থাকতো। তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখলুম। রাত দশটায় বেরিয়ে যায়। শেষ রাত্রে ফেরে। উস্কো-খুস্কো চেহারা। পাগলের মতো চাউনি। কথাবার্তায় বাঁধুনি নেই। কী যে বলে যায় আবোল-তাবোল! বুঝতে পারি কেবল অশ্লীল শব্দগুলো। ঝুড়ি-ঝুড়ি অশ্লীল কথা। হিসেব করে দেখি দিন দিন বাড়ছে তাদের সংখ্যা।

ইচ্ছা করে ওর বাড়িতে খবর দিয়ে গুরুজনকে আনাতে। এখনো বেশিদূর গড়ায় নি। যা ঘটবার তা ঘটে নি। এই বদ খেয়াল একদিনে মিটে যায় সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে দিলে। বদলি হয়ে লাহোর বা অমৃতসর গেলেই সূরযভান ঠিক আতসবাজির মতো নিবে যাবে। কিন্তু মেহেরবানের গুরুজনকে খবর দিতে আমার সাহসে কুলোয় না। ও যদি রাগ করে! মানুষটা এমনিতে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু রাগলে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

এরপরে যেদিন সূরযভানের পার্টিতে যাই সেদিন মেহেরবানও যায়। সেদিন ঠারেঠোরে সব ঠিক হয়ে যায়।

দিনকয়েক পরে আমি প্যারেডের জন্য পোশাক পরছি মেহেরবান সিং এসে বাগড়া দিল। তার চোখে মুখে প্রতি অঙ্গে জয়ের উল্লাস। তবু বিষাদের ভঙ্গী করে বলল, 'আমি মরে গেছি।'

আমি অনুমান করলুম এর অর্থ কী। তা হলেও ভড়কে গিয়ে বললুম 'কেন! কী হয়েছে?'

'আমি রানীপসন্দ্ বনে গেছি!' সে করুণ স্বরে বলল।

'হুঁ!' আমি গম্ভীর স্বরে বললুম, 'কাজটা ভালো হয় নি। তার প্রমাণ তুমি প্যারেডে ফাঁকি দিচ্ছ। অমন করলে চাকরি রাখতে পারবে না।'

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'আমি অসহায়। আমার নিয়তি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তুমি তো আমার বন্ধু, তুমি আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারো?'

'কী পরামর্শ?' তার জন্যে সমবেদনায় আমার দিল দরদ হয়েছিল।

'আমি দাম দিতে চাই।' সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'না দিলে আমি বান্দা বনে যাব। আমার ইজ্জত থাকবে না।'

আমি ভেবে বললুম, 'ওর কিসের অভাব যে ও তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে? আর উপহার তুমি পঞ্চাশ টাকার দিলে ও পাঁচ হাজার টাকার দেবে।'

'আমি লাখ টাকার দেব।' সে তেজের সঙ্গে বলল। 'কিন্তু কোথায় পাব লাখ টাকা? কার তোশাখানায় হানা দেব? ট্রেজারি লুট করলে কেমন হয়?'

'আমি তার কথাবার্তা শুনে আঁতকে উঠলুম, সেইদিনই তার বাড়িতে চিঠি লিখে দিলুম অবশ্য রেখে ঢেকে! তার উপর কড়া নজর রাখতে হলো পাছে বাটপাড়ি রাহাজানি করে। প্যারেড ফাঁকি দেবার জন্যে সে ডাক্তারের কাছে গেছিল। ডাক্তারকে আমি বলে এলুম হাসপাতালে ভর্তি করতে। অবশ্য ওসব কথা ভেবে বলি নি।'

তার বড়ো ভাই ছুটে এলেন তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। ছুটি না পেলে সে যায় কী করে? ছুটির জন্যে দরখাস্ত করতে হলো। যতদিন মঞ্জুরী না আসে, ততদিন সবুর করতে হবে। ইতিমধ্যে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। একদিন সকালবেলা উঠে শুনলুম মেহেরবান সিং নিরুদ্দেশ। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলুম সূরযভানও নিরুদ্দেশ।

টি-টি পড়ে গেল শহরময়। সূরযভানের যারা ভক্ত তারা বলাবলি করল, হায়! হায়! সাময়িক একটা মোহের জন্য সারা জীবনের কেরিয়ার মাটি করল!

কেবল দু-পাঁচজন লোক রসিয়ে রসিয়ে বলল, রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব পেলে আমরাও নিরুদ্দেশ হতুম, হে। আর সূরযভানও কম বুদ্ধিমতি নয়। ছোকরা যেমন খানদানী তেমনি সুপুরুষ।

আমরা মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। বড়ো ভাই যখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন তখন আমিও তাঁর সঙ্গে কিছুদূর গেলুম। তিনি বললেন, 'অদৃষ্ট!' আমি বললুম, 'কিসমৎ!' আমরা হিন্দু মুসলমান একমত। যার নসীবে যা আছে তা তো ঘটবেই।

মাসের পর মাস যায়। মেহেরবানের খবর পাইনে। ওদিকে সূরযভানের বাড়ী অন্ধকার। তার কর্মচারীরা বলতে পারে না সে কোথায়। আমি আমার ডিউটিতে মন দিই।

এক বছর বাদে মেহেরবানের পাত্তা মিলল। সে তখন আজমীর শরিফে। আমা‌ে লিখেছে। আজমীর গিয়ে তীর্থ করতে। বুঝতে পারলুম আমার পরামর্শ চায়। ছুটি নিয়ে আজমীর গেলুম জেয়ারত করতে। মেহেরবান আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার কোয়ার্টার্সে! দেখলুম বেশ আছে ওরা দুটিতে। বৌ সেজে সূরযভান খুব লাজুক হয়েছে। আমার সামনেও আধা পর্দা।

মেহেরবানের কাছে যা শুনলাম তা বলছি।

শিয়ালকোট থেকে পালিয়ে ওরা নানা জায়গায় যায়। যেখানেই যায় সেখানেই কথা ওঠে, তোমাদের পরিচয় কি? স্বামী-স্ত্রী? এর উত্তরে সূরযভান হলে, হ্যাঁ। কিন্তু মেহেরবান মুখ বুজে থাকে। কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বার হয় না যে, তারা স্বামী-স্ত্রী। শুধু অসত্য নয়, অপ্রিয়ও বটে। অথচ ওরকম একটা পরিচয় না দিলে ঘর পাওয়া যায় না। তা হলে থাকতে হয় গিয়ে বাজারে। তেমন প্রস্তাবে সূরযভান জ্বলে উঠবে। সেও কম গর্বিতা নয়। সে কি বাজারের বেশ্যা!

তারপর যেখানেই যায় সেখানেই অবশেষে জানাজানি হয়ে যায় যে ওরা বিবাহিতা নয়। একদল যুবক জোটে ভাগ দাবী করতে। সৌন্দর্য এমন সামগ্রী যে, ভাগ না দিয়ে ভোগ করতে গেলে কেউ সহ্য করবে না। ঢিল মেরে তাড়াবে। পুলিশের কাছে নালিশ করতে যাও, পুলিশ চাইবে বিবাহের প্রমাণ। নয়তো মোটা ঘুষ। মেহেরবান হৃদয়ঙ্গম করল যে একা ভোগ করতে হলে শুধু দখল নয়, সত্ব থাকা চাই। সূরযভান যে তার বিবাহিতা পত্নী এর দলিল দাখিল করতে হবে।

রাজপুতের ছেলে। বিয়ে করবে কিনা বেনের বিধাবাকে! তাও যদি সে সতী নারী হয়ে থাকত। বুক ফেটে কান্না আসে। এমনিতেই তার মাথা হেঁট। এর পরে কি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে! মেহেরবান ভেবে দেখলে পালাবার পথ নেই। চাকরি

তো জুটবেই না, গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষ করতে গেলেও গুরুজনের তিরস্কার দুবেলা শুনতে হবে। কেই বা তাকে বিয়ে করবে তখন! বিয়ে না করে স্ত্রী সহবাসের কী উপায়! তবে কি সে এই বয়েসে সন্ন্যাসী হবে!

যদি না পালায় তা হলে দুটিমাত্র পন্থা। হয় বিয়ে, নয় ভাগ। দুটোতেই মেহেরবানের সমান বিতৃষ্ণা। আর সূরযভানের? মেহেরবানের বিশ্বাস দুটোতেই সূরযভানের সমান তৃষ্ণা।

ভাগ সে প্রাণ ধরে করবে না। তার চেয়ে মরণ ভালো। তা হলে বাকী থাকে বিয়ে। বিয়ের নাম করলে তার চোখে জোয়ার আসে, তার হৃদয় হা-হা করে। তার জাতকুলের গর্ব, তার পৌরুষের দর্প, তার নীতিবোধ বিষম ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

বাধ্য না হলে সে কিছুতেই ও কাজ করত না। বিয়ে! রাঁড়কে বিয়ে! বেনেনীকে বিয়ে! অসতীকে বিয়ে! বাধ্য হলো ভাগীদারদের দাবীদাওয়া এড়াতে। ভাগ না করে নির্বিঘ্নে ভোগ করতে। অবিভক্ত স্বত্বে স্বত্ববান্ হতে।

বিয়ের পরেই ফতোয়া দিল, পর্দানশীন হতে হবে।

সূরযভান এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বিয়ের জন্যে সে মনে মনে কৃতার্থবোধ করছিল। রাজপুত্র তাকে বিয়ে করবে ও যে তার শৈশবের স্বপ্ন। এমন অলৌকিক ঘটনা যদি বা ঘটল তবে তার জন্য কিছু কষ্ট সইতে হবে বইকি।

স্ত্রীকে পর্দায় পুরে মেহেরবান এবার নিশ্চিন্ত হলো। এরপরে তাকে জীবিকার চেষ্টা করতে হবে। এরজন্যে পাঞ্জাবের বাইরে যাওয়া স্থির করল। যেখানে গা-ঢাকা দেওয়ার দরকার নেই। সোজা নিজের পরিচয় দেওয়া চলে। ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলো আজমীরে। তার জঙ্গী রেকর্ড দেখিয়ে রেলওয়েতে কাজ পেলো। মাইনে বেশি নয়। কিন্তু নিজের অন্ন।

এখানে দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। রেলওয়ের কাজ মাসে বিশ দিন সফর করতে হবে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শক্ত। একা রেখে গেলেও ভাবনা। অমন একখানি সাত রাজার ধন মানিক যার ঘরে সে যদি বাইরে বাইরে রাত কাটায় তা হলে কেউ হয়তো মওকা পেয়ে সিঁদ কাটবে। আর থানার খাতায় লেখা হবে গয়নাকাপড় তৈজসপত্র চুরি গেছে। আসলে কী চুরি গেল তা তো লেখবার মতো কথা নয়। যার চুরি গেল সে তখন সফরে।

মেহেরবান তা হলে করবে কি! ঘর সামলাবে না বাহির সামলাবে। বৌ রাখবে না চাকরি রাখবে! সূরযভানের তেমন কোনো সমস্যা নেই। তাকে দেখলে মনে হয় সে একটা স্থিতি পেয়েছে। সে রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখছিল, রাজপুত্র পেয়েছে। কিন্তু মেহেরবান কি এই চেয়েছিল! এই স্বপ্ন দেখেছিল!

আমার ডাক পড়ল এমন সময় আজমীরে। পরামর্শ দিতে।

ওরা বিয়ে করেছে শুনে আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছিলুম। আমি মুসলমান, আমার

তেমন কোন সংসার ছিল না। মেহেরবান রাগ করবে বলে আমি ওকে সে পরামর্শ প্রথম থেকে দিই নি। এখন সে আমার বিনা পরামর্শে যা করেছে তা ঠিকই করেছে। কিন্তু এই ঈর্ষাকাতরতার অর্থ আমি বুঝিনে। এই সন্দেহ কাতরতার। যার সঙ্গে সারাজীবন ঘর করবে তাকে পদে পদে অবিশ্বাস করলে চলে?

এর উত্তরে মেহেরবান বলে, 'ও যে ভয়ানক সুন্দর। সুন্দর না হলে সন্দেহ করতুম না। কুৎসিত হলে বিশ্বাস করা সহজ হতো।'

বোঝা গেল সৌন্দর্যকেই তার ভয়। এ ভয় কিসে ভাঙবে? সাতটা-আটটা সন্তান হলে? দুশ্চিকিৎস্য স্ত্রীরোগে ভুগলে? যৌবন অবগত হলে? কিন্তু এসবের তখন অনেক দেরি। সূরযভান আমাদেরই সমবয়সী। অকালে স্থবির হতে তার কিছুমাত্র ত্বরা ছিল না।

আমি বললুম, 'ভাই, যাই করো স্ত্রীর কুরূপ কামনা কোরো না। তোমাদের কোনো দেবতা যদি তোমার প্রার্থনা পূরণ করেন তখন ভুগতে হবে তোমাকেই।'

দেখলুম ওর মতিগতি সুবিধার নয়। অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে বিশ্রী করা যায় কিনা ভাবছিল। এমনভাবে ঘটাবে যেন এক আকস্মিক ঘটনা। আমি কড়া গলায় শাসিয়ে দিলুম। তলে তলে শিউরে উঠলুম। বললুম, 'তা হলে তুমি তালাক দাও। নয়তো ছাড়াছাড়ি করো।'

সে ও কথা তুলবে না। বলবে, 'পুলিশের চাকরিতে থাকলে মাইনে ও পেনসন মিলিয়ে আমি কয়েক লাখ টাকা কামাতে পারতুম। খরচ-খরচা বাদ দিলে আমার নীট সঞ্চয় হতো এক লাখ টাকা। সেই লাখ টাকা বলতে গেলে যৌতুক দিয়েছি। মোফত নিই নি। তবে আমি কেন তালাক দেব? আর ছাড়াছাড়ি কিসের? নিয়তি আমাদের একসূত্রে গেঁথেছে।'

হঠাৎ আমার একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললুম, 'আচ্ছা ও যদি তোমায় লাখ টাকা ফেরত দিত তুমি ওকে ছাড়ান দিতে?'

মেহেরবান একেবারে থ' বনে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কী ভাবল ওই জনে! বলল, 'ঠাট্টা করছ?'

'না। ঠাট্টা নয়।' আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললুম, 'এই একমাত্র সমাধান।'

'তুমি যদি ওকে ও কথা বলো', মেহেরবান আর্ত কণ্ঠে বলল, 'ও সত্যি সত্যি লাখ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তা হলে আমিই ওর কাছে কেনা হয়ে থাকব। রানীপসন্দ্।'

ওর মনের কথাটা এই যে, সূরযভান ওর মালিক হবে না। ওই হবে সূরযভানের মালিক। তারপর সূরযভান সুন্দরী নায়িকা হবে না। হবে কুরূপা বধূ। তা হলেই ও নিশ্চিত হবে, নিরুপদ্রব হবে। কিন্তু সূরযভানকে সে কথা মুখ ফুটে জানানো যায় না।

খাজা সাহেবের দরগায় নজরানা দিয়ে আমি আজমীর থেকে চলে আসি। তার

কিছুদিন পরে অবাক হয়ে দেখি যে সূরযভানের বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো। কী হয়েছে? কী হয়েছে? রানী ফিরে এসেছেন। আর কেউ এসেছে কি? না, আর কেউ তো আসে নি।

তিন

খান বাহাদুর বলতে লাগলেন। 'তারপরে মেহেরবানের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। চিঠি লেখালেখিও হয় নি। পাঞ্জাব থেকে আমি বাংলাদেশে বদলি হই। বদলি হই ঠিক নয়, গোপনীয় বিভাগে নিযুক্ত হই। তারপর থেকে এই প্রদেশে আছি। আমি যতদূর জানি এই শেষ।'

'এই শেষ!' আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হতে চায় না। 'বলুন, বলুন, তারপরে কী হলো? সূরযভানের কী হলো? মেহেরবানের কী হলো?'

লঞ্চ জল কেটে কেটে চলছিল। জলের ছিটে উড়ে এসে লাগছিল আমাদের গায়ে। কখন একসময় চা পান সারা হয়েছে। ডিনারের অর্ডার দিয়েছি আমি। খান বাহাদুর আমার মেহমান।

'আর, দাদা! বলে সুখ নেই। মানুষ চিনতে চিনতে বুড়ো হয়ে গেলুম। কিন্তু তখন তো চিনতুম না। তাই স্তম্ভিতই হয়েছিলুম।'

'কেন? কেন?' আমার কৌতূহল বাগ মানছিল না।

'লোকটা সত্যি সত্যি গিয়েছিল স্ত্রীর মুখে অ্যাসিড ঢালতে। এক ফোঁটা পড়েছিল তার গালে কি ঘাড়ে। সেইজন্যে সূরযভান আর পার্টি দেয় না। বোরোয় না। কিন্তু খুব বেশি ক্ষতি হয় নি। সূরযভানের সঙ্গে লাখ খানেক টাকার জহরৎ ছিল। সমস্ত মেহেরবানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে এক দৌড়ে রেলস্টেশনে হাজির হলো। তারপর সটান শিয়ালকোটে।'

আমি ঘেন্নায় কানে হাত দিয়েছিলুম। আর শুনতে রুচি ছিল না।

'মেহেরবান তো জহরৎ সামলাতে ব্যস্ত। তাড়া করে যাবে কী করে? কোনটা বেশি মূল্যবান? জহরৎ না আওরৎ? কার্যকালে দেখা গেল, জহরৎ।' খান বাহাদুর খেদোক্তি করলেন। মনে হলো তাঁর সহানুভূতি আওরতের প্রতি। হাতটা একটু ফাঁক করলুম।

কিন্তু সেটা আমার ভুল।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। পৌঁছতে দেরি আছে। খানারও দেরি। গল্পটা শেষ হয়ে গেলে কি নিয়ে আমরা থাকব? কান থেকে হাত সরিয়ে নিলুম।

খান বাহাদুর বললেন, 'ও ঠিকই হয়েছে, মশায়। অল্পের উপর দিয়ে গেছে।

ঘটনা তো এই একটা দেখলুম না। মেহেরবান একদিন ওকে খুন করতে পারত। সুন্দরীরা চঞ্চলা হয়ে থাকে। একদিন হয় তো একটু চনমন করতো আর অমনি জানটা হারাত। বেঁচে গেছে এই ঢের। অ্যাসিডের দাগ লেগে সৌন্দর্যের যদি বা একটু হানি হয়ে থাকে সেটা মনে করুন, ওর পাপের সাজা।'

আমি কথাটি কইলুম না। পাপতত্ত্বে আমার আস্থা ছিল না। পাপের সাজা আবার পাপীতে দেবে, এটাও আমার অসহ্য। মেহেরবানও তো কম পাপী নয়।

'বিচার করে দেখবেন', খান বাহাদুর বলতে লাগলেন, 'নারীর কী এমন ক্ষতি হলো! ক্ষতি যা হলো তা পুরুষের। ঐ জহরৎ কি তার ক্ষতিপূরণ নাকি! সে ক্ষতি অপূরণীয়। চাকরিতে থাকলে সে এতদিনে ডি আই ডি না হোক এ আই জি হতো। হায়, হায় রে তকদির! নসীবে যা আছে তাই তো হবে। আর ঐ রেলওয়ের কাজটা রাখতে পারল কই! লাখ টাকার জহরৎ পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। সাদী করে বসল ঐ জহরৎ যৌতুক দিয়ে। রাজপুতনার মহা সম্ভ্রান্ত সরদার পরিবারে। ওঁরা ওকে ইংরেজের নোকরি করতে দিলেন না। দেশীয় রাজ্যের ফৌজে ভর্তি করে দিলেন। তাতে পদ ছাড়া আর কী আছে মশায়!'

আমি গুম হয়ে বসেছিলুম। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

'এখন আমাদের ইনস্পেক্টারের কী হয় দেখা যাক। ইনি আর এক রানীপসন্দ্। মেয়েটি নাকি অপরূপ সুন্দরী। সুন্দরী হলে মন্দ হবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! যে যত মন্দ সে তত সুন্দরী।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খান বাহাদুর।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। সব্যসাচী লেখক। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ফিল্ম স্ক্রীপ্ট সব কিছুতেই প্রধান লেখক বলে চিহ্নিত। নানা ধরনের কাজ করেছেন। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যই তাঁর মুখ্য আশ্রয়। মানবজীবনের প্রতি পরম মমতা। বাহির জীবন ছেড়ে অন্তরাশ্রয় অন্বেষণে তাঁর উৎসাহ।

নিরুদ্দেশ

দিনটা ভারী বিশ্রী। শীতের দিন বাদলার মতো এত অস্বস্তিকর আর কিছু বোধহয় নাই। বৃষ্টি ঠিক যে পড়িতেছে তাহা নয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী কেমন মৃতের মতো অসাড় হইয়া আছে। সোমেশ হঠাৎ আজ আসিয়া না পড়িলে কেমন করিয়া দুপুরটা কাটাইতাম বলিতে পারি না। কিন্তু সোমেশও আজ যেন কেমন হইয়া আসিয়াছে।

খবরের কাগজটা দুএকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সোমেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম—'একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ?'

'কি?'

'আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত-সাতটা নিরুদ্দেশ-এর বিজ্ঞাপন।'

সোমেশ কোন কৌতূহলই প্রকাশ করিল না। যেমন বসিয়াছিল তেমনি উদাসীন ভাবেই শুধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর ধোঁয়ার কুণ্ডলী শুধু ধীরে ধীরে পাক খাইতে খাইতে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। আর সমস্তই নিশ্চল স্তব্ধ। বাইরের অসাড়তা যেন আমাদের মনের উপরও চাপিয়া ধরিয়াছে।

নেহাৎ একটা কিছু করিয়া এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভাঙিবার প্রয়োজনেই আরম্ভ করিলাম,—'নিরুদ্দেশ-এর এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কি হয় জান তো? ছেলে হয় তো রাত করে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছেন। এমন তিনি প্রায়ই ফিরে থাকেন আজকাল। খেতে বসবার সময় বাবা কয়েকদিন খোঁজ করেছেন—'কোথায় গেলেন বাবু! তোমার গুণধর পুত্রটি!'

লুকোন পুঁজি থেকে মা বিকেলে ছেলের পেড়াপিড়ীতে টাকা ক'টা বার করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি জেনে শুনে মিথ্যে আর বলতে পারেন না চুপ করে থাকেন।

বাবা বলে যান,—'এত রাত্রেও বাবুর আসবার সময় হল না। আরবারে তো ফেল করে মাথা কিনেছেন। এবারও কি করে কৃতার্থ করবেন বুঝতেই পারছি। পয়সাগুলো আমার খোলামকুচি কিনা, তাই নবাবপুত্তুর যা খুসি তাই করছেন। দূর করে দেব, এবার দূর করে দেব।'

এই মৌখিক আস্ফালনেই হয়তো ব্যাপারটা শেষ হতে পারত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গুণধর পুত্রের প্রবেশ!

বাবা ঝোঁকটা আর কাটিয়ে উঠতে পারেন না। নিজের কাছে মান রাখবার জন্যেও কিছু বলতে হয়।

শেষ পর্যন্ত বাবা বলেন, 'এমন ছেলের আমার দরকার নেই—বেরিয়ে যা।'

অভিমানী ছেলে আর কিছু না হোক পিতৃদেবের এ আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতে উদ্যত হয়।

মা কোন দিক সামলাবেন বুঝতে না পেরে কাতরভাবে শুধু বলেন—'আহা খাওয়া-দাওয়ার সময় কেন এসব বল তো! পরে বললেই তো হতো।'

গৃহিণীকে ধমক দিয়ে বলেন—'মিছিমিছি প্যান্‌প্যান্‌ কোরো না। অমন ছেলে যাওয়াই ভালো।'

মা'র কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বাবা এবার দাঁত খিচিয়ে বললেও নিজের মনের আশার কথাটাই বোধহয় জানান—'তাও গেলে তো বাঁচতাম। এ বেলাই দেখো সুড়-সুড় করে আবার ফিরে আসবে। এমন বিনি পয়সার হোটেলখানা পাবে কোথায়?'

মা এবার অশ্রুসিক্ত স্বরে বলেন—'এই দারুণ শীতে কাল সারারাত কোথায় রইল কে জানে! কি করে বসে আমার তাই ভয়।'

'হ্যাঁ ভয়!'—বাবা কথাটাকে ব্যঙ্গ করেই উড়িয়ে দিতে চান 'তোমার ছেলে কিছু করে নি গো কিছু করে নি। দিব্যি আছে কোন বন্ধুর বাড়ি। অসুবিধে হলেই এসে দেখা দেবে।'

মা'র কান্না তবু থামে না।—'কি রকম অভিমানী জান তো।'

বিরক্ত হতে বাবা বেরিয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন অবস্থা গুরুতর। ছেলে ফেরে নি! মা শয্যা থেকে আর উঠবেন না বলেই পণ করেছেন।

বাবা এবার মা'র ওপর মারমুখী হয়ে উঠেন—'তোমার আস্কারাতেই তো উচ্ছন্নে গেছে। মাথাটি তো তুমিই খেয়েছ আদর দিয়ে।'

মা আঁচলে চোখ মোছেন। ছেলে বিশাল পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে।

পরের দিন ভয়ানক কাণ্ড। মা সেই রাত থেকে দাঁতে কুটি কাটেন নি! আজকের দিনও বিছানা থেকে উঠবেন মনে হয় না। বাবারও হয়তো রাত্রে ঘুম হয় নি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবেন কোন মুখে?

'না আর থাকতে দিলে না! এ অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো!' বলে বাবা বেরিয়ে পড়েন এবং ওঠেন গিয়ে একেবারে খবরের কাগজের অফিসে।

খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড় জটিল। কোন দিকে কি করতে হয় কিছু বোঝা যায় না। খানিক এদিক ওদিক বিমূঢ়ভাবে ঘুরে এক দিকের একটা অফিস-ঘরে ঢুকে পড়ে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে সাহস করে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনাদের কাগজে এই—এই একটা খবর বার করতে চাই!'

নিরীহ চেহারার লোকটি হঠাৎ মুখ তুলে ব্যঙ্গের স্বরে বলেন—'খবর! কেন আমাদের খবরগুলো পছন্দ হচ্ছে না। আমরা কি এতদিন রামযাত্রা বার করছি!'

বাবা একটু হতভম্ব হয়ে একবার অসহায়ভাবে চারদিকে তাকান। পাশের যে ভদ্রলোকটির মুখ দেকে অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির মনে হয়েছিল, তিনিই সহানুভূতির স্বরে বলেন, 'আহা কি করছ! ভদ্রলোক কি বলতে চান, শোনোই না! বসুন আপনি।'

বাবা একটা চেয়ারে একটু অপ্রস্তুতভাবে বসবার পর তিনি বলেন—'কি খবর বলছিলেন?'

'আজ্ঞে ঠিক খবর নয় এই—এই একটু বিজ্ঞাপন!'

'বিজ্ঞাপন? কিসের বিজ্ঞাপন? কতটা স্পেস দরকার? কপি এনেছেন?'

বাবা আরো বিমূঢ়ভাবে বলেন—'আজ্ঞে ঠিক বিজ্ঞাপন নয়—এই আমার ছেলে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছে—'

তাঁকে আর কথা শেষ করতে হয় না। টেবিলের অপর দিক থেকে ভদ্রলোক বলেন—ও বুঝেছি নিরুদ্দেশ! কি দেবেন—চেহারার বর্ণনা, না ফিরে আসবার অনুরোধ!'

বাবা যেন এতক্ষণে কূল পেয়ে বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরে আসবার অনুরোধ! ওর মা বড় কাঁদাকাটি করছে।'

'বুঝেছি বুঝেছি। রাগারাগি করে গিয়েছে বুঝি?' ভদ্রলোক একটা কাগজের প্যাড বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন—দিন লিখে দিন!'

'লিখে!' বাবার মুখের বিপদ্গ্রস্তভাব তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট।

ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে বলেন—'আচ্ছা আমরা লিখে দেব'খন। আপনি শুধু নামটামগুলো দিয়ে যান।'

পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে যাবার সময় বাবা অনুরোধ করেন, একটু ভালো করে লিখে দেবেন। ওর মা কাল থেকে জলগ্রহণ করে নি।'

'সে বলতে হবে না, এমন লিখে দেব, যে পড়ে আপনার ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

আশ্বস্ত হয়ে বাবা ঘরে ফেরেন। কিন্তু অশ্রুসজল বিজ্ঞাপন বার হবার আগেই দেখেন ছেলে ঘরে এসে হাজির।

অনুতপ্ত হয়ে সে এসেছে মনে কোরো না; সে বাড়িতে থাকতে আসে নি! শুধু একবার চলে যাবার আগে তার গোটাকতক বই নিয়ে যেতে এসেছে।

এবার মা'র ক্রুদ্ধস্বর শোনা যায়, 'তা যাবি বই কি, অমনি কুলাঙ্গার তো তুই হয়েছিস। কোনো ছেলে যেন আর বকুনি খায় না। তুই একেবারে পীর হয়েছিস্। কাল সারারাত দুচোখের পাতা এক করেন নি তা জানিস। ভেবে ভেবে চেহারাটা আজ কি হয়েছে দেখে আয়। উনি তেজ করে চলে যাবেন।'

বাবা এবার ভেতরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলেন—'আঃ আর বকাবকি কেন?'

মা ধমক দিয়ে বলেন—'তুমি থাম। অত আদর ভালো নয়! একটু বকুনি খেয়েছেন বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এত বড়ো আস্পর্ধা!'

অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসই এই।

সোমেশের সিগারেটটা তখন শেষ হইয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া আমার কথা সে মোটেই শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একবার একটু নড়িয়া বসিতেও তাহাকে দেখা যায় নাই।

একটু বিরক্ত স্বরেই বলিলাম—'কি হয়েছে তোমার বল তো? মিছিমিছিই আমি একলা বকে মরছি।'

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সোমেশ হঠাৎ ছড়ান পা গুটাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়া সিগারেটের অবশেষটুকু ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল,—

'তুমি জান না। এই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সত্যকার ট্র্যাজিডি থাকে।'

'তা থাকে যে আমি অস্বীকার করছি না। কখন কখন সত্যিই যে যায় সে আর ফেরে না।'

সোমেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'না তা বলছি না। ফিরে আসারই ভয়ানক একটা ট্র্যাজিডির কথা আমি জানি।'

আমি উৎসুকভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম—'তার মানে?'

'শোনো বলছি।'

বাহিরে এতক্ষণে বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে। কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের রাস্তা-ঘাট ঝাপসা অবাস্তব দেখাইতেছে। মনে হইতেছে আমরা যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি।

'পুরানো খবরের কাগজের ফাইল যদি উল্‌টে দেখ, তাহলে দেখতে পাবে বহু বছর আগে এখানকার একটি প্রধান সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সে বিজ্ঞাপন নয় সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস। দিনের পর দিন ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলে সম্পূর্ণ একটি কাহিনী যেন জানা যায়। মনে হয় ছাপার লেখায় কান পাতলে সত্যি যেন কাতর আর্তনাদ শোনা যাবে। সে বিজ্ঞাপন অবশ্য নিরুদ্দেশের। প্রথমে দেখা যায় মায়ের কাতর অনুরোধ ছেলের প্রতি ফিরে আসবার জন্যে। অস্পষ্ট আড়ষ্ট ভাষা, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে কি ব্যাকুলতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা না পড়লে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে মায়ের কাতর অনুরোধ হতাশ দীর্ঘশ্বাসের

মত খবরের কাগজের পাতায় যেন মিলিয়ে যেতেও দেখা গেল। তারপর শোনা গেল পিতার গম্ভীর স্বর, একটু যেন কম্পিত তবু ধীর ও শান্ত—'শোভন ফিরে এস। তোমার মা শয্যাগত। তোমার কি এতটুকু কর্তব্যবোধও নেই!'

বিজ্ঞাপন তারপরেও কিন্তু থামল না। পিতার স্বর ভারী হয়ে আসছে যেন, মনে হয় যেন গলাটা ধরা। 'শোভন, এখন না এলে তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না।'

কিন্তু শোভনের হৃদয় এতে বুঝি গলল না। দেখা গেল বিজ্ঞাপন সমানভাবে চলেছে, শুধু পিতার নিজেকে সামলাবার আর ক্ষমতা নাই। এবার তাঁর স্বরে—কাতরতা—শুধু কাতরতা নয়, একান্ত দুর্বলতা—'শোভন, জান না আমাদের কেমন করে দিন যাচ্ছে। এস, আর আমাদের দুঃখ দিও না।'

বিজ্ঞাপন ক্রমশ হতাশ হাহাকার হয়ে উঠল। তারপর একেবারে গেল বদলে। আর শোভনকে উদ্দেশ্য করে কিছু লেখা নেই। সাধারণ একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এই ধরনের এই চেহারার এই বয়সের একটি ছেলে। আজ এক বৎসর তার কোন সন্ধান নেই। সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে লাগল খবরের কাগজের পাতায়। 'দোহারা ছিপছিপে একটি বছর ষোল-সতেরোর ছেলে। পরিচয়-চিহ্ন ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি বড় জড়ুল। জীবিত না মৃত এইটুকু যদি কেউ সন্ধান দিতে পরে তাহলে পুরস্কার পাওয়া যাবে।'

সোমেশ চুপ করিল খানিকক্ষণের জন্য। জলের ছাটে সার্সির কাঁচ একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর ঠাণ্ডায় মনে হইতেছে একটা কম্বল-টম্বল জড়াইতে পারিলে ভালো হয়।

বলিলাম—'এত গেল বিজ্ঞাপনের উপাখ্যান। আসল ব্যাপারের কিছু জান নাকি?'

'জানি! শোভনকে আমি জানতাম। সে যে কোনো ভয়ঙ্কর অভিমানের বশে বাড়ি ছেড়ে এসেছিল তা মনে কোরো না। বাড়ি ছাড়াটাই তার কাছে একান্ত সহজ। ছুতোটা যা হোক কিছু হলেই হল। পৃথিবীতে দু-একটা লোক আসে জন্ম থেকেই একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে। তারা ঠিক কঠিন-হৃদয় নয়। বরং বলা যেতে পারে তাদের মন তৈলাক্ত। পিচ্ছিল বলে তারা কোথাও ধরা পড়ে না, কিছুই তাদের মনে দাগ দিতে পারে না। শুনলে আশ্চর্য হবে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সংবাদ জানলেও সেগুলো সে অনুসরণই করে নি। কোন দিন চোখে পড়েছিল হয়তো—তারপর আনায়াসে সেগুলো গেছল ভুলে। বাড়ির বাইরে যে সমস্ত দুঃখ অসুবিধায় অন্য কেউ হলে হয়রান হয়ে পড়ত তার ভেতরেই সে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। অন্য কেউ যাই ভাবুক সে নিজেকে একটি ছোট সংসারের আদরের ছেলে হিসেবে শুধু ভাবতে পারে নি। কিন্তু বিজ্ঞাপন যেদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন কেন বলা যায় না তার উদাসীন মনও বিচলিত হয়ে উঠল। বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল একটু অসাধারণভাবে!

ক্লান্তভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তা থেমে যায় নি, হঠাৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় সংবাদপত্রের পাতা স্তব্ধ হয়ে গেল। শোভনের চেহারার বর্ণনার বদলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল,—

'শোভন, তোমার মার সঙ্গে আর তোমার বুঝি দেখা হল না। তিনি শুধু তোমারই নামই করছেন এখনো।' তারপর আর কোন বিজ্ঞাপন দেখা গেল না।

প্রায় দুই বৎসর তখন কেটে গেছে। শোভন একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির তার দেশে। একটা ব্যাপার শোভনের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পাবে। সে কথাটা আগে বলি নি। শোভন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয়। সম্পন্ন বললেও তাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাদের প্রাচীন জমিদারী অনেক দুর্দিনের ভেতর দিয়ে এসেও তখনও তেমন ক্ষয় পায় নি। শোভনই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

সোমেশ একটু হাসিয়া কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল—'দু বছর স্বাধীন জীবনের দুঃখ-কষ্ট গায়ে না মাখলেও তার ছাপ শোভনের ওপর তখন পড়েছে। দু বছরে সে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাদের কর্মচারীরা তাকে চিনতে পারবে না এতটা আশঙ্কা করে নি।'

শোভন দেশে পৌঁছে সোজাসুজি বাড়ি ঢুকছিল, প্রথমে তাকে বাধা দিলেন তাদের পুরানো নায়েব মশাই।

'কাকে চান?'

শোভন হেসে বললে—'কাউকে না, বাড়িতে যেতে চাই।'

নায়েব মশাই তার দিকে খানিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু স্মিতহাস্যে বললে—'ওঃ কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন, আসুন, বার-বাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন।'

শোভন অবাক হয়ে বললে—'সে কি? কি হয়েছে নায়েব মশাই?'

'না, না হয় নি কিছু!'

'মা ভালো আছেন?' শোভনের প্রশ্নে এবার ব্যাকুলতা ছিল।

নায়েব মশাই তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন—'ভালো আছেন বইকি! আসুন আমার সঙ্গে।'

শোভন তবু বললে—'কিন্তু ভেতরে গেলেই ত হয়।

নায়েব মশাই একটু যেন কঠিন স্বরে বললেন—'না হয় না, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

শোভন রীতিমত বিমূঢ় অবস্থায় আবার নায়েব মশাইকে অনুসরণ করে বার-বাড়িতে গিয়ে উঠল। দুবছরে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পুরানো সরকার তাদের নেই। নতুন দুটি লোক সেখানে বসে খাতা লিখছে! তার পরিচিত বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মশাইকে দেখে সে যেন আশ্বস্ত হল।

নায়েব মশাই তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে খাজাঞ্চি-মশাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'ইনি ভেতরে যেতে চাইছেন!'

শোভনের কাছে নায়েব মশাই-এর গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। খাজাঞ্চি মশাই নাকের ওপরকার চশমাটা একটু আঙুল দিয়ে তুলে তার দিকে চেয়ে বলল—'ওঃ ইনি আজই এসেছেন বুঝি!'

'হ্যাঁ, এইমাত্র।'

শোভন এবার অধীরভাবে বলে উঠল—'আপনারা কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন। মার কি কিছু হয়েছে? বাবা কেমন আছেন?'

চারিধারের সব কটা দৃষ্টি তার ওপর ভাবে নিবদ্ধ। খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর নায়েব মশাই বললেন,—'তাঁরা ভালো কিন্তু এখন তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

এবার শোভন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—'কেন দেখা হবে না?' আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমি চললুম।'

শোভন উঠল। কিন্তু নায়েব মশাই দরজার কাছে সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে বললেন—'দেখুন, মিছি-মিছি কেলেঙ্কারী করে লাভ নেই! তাতে ফল হবে না কিছু।'

হঠাৎ শোভনের কছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বিস্মিত ভীত কণ্ঠে বললে—'আপনারা কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

সকলে নীরব।

'আমি শোভন,—বুঝতে পারছেন না আমি শোভন?'

নায়েব মশাই এবার বললেন—'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।' পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে তিনি একটা জিনিস এনে শোভনের হাতে দিলেন। তারই একটা পুরানো ফটো, সাধারণভাবে তোলা! এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে একটু।

নায়েব মশাই বললেন,—'চেনেন একে?

শোভন বিস্মিত কণ্ঠে বললে,—'এ ত আমারই ফটো। দেখুন ভালো করে আপনারাই মিলিয়ে। নাঃ এ অসহ্য।'

চুলগুলো মুঠি করে ধরে সে বসে পড়ল।

নায়েব মশাই তার সঙ্গে বসে বললেন—'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে একটু মিল আছে সত্যি। কিন্তু এর আগে আরো দুজনের সঙ্গে ছিল। মায় জড়ুল পর্যন্ত। আমাদের এ নিয়ে গোলমাল করতে মানা আছে। আমরা কিছু হাঙ্গামা করব না। আপনি এখন চলে যেতে পারেন।'

শোভন উদ্‌ভ্রান্তভাবে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। সকলের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

কাতরভাবে বলল,—'একবার শুধু আমি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করব। আপনারা বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু একবার আমায় দেখা করতে দিন।'

নায়েব মশাই হতাশভাবে হাতের ভঙ্গি করে বললেন—'শুনুন তাহলে, সাতদিন আগে শোভন মারা গেছে। তার মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি।'

শোভন এই অবস্থাতেই না হেসে পারলে না, বললে—'কেমন করে মারা গেল?'

তার কণ্ঠস্বরের বিদ্রূপ উপেক্ষা করে নায়েব মশাই বললেন—'মারা গিয়েছে রাস্তার গাড়ি চাপা পড়ে অপঘাতে। নাম-ধাম পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু যারা দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজন খবরের কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের সব কথা জানিয়েছেন। হাসপাতালেও আমরা খবর নিয়েছি। সেখানকার ডাক্তারের বর্ণনাও আমাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।'

শোভন এরপর কি করত বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দেখা গেল তার বাবা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে ঝড়ে ভাঙা গাছের যে এতদূর সাদৃশ্য হতে পারে, সাহিত্যের উপমা পড়েও কখনও তার মনে হয় নি। তাঁর চলার গতিতে পর্যন্ত যেন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরিচয় আছে।

সকলে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। নায়েব ও কর্মচারীরা ব্যাপারটা বুঝে যখন তার পিছু নিলে, তখন সে বাবার কাছে উপস্থিত হয়েছে।

'বাবা।'

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন। সে মুখের বেদনাময় বিমূঢ়তা শোভনের বুকে ছুরির মত বিঁধল।

'বাবা আমায় চিনতে পারছ?'

বৃদ্ধ স্খলিত-পদে এক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলেন। প্রবল ভাবাবেগ তাঁর বার্ধ্যক্যের শিথিল মুখকে বিকৃত করে দিচ্ছে।

তখন নায়েব মশাই ও কর্মচারীরা এসে পড়েছেন।

বৃদ্ধ কম্পিত হাত তুলে, কম্পিত স্বরে বললেন—'কে?'

নায়েব মশাই শোভনের কাঁধে দৃঢ় ভাবে হাত রেখে বললেন—'না কেউ না। সেই সেবারের মত—এই নিয়ে তিন বার হল!'

একজন কর্মচারী বললে—'আমরা আসতে দিই নি, হঠাৎ আমাদের হাত ছাড়িয়ে—'

বৃদ্ধ তাকে থামিয়ে বললেন—'কিছু বোলো না, চলে যেতে দাও।' বৃদ্ধ শেষ বার শোভনের দিকে কাতরভাবে চেয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলেন।

শোভন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নায়েব মশাই তাকে কি বলছিলেন। অনেকক্ষণ সে কিছু শুনতে পায় নি। কখন সে আবার বার-বাড়িতে এসে বসেছে তাও তার মনে নেই।

আচ্ছন্নতা তার কাটল খানিক বাদে। ভেতর বাড়ি থেকে একজন কর্মচারী নায়েব মশাইকে এসে কি বলছে। নায়েব মশাই তাকে কি বলছেন ঠিক শোনা যাচ্ছে না। না এইবার বোঝা যাচ্ছে। নায়েব মশাই-এর হাতে অনেকগুলো টাকার নোট। কণ্ঠস্বরে তাঁর মিনতি।

শোভনকে একটা কাজ করতে হবে। বাড়ীর কর্ত্রী মুমূর্ষু, ছেলের মৃত্যুসংবাদ তিনি শোনেন নি। তাঁকে কিছু জানানো হয় নি। এখনও তিনি তাকে দেখবার আশা করে আছেন—সেই জন্যেই বুঝি তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পেতে পাচ্ছেন না। শোভনকে তাঁর হারানো ছেলে হয়ে একবার দেখা দিতে হবে। মুমূর্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কোন কিছু ধরা পড়বে না। হারানো ছেলের সঙ্গে তার সত্যি সাদৃশ্য আছে। মৃত্যুপথযাত্রীকে এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দেবার জন্যে জমিদার নিজে তাঁকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন। তার এতে কোন ক্ষতি নেই।

নায়েব মশাই নোটের তাড়াটা শোভনের হাতে গুঁজে দিলেন।'

সোমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। আমি অবশেষে বলিলাম—'সোমেশ তোমার কানের কাছে একটা জড়ুল আছে।'

সোমেশ হাসিয়া বলিল,—'সেই জন্যেই গল্প বানান সহজ হল।'

কিন্তু কেন বলা যায় না—শীতের বাদলের এই শীতল প্রায়ান্ধকার অস্বাভাবিক অপরাহ্নে তার হাসিটাই বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

ক্বচিৎ কখনো, ১৯৬২

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)
বাড়ি পূর্ণিয়ায়। বহুকাল রাজনীতিতে ছিলেন। আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। কারাজীবনের কাহিনী নিয়ে প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' (১৯৪৫) তাঁকে খ্যাতি দেয়, রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার (১৯৫০) লাভ করেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনায় নিপুণ। মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যা ও আবেগ বিশ্লেষণে নির্মম নিপুণ সতীনাথ 'লেখকদের লেখক'।

ধস

ওই বুক থেকেই সেটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল পরসাদীকে নদীতে ফেলে দেবার জন্য। অমনভাবে যেটা চলে যায়, সেটাকে পুঁততে নেই—তাই নদীগর্ভে ফেলা।

বাড়ির মধ্যে থাকবার সময় পরসাদী কাঁদে নি। চোখের কোণায় জল এলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে মুছে নিচ্ছিল, পাছে আবার মনচনিয়া দেখে ফেলে সেই ভয়ে। মনচনিয়ার মুখের দিকে এতক্ষণের মধ্যে একবারও তাকায় নি। /চোখাচোখি হলে লজ্জা পাবে। এইসব সময় কি তাকান যায় কারো দিকে। একে তো শোকে, লজ্জায় মরে রয়েছে মনচনিয়া; এখন কি তার দুঃখের বোঝা বাড়ান উচিত! পরসাদী কেঁদেছিল বাড়ির বাইরে গিয়ে।

এতকাল ধরে সবাই জানত যে তার সঙ্গীর ছেলেপিলে হবে না। কত তুকতাক, মাদুলি, মানত, ওষুধ-বিষুধ এর জন্য! মরবার পর মুখে জল পাবার আকাঙ্খা কার না থাকে। তারপর যবে থেকে জানতে পারল যে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, তবে থেকে অধীর হয়ে দিন গুনেছে। কী করবে ভেবে পায় না মনচনিয়াকে নিয়ে। কত জিজ্ঞাসা। কি খেতে ভালো লাগে? ছেলে হবে না মেয়ে হবে? কার মতো দেখতে হবে? নড়ছে নাকি? পোড়ামাটি চিবুতে ইচ্ছে করে? আরও কত জল্পনা-কল্পনা। চামারশীর সঙ্গেই কত কথা ফিসফিস করে। পাড়ার লোকে তার আধিক্যেতা দেখে হাসাহাসি করেছে।

...তারপর বুধে বুধে চৌদ্দ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি-এ সতের দিন তো হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। সতের দিন পরে যাঁর জিনিস তিনি টেনে নিলেন কাছে। মানুষ কতটুকু কি করতে পারে!...যাবে না কেন—যায়। কতরকমে যায় কত লোকের ছেলে!...গুড়ের নাগরীর মধ্যে ডুবে ছেলে যেতে শুনেছে; গরম দুধের কড়ার মধ্যে পড়ে ছেলে যেতে দেখেছে।...কিন্তু এরকমভাবে যাওয়া!...আহা রে ওই তো একরত্তি রক্তর দলা!...একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। নিশ্বাস নেবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ দুটো বড়ো হয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।...আহা রে!...

...চাটছিল বুঝি।...ভয় পেতে শিখবার আগে, বিপদ কি তা জানবার আগে। মায়ের বুকের ধস নেমেছিল হঠাৎ।...জগদ্দল ননীর তারের নীচে বুকচাপা আঁধার। সে আঁধারের মধ্যে দিয়ে শেষ কান্নাটুকুও বার হতে পায় নি!...

মনচনিয়া জানতে পারল অনেক পরে। কতক্ষণ কে জানে।...ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন?—কখন কখন অমন হয় ওখানটায়। ঘুমের ঘোরে কম্বলখানা গায়ের উপর ভালো করে টেনে নেবার সময়ও মনে পড়ে নি, অন্য একটা প্রাণীর কথা। এমনিই ঘুমকাতুরে সে।...তবু ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন? 'কালীস্থান' এ ঘণ্টা বাজছে; ভোর হবার আর দেরি নেই। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে।...কাঁথা ভিজলে তো এরকম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে না কম্বলের তলায়।...এ যেন অন্যরকম অন্যরকম লাগছে! কেঁপে উঠেছিল বুক। চারটে দেশলাই-কাঠি খরচ হল লণ্ঠনটা জ্বালতে। লণ্ঠনের শিষ বাড়িয়ে, বিছানার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষীণ আশাটুকু নিভে যায়। তার চীৎকারে পরসাদী ওঠে।...কিন্তু তার কি ওই দেহটুকুতে উত্তাপ ফিরে আনা যায়! কিছুতেই কিছু হল না। সতের দিনে মাংসপিণ্ডটাকে বুকের জাঁতায় চটকে পিষে ফেলতে তার ভয় নেই মনচনিয়ার। চোখের জলে ওই বুকই ভাসে।

মনচনিয়ার বুড়ি কুকুরটা খানিক দূর পরসাদীর সঙ্গে গিয়ে ফিরে এসেছিল। এসে বসেছিল মনচনিয়ার পাশে। রঙ কালো তাই কুকুরটার নাম কারিয়া। কারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার জলভরা চোখের দিকে, ছড়ান চুলের বোঝার দিকে। বুড়ি কুকুরটা অনেকদিন এদের সংসারে আছে। বোঝে সব। ঠিক বাড়ির লোকের মতো।

মনচনিয়া কুকুররটাকে নিয়ে এসেছিল বাপের বাড়ি থেকে দ্বিরাগমনের পর আসবার সময়। ঠিক নিয়ে আসে নি, আপনা থেকে চলে এসেছিল কারিয়া তার সঙ্গে! সে কি আজকের কথা! তার বিয়ে হয়েছিল চার বছর বয়সে; দ্বিরাগমন হয় বিয়ের পনর বছর পরে। পরসাদী দ্বিরাগমনের টাকা জমিয়ে, শ্বশুরের কাছে বারবার খবর পাঠায়। শ্বশুর সাড়া দেয় না; কেবল দেরি করে। লোকে দশ কথা বলে এ নিয়ে। মনচনিয়া তখন গ্রামের তহশীলদার সাহেবের বাড়িতে ছেলেপিলে রাখবার দাই-এর কাজ করে। লোকে বলে বাপ মেয়ের রোজগারে খেতে চায়—তার শুধু ঝিগিরি মাইনের রোজগার নয়। শুনে পরসাদীর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বয়সের গরম, তার উপর টাকার গরম। তেল দিয়ে পাকানো লাঠি নিয়ে সে যায় শ্বশুরের কাছে। ঝগড়াঝাটি, লাঠালাঠি করে সে তার হকের বউকে নিয়ে আসে সেখান থেকে। গাঁয়ের বাইরে এণ্ডির ক্ষেতের পাশে যখন গরুরগাড়ি পৌঁছেছে, তখন প্রথম নজরে পড়ল যে, কালো কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

'কাদের কুকুর রে?'

এই হচ্ছে প্রথম কথা পরসাদীর, মনচনিয়ার সঙ্গে।

'আমার।'

অতি ভয়ে ভয়ে বলা।

'তোর।'

মনচনিয়ার চেহারাটা বিশাল হলে কি হবে। ভয় পায়। কড়া স্বামী। লড়াই করে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করে—

'তুলে নি ওটাকে?'

'থাকতে পারবে তো?'

'তা পারবে।'

চলন্ত গাড়ি থেকে কুকুরছানাটাকে টেনে উপরে তোলবার চেষ্টা করতেই স্বামী বলে—'আহা করিস কি! তুই কি অত ঝুঁকতে পারিস। আর একটু সম্মুখের দিকে সরে বস।'

গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে মনচনিয়া কুকুরটাকে টেনে তোলে গাড়িতে। দেখিয়ে দিল যে মোটা হলেও সে অকেজো নয়। কেউ তার মোটাসোটা চেহারা নিয়ে কিছু বললেই কুণ্ঠিত হয়ে সে গায়ের কাপড় সামলে নেয়, দেহভার লুকাবার জন্য। প্রথম দিনই পরসাদী এ জিনিস লক্ষ্য করেছিল।

'কত ওজন মাথায় নিয়ে ঘুরতে পারিস?'

'এক মণ তো পারবই।'

এক মণের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে মনচনিয়া জানায় যে, সে পারবে। চোখমুখে অপ্রস্তুতের ভাব সুস্পষ্ট। কথাবার্তায় সাবধান হয়ে যায় পরসাদী সেই থেকে। 'হরদা-হাট আমাদের ওখান থেকে তিন ক্রোশ। সেখান থেকে পাইকারি দরে তরি-তরকারী কিনে এনে শহরে বিক্রি করি আমরা।'

এই হয়েছিল প্রথম কথাবার্তা তার স্বামীর সঙ্গে। তার কুকুর, আর তার মেদবহুল দেহটাকে নিয়ে কথা। স্বামী যতই হাট-বাজার আর তরিতরকারির কথা বলুক, মনচনিয়া বুঝতে পারে কথার ইঙ্গিতটা কোনদিকে।

এখানেই শেষ হয় নি। আরও খানিক দূরে এসে দেখা হল তহশীলদার সাহেবের সেপাই দুটোর সঙ্গে। তারা অপেক্ষা করছিল পরসাদীর জন্য। মালিকের বোধহয় হুকুম ছিল মারধোর করবার। কিন্তু তারা অল্পতেই রেহাই দিল। মালিকের দুর্নাম করবার জন্য গালিগালাজ দিয়ে শেষকালে রসিকতা করে গেল—'দু-দুটো কালো কুত্তী নিয়ে চললি এখান থেকে আমাদের গ্রাম যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। মোটা কুত্তীটা কিন্তু রোগা কুত্তীটার চাইতে খাবে অনেক বেশি। দেখিস।'

হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে সেপাই দুটো। এ ঘটনা ঘটেছিল দশ বছর আগে। তারপর থেকে কুকুরটা এখানেই থাকে। সেই থেকে, মনচনিয়ার কথা মনে হলেই, তার কালো কুকুরটার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এখানকার লোকের।

ইঁদারাতলায়, হরদাহাটে, গেরস্ত বাড়িতে যেখানে মনচনিয়া যাবে, সেখানেই কুকুরটা তার পিছনে পিছনে যাবে। শুঁটকী কারিয়া আর ধুমসী মনচনিয়ার কথা ছেলেপিলেরা এক নিশ্বাসে বলে হাসাহাসি করে। কেন যে ছেলেপিলেরা এত নিষ্করুণ হয় কে জানে। হয়ত তরকারীর ঝুড়ি মাথায় নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে আসছে মনচনিয়া রাস্তা দিয়ে, ছেলেদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল। একজন সুর করে চেঁচায়—'ম-ন-চ-নি-য়া'। আর একজন সুর মিলিয়ে বলে—'ল-দ্‌-ব-দি-য়া'। মনচনিয়া, লদ্‌বদিয়া। মনচনিয়া, লদ্‌বদিয়া। কারিয়া লেজ নিচু করে নিয়েছে। মনচনিয়া কাছে এস গেলে, দলের সব চেয়ে দুষ্টু ছেলেদুটো পথের দু পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। একজন মনচনিয়ার এপাশে, আর একজন ওপাশে। তার চলনের নকল করে হাঁটছে তারা। দেহভঙ্গির তালে তালে সুর ওঠে—লদর, বদর ॥ লদর, বদর ॥ লদর, বদর ॥...'

মরমে মরে যায় মনচনিয়া। জিভের ধার তার কম নয়। অন্য কোন বিষয় নিয়ে এরা তার পিছনে লাগতে এলে, সে পালটা জবাব দিতে ছাড়ত না। গালাগালি, চিৎকার করে এমন অনর্থ বাধাত যে, ছেলেরা পালাবার পথ পেত না; কিন্তু এ যে তার দেহের বেঢপ গড়ন নিয়ে কথা। মুখে ফুঠে ওঠে অপ্রস্তুতের হাসি। গায়ের কাপড় সামলে নেবার পর্যন্ত উপায় নেই, দু হাত দিয়ে ঝুড়িটা ধরে রয়েছে বলে। ছেলেদের হাত থেকে রেহাই পাবার পর খানিক দূর গিয়ে কারিয়ার লেজ আবার খাড়া হয়ে ওঠে। ছেলেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কুকুরটা দুবার ডাকে ঘেউ-ঘেউ করে। গোনা দুবার। তারপর আবার একটা অতিপরিচিত গন্ধ নাকে নিতে নিতে পথ চলতে আরম্ভ করে।

মনচনিয়ার এই কুণ্ঠিত ভাবটা খানিকটা কেটেছিল গত কয়েক মাস থেকে নতুন সম্ভাবনায় পৃথিবীর রঙ যখন বদলে যায়, তখন ভারী বোঝাও হাল্কা লাগে। বেমানান জিনিসও মানানসই হয়ে ওঠে, মনের জোর বাড়ে। তার সৌষ্ঠবহীন দেহের একটা মানে তবু সে এতদিন খুঁজে পায়।...কিন্তু এ আর ক'দিন!

সতের দিনের রাজপাট শেষ হয়ে গেল মনচনিয়ার।...যে অঙ্গ নিয়ে তার চিরকালের অস্বস্তি যে অভিশাপের বোঝার কুণ্ঠায় সে লোকের কাছে মাথা হেঁট করে থাকে সব সময়, সেইটাই এতদিন পর তার সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছে।...শত্রু!...শত্রু।

পা ছড়িয়ে বসেছে মনচনিয়া ঘরের দাওয়ায়। বুড়ি কুকুরটা তার পা চাটছে। কারিয়ার চোখের কোণায় ওটা জল না পিচুটি ঠিক বোঝা যায় না। নিজের অজান্তেই বুঝি মনচনিয়ার হাত চলে গিয়েছে কুকুরটার গায়ে। হাত বোলাচ্ছে পিঠে, বুকে। পিঠের খরখরে লোমগুলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে সরে যাচ্ছে। বুকের রোঁয়া এর চেয়ে নরম। পাঁজড়ার হাড়গুলো হাতে বেঁধে। শুকনো বুকের উপর আঙুল চালাতে চালাতে সে ভালো করে সেদিকে তাকিয়ে দেখল। আঁচিলের মতো ছোট-

ছোট। একটু চেষ্টা করে না দেখলে কালো লোমের মধ্যে প্রথমটায় নজরে পড়ে না। কারিয়ার কানের এঁটুলিগুলোর চাইতেও ছোট-ছোট বোঁটাগুলো! বয়স হওয়ায় গত বছর থেকে বাচ্চা হওয়া বন্ধ হয়েছে বুড়ি কুকুরটার।...কিন্তু এও ভালো।...শতগুণে ভালো!

কারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—একবার মনচনিয়ার মুখের দিকে, আর একবার ঘাড় কাত করে তার হাতের আঙুলের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে। ঠিক আদরের মতো লাগছে না তো, মনচনিয়ার চোখ-মুখের ভাব দেখে। তবে? বুকের বোঁটাগুলোতে সুড়সুড়ি লাগছে যে তার।

দুঃখ তো আছেই; কিন্তু এমনভাবে পেটের ছেলে যাওয়ার সে যে কী লজ্জা, বলে বোঝানো যায় না। সবাই যে তারই কথা আলোচনা করছে সরকারী ইঁদারাতলায়। কত কী যে যে বলছে। বাড়ি থেকে বেরুতে সাহস পায় না মনচনিয়া। তবুও কি শান্তি আছে! পাড়ার লোকে আসে তাকে সান্ত্বনা দিতে না ছাই! সব বোঝে সে। চাদর মুড়ি দিয়ে চাটাই-এর উপর শুয়ে থাকে, কেউ বেড়াতে এলে। যা ইচ্ছা বলে যাও, সে কোন কথার জবাব দেবে না। পরসাদী বাড়িতে থাকলে, প্রতিবেশিনীদের বারণ করে মনচনিয়াকে জ্বালাতন করতে। এক বুড়ি সহানুভূতি জানাতে গিয়ে মনচনিয়ার গাঢ় ঘুমের কথা তুলেছিল। তাকে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দেয় পরসাদী। কারিয়া চাটাইখানার পাশে অষ্টপ্রহর বসে থাকে। চেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেও বার দুয়েক ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে নিজের বিরক্তি জানিয়ে দেয়।

স্ত্রীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক আন্দাজ পেল পরসাদী, তার একটা কথা থেকে। মাটির দিকে তাকিয়ে, অতি কুণ্ঠার সঙ্গে সে স্বামীকে বলেছিল সরকারী ইঁদারা থেকে জল এনে দিতে। খাওয়ার জল? মনচনিয়া চুপ করে থাকে। স্নানের? মনচিনয়ার চোখে জল এসে গিয়েছে। স্বামীকে কখনও সরকারী ইঁদারা থেকে স্নানের জল আনতে বলতে পারে মেয়েমানুষ। একে মোটা মানুষ; স্নান না করলে তার চলে না। তার উপর গায়ে দুধ-পচা গন্ধ। নিজেরই গা ঘিন-ঘিন করে। লজ্জার মাথা খেয়ে তাই সে স্বামীকে স্নানের জল আনতে বলেছিল। ইঁদারা-তলায় লোকজনের মধ্যে জল আনতে যাবার লজ্জা যে আরও অনেক বেশি। পরসাদী মাটির কলসীটা নিয়ে বেরুচ্ছিল। মনচনিয়া বালতিটা হাতের কাছে আগিয়ে দেয় পুরুষ-মানুষে সরকারী ইঁদারা থেকে কলসী করে জল নিয়ে এলে পাড়ার লোকে কি বলবে!

সহজ বুদ্ধিতে পরসাদী বোঝে, স্ত্রীকে এখন একটু অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করা উচিত সব সময়। উঠনভরা শাকসব্জির গাছ—মনচনিয়ার নিজ হাতে পোঁতা সেগুলোরও যদি একটু দেখাশোনা করে তাহলে মনটা ভালো থাকে। কিন্তু করে কই। বারান্দায় বসে বসে কি ভাবে দিনরাত্র, সে-ই জানে। ভোরে উঠে সে প্রত্যহ মাচা থেকে সীম,

বরবটি পাড়ে বাজারে নিয়ে যাবার জন্য। এ তিনদিন মনচনিয়া সীম পাড়তেও ভুলে গিয়েছে।

সময় পেলেই পরসাদী স্ত্রী সঙ্গে গল্প করে তাকে একটু অন্যমনস্ক রাখতে চায়; কিন্তু আরম্ভ করবার একটু পরই আর কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলতে ইচ্ছা করে, যেটা চলে গিয়েছে সেইটার কথা; কিন্তু সে কথা যে বলতে মানা। অন্য গল্প করতে গেলেও বাধা এসে পড়ে অজান্তে। তরিতরকারির বাজার দর নিয়ে গল্প আরম্ভ করাই ছিল তাদের চিরকালের অভ্যাস। পরসাদী হয়ত আরম্ভ করল সীমের দরের কথা। 'এখন দরটা যাচ্ছে ভালো। আর এক মাস পরে কে পুঁছবে কুকুরের কানের মতো শক্ত শক্ত সীম। 'সাতপুতিয়া' (সাত পুত্তুর) সীমের গাছেই লাভ বেশি; অফুরন্ত ফলন; থোবা ফলে; এক-এক থোবায় থাক সাতটা করে। উঠনের সীমগাছটা সেই দশহরার আগে থেকে ফল দিচ্ছে—মনে আছে তো সেই যেদিন খগরিয়া-হাটের দশহরার মেলা থেকে তোর জন্য দহিবড়া?...'

বলতে বলতে থেমে যায় পরসাদী। কথাটা তোলা ঠিক হয় নি। ছেলেটা তখন পেটে। স্ত্রী খেতে চেয়েছিল ওখানকার দহিবড়া।

'হ্যাঁ হ্যাঁ অসময়ের শাকসব্জিতেই লাভ। সীমগাছটা এত আগে থেকে ফলতে আরম্ভ করেছে এবার; পুরনো গাছ বলে। গত বছরের গাছ। তুই তো তুলে ফেলতেই চেয়েছিলি মড়ুঞ্চে গাছটাকে। আমার কথাতেই তো বৈশাখ মাসে জল দিতে আরম্ভ করলি। বলেছিলাম কিনা, বল?'

আবার একটা কেমন কেমন যেন ভাব মনচনিয়ার চোখমুখে দেখতে পেয়ে পরসাদীকে থামতে হয়।

...'লাউগাছটার কি তেজ হয়েছে দেখেছিস। চাল ছেয়ে গেছে। কি মোটা-মোটা ডগাগুলো—বুড়ো আঙুলের চাইতেও মোটা। রোজ ভাতের ফেন ফেলিস কিনা গাছের গোড়ায়, তাই ওটার অত জোর। অত বাড় হলে কি গাছে ফল থাকে। ওর ডাঁটা কেটে কেটে বেচে ফেলাই ভালো বোধ হয়। দেখছিস না, কেবল জালি পড়ছে আর পচে যাচ্ছে—জালি পড়ছে আর পচে যাচ্ছে।'...

কি আবার বলে ফেলল সে। স্ত্রীর মুখখানি হঠাৎ কাঁচুমাচু হয়ে গেল কেন? মাঝপথে কথা ফুরিয়ে গেল পরসাদীর। সে উঠে পড়ে। এত সামাল দিয়ে দিয়ে কি কথা বলা যায়।

সেলাই নিয়ে বসলে হয়ত একটু অনামনস্ক থাকবে। স্ত্রীর কুর্তার জন্য খানিকটা ছিট নিয়ে এল পরসাদী, তরকারী বেচে ফেরবার সময়। মনচনিয়া দেখে বলে, 'এ কাপড়গুলো কাচলে পরে বড্ড ছোট হয়ে যায়।'

'অত আঁট-আঁট জামা করিস কেন; একটু ঢিলে সেলাই করলেই পারিস।'

কিছু ভেবে বলা নয়। তবু মনচনিয়া নিচের দিকে চোখ নামিয়ে নেয়। কত কি

গল্প করবে, ভেবে ঠিক করে এসেছিল পরসাদী। সব গুলিয়ে যায়, স্ত্রীর এ অপরাধীর ভাবটা লক্ষ্য করে।

তার চেষ্টার ত্রুটি নাই। পরের দিন সে ফিরল এক কুকুর-ছানা নিয়ে। কুকুর-ছানাটা খুবই ছোট। সবে চোখ ফুটেছে। 'ও আবার কি নিয়ে এলি?'

'কারিয়াটা বুড়ি হয়েছে। কবে মরে যাবে তার ঠিক কি। এখন থেকে একটা নতুন কুকুর পোষা ভালো। পথের ধারে শীতে কুঁই-কুঁই করছিল। উঠিয়ে নিয়ে এলাম।'

মনচনিয়া সেদিন কাজে বেরুবার যোগাড় করছিল। আর কতদিন বাড়িতে বসে থাকবে। বাড়িতে বসে থাকলে কি তাদের মতো অবস্থার লোকের চলে। এরই মধ্যে স্বামী কুকুরছানা নিয়ে এসে হাজির।

...ফ্যাসাদ! এতকাল যখন কারিয়ার বছর বছর বাচ্চা হতো সাতগণ্ডা করে, তখন কুকুরের বাচ্চা পোষবার কথা খেয়াল হয় নি; কত শিয়ালে খেয়েছে, কত পাড়ার ছেলেপিলেরা নিয়েছে। যতই পাতকুড়ানো খেতে দাও, কুকুর পোষবার খরচ আছে তো! শুধু পাতকুড়ানো খেতে দিলে কি কুকুর বাড়িতে থাকে! এক গেরস্তর আস্তাকুড় থেকে আর এক গেরস্তর আস্তাকুঁড়ে টহল মেরে বেড়ায় অষ্টপ্রহর।

তবু স্বামী যখন নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছে, তখন এটাকে বাড়িতে জায়গা দিতেই হয়।

ঝুড়ি নামিয়ে মনচনিয়া কুকুরছানাটাকে হাতে করে নেয়। বাড়ি থেকে বেরুতে তার লজ্জা করছিল। যাক, তবু একটু সময় পাওয়া গেল কুকুরের বাচ্চাটা আসায়। একবেলা দেরি করবার একটা অছিলা পেয়ে সে বাঁচে।

একেবারে বাচ্চা, নাক বাড়িয়ে শুঁকছে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে করতে। কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজতে চায়। লিকলিকে জিভের ডগা দিয়ে আঙুল, তেলো, হাতের চামড়া চেটে চেটে দেখছে। মনচনিয়ার গায়ের গন্ধটা তার মনোমতো। দুধের টকটক মাতা-মাতা গন্ধটা তার চেনা। হারিয়ে যাওয়া গন্ধ আবার ফিরে পাচ্ছে কুকুরছানাটা। সহজ প্রবৃত্তিতে বুঝতে যে এই গন্ধটাই তাকে উৎস-ধারার সন্ধান দেবে।

'বাবারে বাবা! এক মিনিটও নিশ্চিন্দি নেই। চুপটি করে বস্ এখানে!'

কোল থেকে নামিয়ে মনচনিয়া বাচ্চটাকে চেপে পাশে বসাল।

কারিয়ার গলার মধ্যে দিয়ে একটা শব্দ বার হল—ঘর্-র্-র্। নতুন আগন্তুকের কাণ্ডকারাখানা তার অপছন্দ। আগাগোড়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিরকম দাঁড়াল, সেটাও আন্দাজ করে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। একবার কুকুরছানাটার কাছে গিয়ে সেটার গা শুঁকে নেয়। গন্ধর মধ্যে কি পেল না পেল সে-ই জানে। একটা হাই তুলে, বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে সে ঝিমুতে বসল উঠোনে। বাচ্চাটার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

কুকুরছানার নরম-নরম রোঁয়াগুলো হাতের উপর লেপটে যাচ্ছে মনচনিয়ার। রেশমের মতো বেশ আরাম লাগে। ওর মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে আরাম নিতে গেলে কি রকম যেন গা-সির-সির করে অথচ সে সিরসিরিনিটুকু খারাপ লাগে না। আঙুলের ডগায় একটা কোমল দেহের উত্তাপ একটু আনমনা করে দেয় মনচনিয়াকে।

...গেলে গেলে তো রোজ ফেলেই দিতে হয় দুধ। একটা টিনের কৌটার ঢাকনিতে দুধ গেলে বার করে সে বাচ্চাটার সম্মুখে রাখে। চুকচুক করে খাচ্ছে বাচ্চাটা। শব্দটা শুনতে ভারী মিষ্টি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মনচনিয়া সে দিকে।

উঠানে কারিয়ার কান খাড়া হয়ে উঠেছে। তার ঔদাসীন্য কেটেছে। ছুটে এলো বারান্দায়, ঢাকনিটার কাছে। 'তুই আবার এলি কেন? পালা! যা বলছি।'

ঘ্যা-অ্যা-অ্যা করে একটা শব্দ বার করল কারিয়া গলা দিয়ে।

'এ কি তোর খাওয়ার জিনিস নাকি! রাগ দেখালেই অমনি হল! এতটুকু বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে রেষারেষি! লজ্জা করে না। যা পালা!'

ঘ্-র্-র্-র্।

অর্থাৎ এ ব্যবস্থা কারিয়ার অপছন্দ; কিন্তু হুকুম না মেনে উপায় কি...

বাড়ির কাজকর্ম সেরে মনচনিয়া ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বার হল উঠান থেকে। চিরকালের অভ্যাস মতো কারিয়াও আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'তুই আবার উঠলি কেন? তুই থাক! আজ আর তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না! আবার কথা শোনে না। যা! যা বলছি বাড়ির মধ্যে!'

দরজার ঝাঁপ বাইরে থেকে বন্ধ করে মনচনিয়া যখন চলে গেল, কারিয়া তখন ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে পাড়া মাথায় করছে।

যার জন্য তার বাড়ির বাইরে যেতে কুণ্ঠা ঠিক তাই হল! হাসির খোরাক পেলে ছেলেপিলেদের সত্যিই মায়া-দয়া থাকে না। আজও মনচনিয়াকে আসতে দেখে তাদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।...আজ 'মুটকী-তরকারিউলিটা' একা কেন রে? শুঁটকী কুকুরটা নেই কেন রে?...আজ তারা ছড়া কেটে তার চলনভঙ্গির নকল করে নাচে নি। শুধু নিজেদের মধ্যে পুতনা-রাক্ষসীর কথা তুলে হাসাহাসি করছে। মনচনিয়ার স্বকর্ণে শোনা। চোখ-কান বুজে কোনরকমে সে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। তারপর যে বাড়িতে তরকারি বেচতে যায়, সে বাড়ির মেয়েরা দিনকয়েক আগেকার অঘটনটার সারা বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছে।...পুলিসে যা ভাবে নি এরা হয়ত তাই ভেবে নিয়েছে! কে জানে! নইলে কোন মা কি এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে যার কপাল এমনভাবে পুড়েছে তাকে?...স্বামী তাকে এখন দু-তিনদিন বাড়ি-বাড়ি শাকসব্জি বেচতে যেতে বারণ করেছিল। বলেছিল, বাজারে গিয়ে বসতে তরকারি নিয়ে। ঠিকই বলেছিল। তখন বুঝতে পারে নি পরসাদীর কথা। ভেবেছিল বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে পরিশ্রম বেশি বলেই বুঝি সে ওকথা বলেছে।...

মনচনিয়া এরপর আর কোন গেরস্ত বাড়িতে না গিয়ে গিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল বাজারে।

বাড়ি ফিরল স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে। ঝাঁপ খোলবার শব্দ পেয়ে কিন্তু কারিয়া লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল না। কোন সাড়াশব্দ নেই। ব্যপার কি? আলো জ্বালা হলে দেখা গেল যে, উঠানে কারিয়া শুয়ে রয়েছে কাত হয়ে পা ছড়িয়ে, আর কুকুরছানাটা তার শুকনো বুক প্রাণপণে চাটছে। মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে মেরে এ বোঁটা ছেড়ে ও বোঁটা ধরছে। মনচনিয়া কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে হাতে করে তুলে ধরায় কারিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।...অনেকক্ষণ আগলেছি এটাকে তোমাদের কথামতো, এখন তোমাদের জিনিস তোমরা বুঝে নাও। এক কাতে শুয়ে শুয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে গা হাত পা।...কারিয়া মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল বাড়ির বাইরে।

'এটার একটা নাম রাখতে হয় এখন থেকে। আমি তো ভেবেছি এটার নাম রাখবো বাচ্চা।'

'হ্যাঁ বাচ্চা নামটা বেশ হবে।'

'বাচ্চা। ওরে বাচ্চা! আবার তাকান হচ্ছে পুটপুট করে। আঙুল চাটিস নি বলছি! বোকা কোথাকার! ওটা কি খাওয়ার জিনিস! খিদে পেয়েছে বুঝি? তা তো পাবেই। কমক্ষণ সময় তো না। দুধের বাচ্চাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। আর।'

'কুঁই-কুঁই করে যে শব্দটা করছে, ওটা হচ্ছে খিদে পাবার সময়ের ডাক, কুকুর-ছানাদের।'

'শুধু খিদে পাবার সময়ের কেন হবে; আরও কত সময় ওরা অমন করে ডাকে।'

মনচনিয়ার মুখে হাসি। ওই হাসিটুকু না থাকলে শেষের কথাটার ইঙ্গিত তার স্বামী ধরতে পারত না। এই প্রথম হাসল সে আজ পাঁচদিন পরে।

'সে সব বুঝিস তুই; কুকুর পুষে পুষে তোর হাড় পেকেছে।'

পরের দিন বাচ্চাটা সারাদিন ধরে কারিয়ার বুক চেটেছে। কারিয়া সারাদিন গা এলিয়ে শুয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন আরাম নিচ্ছে। মনচনিয়া যখন ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বেরুল বাড়ি থেকে তখন বুড়ি কুকুরটা সঙ্গে গেল না। কিছু বলতে হয় নি তাকে—নিজে থেকেই গেল না। বাজার থেকে ফিরে এসেও দেখল ঠিক সেই একই অবস্থাতে কারিয়াটা শুয়ে রয়েছে, তার বাচ্চাটা সেই রকম করেই ঢুঁ মেরে মেরে চুষছে। বোঁটাগুলো আর আঁচিলের মত নেই; একটু বড় হয়েছে। গোড়াটাও একটু ফোলা। একটু লালচে-বেগুনী আভা লেগেছে তাতে। ছড়ে যায় নি তো? শুধু কি চাটা আর চোষা—যা আঁচড়-কামড়ের ঘটা বাচ্চাটার! বলা যায় না কিছুই। আঙুল দিয়ে দেখল মনচনিয়া।...না। এ ছড়ে যাওয়া নয়। শিরা-উপশিরায় লাল বেগুনী মিহিমিহি দাগগুলো চাড়া ঠেলে যেন উঠে আসতে চাইছে! বেশ তেলা লাগছে

চামড়াটা। কারিয়ার চাউনি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, মনচনিয়ার এই অহেতুক কৌতূহল সে সন্দেহের চোখে দেখছে...এত হাঁ করে দেখবার কি আছে এর মধ্যে—এ কি আগে দেখ নি?...

টিনের কৌটোর ঢাকনিটা হাতে নিয়ে মনচনিয়া বারান্দা থেকে ডাকল—'বাচ্চা! বাচ্চা! আ-তু-তু! কুর-কুর-কুর-কুর আয় বাচ্চা!'

বাচ্চাটা বুঝেছে কেন এ ডাক। ঘুর-ঘুর করে সেটা উঠে এল বারান্দায়। ঠেলে মনচনিয়ার গায়ের উপর উঠতে চায়। হাঁটুর কাপড়ে খরখর করে শব্দ হচ্ছে নখের আঁচড়ে।

'থাম্-থাম্! তর সইছে না! এলি কেন—যা না কারিয়ার কাছে! নতুন মা পেয়েছিস—চাটগে না তার বুক। শুঁকছিস কি আবার!'

..কী জিনিস—কী কাজে যে আসে!...যেটা অমনভাবে চলে গেল সেটার কথা মনে পড়ে। ভোলা কি যায়!...

কারিয়া ঘাড় তুলে দেখছে উঠন থেকে। চোখের পিচুটি তার গেল কোথায়! শুনছে মনচনিয়ার কথা। লক্ষ্য করছে তার হাবভাব, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি। টিনের ঢাকনিটা মনচনিয়া যখন নেয়, তখন তার কান খাড়া হয়ে উঠেছিল। বাচ্চাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে, বাইরে এক চক্কর টহল দিয়ে আসাই তার পক্ষে স্বাভাবিক হত, কিন্তু তা না করে সে গিয়ে বসল দাওয়ার নিচে লেজে ভর দিয়ে। উদগ্র উৎকণ্ঠায় সে প্রতীক্ষা করছে বাচ্চাটার ফিরে আসবার।...টিনের কৌটোর ঢাকনিটা চেটে পুটে শেষ করবার পরও আবার সেটা ওখানে কুঁই-কুঁই করছে কেন? ওখানকার বিঁড়েটা আবার শুঁকছে কেন?

'হল তো!'

...এ তো আদর নয়।...মনচনিয়ার এ গলার স্বরে বিপদ আনে, সেকথা কারিয়ার জানা। টপ করে কারিয়া লাফিয়ে বারান্দায় উঠে বাচ্চার ঘাড়ের কাছটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সেটাকে নামিয়ে নিয়ে আসে।...চল নিজের জায়গায়। সেখানে যা ইচ্ছা কর না কেন।...ঠিক আগেকার জায়গায় নিয়ে গিয়ে, বাচ্চার ঘাড়ের কাছটা চেটে একটু আরাম করে দেয়। তারপর কাত হয়ে আবার শোয় নিজের আরাম নিতে।...নে, এবার নে!...এবার কি করতে হবে সেকথা আর বলে দেবার দরকার ছিল না বাচ্চাটাকে।

বাঁশের খুঁটি ধরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মনচনিয়া।...এখনও সাধ মেটে নি বুড়ি কারিয়াটার।...মাছিতে জ্বালাতন করছে বাচ্চাটাকে; শরীর না নাড়িয়ে শুধু মাথাটা নাড়িয়ে সেটাকে মারবার কত চেষ্টা করেছে কারিয়া।...দেহ নাড়লে যে বাচ্চার চাটবার অসুবিধা হবে কিংবা হয়ত নিজেরই আরামের ব্যাঘাত ঘটবে গা নাড়লে।...কে জানে! পরসাদী কি লক্ষ্য করেছে বুড়ি কুকুরের বুকের আকৃতির পরিবর্তনটা? তার ভারী ইচ্ছা করে স্বামীকে ডেকে দেখায়; কিন্তু পারে না সঙ্কোচে।

পরসাদীরও জিনিসটা নজরে পড়েছে; কিন্তু একথা কি মনচনিয়ার কাছে তোলা যায়?...

সে রাত্রিতে কতবার যে মনচনিয়ার ঘুম ভেঙেছে তার ঠিক নেই। সারারাত কারিয়া ডেকেছে শিয়ালের গন্ধ পেয়ে।

ভোরে উঠে কারিয়া আর বাচ্চাটাকে উঠনে দেখতে পাওয়া গেল না। যাবে কোথায়! 'সাতপুতিয়া' সীমের মাচাটার নিচে সিন্দুকের মতো একটা কাঠের ঘর আছে। এক সময়ে মনচনিয়া হাঁস পুষেছিল; তাদের থাকবার জন্য এইটা তৈরি করেছিল। দেখা গেল সেই হাঁসের ঘরে কারিয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরটা চারিদিকে বন্ধ; শুধু একদিকে হাঁস ঢুকবার একটা ছোট দরজা মতন আছে। এত ছোট যে কারিয়াকেও তার মধ্যে দিয়ে কষ্ট করে ঢুকতে হবে।

মাথা নিচু করে দেখতে গেল মনচনিয়া। ভিতরে অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না।

ঘ-র্-র্-র্-র্।...এখানে আবার কিসের দরকার?

'আ মরণ! চুপ কর বলছি কারিয়া!'

মনচনিয়া মাচা থেকে সীম পাড়ছে। খুট্‌খাট করে শব্দ হচ্ছে, আর ডেকে ডেকে উঠছে কারিয়া। পরসাদী জিজ্ঞাসা করে 'ওটা অত ডাকে কেন?'

'অপছন্দ।'

'সাতপুতিয়া সীমের মাচাটা ওর এলাকায় পড়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, এই আর কি।'

'নতুন ছেলে পেয়েছে।'

'সাত জনমের ছেলে!'

এ সম্বন্ধে স্বামীকে আর বেশি কথার সুযোগ না দেবার জন্য মনচনিয়া কলসী নিয়ে চলে গেল সরকারী ইঁদারাতলায়!

পরসাদীও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। একটা অস্বস্তিকর জায়গায় এসে পৌঁছেছিল দুজনের কথা, নিজেদের অজান্তে।

আজ তাদের যেতে হবে হরদা-হাটে তরকারি কিনতে। একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে; তাই পরসাদী উনুন ধরাতে বসল। পাটকাঠি ভাঙ্‌বার শব্দ শুনে কারিয়া ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে ওঠে।

'বাবা রে বাবা! কুটোটি ভাঙবার জো নেই!...

সত্যিই তাই। কাক মাচায় বসলে কারিয়া ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠছে; পরসাদী উঠনে চলাফেরা করলে ডেকে উঠছে; বাড়ির চালে চিল বসতে দেখলে ডাকছে; দরজার বাইরে বিড়াল দেখলে ডাকছে।...সবাই শত্রু; সকলের কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে; চোখে চোখে রাখ; আগলে থাক; বিপদের গন্ধ নাকে এলেই ডেকে ভয়

দেখাও; চোখ কান নাক সব খুলে রাখ চব্বিশ ঘণ্টা, কাউকে বিশ্বাস নেই; শত্রু আক্রমণ করবার আগেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়; সময় দিলেই আর পারবে না তার সঙ্গে।...

নালীর মুখে একটা বেজি দেখতে পেয়ে হাঁসের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কারিয়া। উনুনের পাস থেকে বেশ ভালো করে দেখল কুকুরটাকে পরসাদী।...চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে কারিয়ার, নতুন বাচ্চা হবার সব লক্ষণ তার দেহে আর হাবভাবে সুস্পষ্ট। কুকুরছানাটাও তার পিছনে পিছনে হাঁস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেজিটি ভয়ে পালিয়েছে। তবু কারিয়ার হাঁক-ডাক, লাফ-ঝাঁফ থামে না।...ভারে ঝুলে পড়া বুক প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে। চলন্ত অবস্থাতেও কুকুরছানাটা কারিয়ার বুক চাটা ছাড়ে নি।...কিন্তু ওকি?...ঠিকই তো তাই!...কোন ভুল নেই!...এ কি করে সম্ভব হল!...ওরা দুটোতে আবার ঢুকে গেল হাঁসের ঘরে।...অবাক হয়ে গেল পরসাদী। জন্তুজানোয়ারদের যে এরকম হতে পারে, সে কথা তার জানা ছিল না। মনচনিয়া কি দেখেছে? মনচনিয়াকে খবরটা দেবে নাকি? পরসাদীর তো ইচ্ছা হচ্ছে, পাড়ার লোকদের ডেকে এনে তামাসাটা দেখায়; কিন্তু সে উপায় যে নাই। তার মুখ যে বন্ধ!...

হরদা-ঘাটে যাবার পথে মনচনিয়া কথা তুলেছিল কুকুর দুটোর সম্বন্ধে। খেতে ডাকলেও আজ কারিয়া হাঁস-ঘর থেকে বার হয় নি; না খেল নিজে, না খেতে দিল বাচ্চাটাকে! বাচ্চাটার জন্যই ভাবনা বেশি!...

'আরে, না খেয়ে কেউ থাকতে পারে।' বলি বলি করেও এর চেয়ে পরিষ্কার করে কথাটা বলতে পারল না পরসাদী মনচনিয়াকে। কিন্তু মনচনিয়া বোঝে তবে তো! বুঝল কই!...

বাড়ি ফিরতে বিকাল হয়ে গেল। অতটুকু বাচ্চাটা সারাদিন না খেয়ে রয়েছে, এ এক দারুণ অস্বস্তি মনচনিয়ার। টিনের কৌটোর ঢাকনিটা নিয়ে সে গেল হাঁস-ঘরের দিকে।

'বাচ্চা! বাচ্চা! আ-তু-উ-উ আয়! কুর্-কুর্-কুর্-কুর্-কুর্-কুর্!'

পরসাদী ঘরের ভিতর থেকে বলে—'ও আর এসেছে!'

সত্যিই বাচ্চাটা এল না।

ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে মুখ বার করে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকছে কারিয়া। দাঁত বার করে যেন কামড়াতে আসছে।

'তুই ডেকে মরছিস কেন! চুপ কর!'

হাত বাড়াতেই ক্ষেপে বেরিয়ে এল কারিয়া। চেনা কারিয়া নয়; এ একেবারে অন্য মূর্তি। ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝবার আগেই, শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। আঁচড়ে, কামড়ে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় মনচনিয়াকে। মনচনিয়া ছিটকে গিয়ে পড়েছে লাউগাছটার উপর। পরনের কাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে

গিয়েছে; হাতের একটা জায়গা থেকে রক্তের ধারা বইছে, পরসাদী এসেছে হৈ-হৈ করে লাঠি নিয়ে; কিন্তু মনচনিয়ার এসব দিকে খেয়াল নাই। হাঁস-ঘরের ঘুলঘুলির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় পর্যন্ত সে করিয়ার বুকের দিক থেকে নজর ফেরায় নি।...দুধ এসেছে কারিয়ার বুকে!...ওই গরম, ভিজে, থলথলে মাংসপিণ্ডের ভার তার হাতের উপর পড়েছিল যখন কুকুরটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।...হ্যাঁ ভিজে! দুধ গড়াচ্ছিল কারিয়ার বুক থেকে।...এখনও দুধ লেগে রয়েছে হাতের সেই জায়গাটাতে।

তার নিজের অভিশাপের বোঝা জগদ্দল পাথরের চেয়েও ভারী হয়ে উঠেছে।

পত্রলেখার বাবা, ১৯৫৯

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)
মানবমনের রহস্য উদঘাটনে তাঁর অনায়াস নৈপুণ্য; মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতি অসীম। সহজ সাধারণ সংসারযাত্রার নেপথ্যকে উদ্ভাসিত করে তুলতে অসামান্য নৈপুণ্যের অধিকারি। তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্ররূপ পেয়েছে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত লেখিকা।

সীমারেখার সীমা

সবাই হেরে ফিরে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সতীনাথ নিজেই তিনতলায় উঠে এলেন। তীব্রস্বরে বললেন, 'অসভ্যতারও একটা সীমা থাকে ছবি, থাকা উচিত। কিন্তু এই বিয়েবাড়ি-ভর্তি লোকের সামনে যে অসভ্যতা করলে তুমি, তার সীমা নেই। আমাকে তো এতগুলো আত্মীয়-কুটুম্বের সামনে ধুলোর অধম করলে, নিজের মুখও কম হাসালে না! এখন চলো দয়া করে!'

তিনতলায় ছাতে ঘরের স্যাংশান ছিল না, তবু ছবির জন্যেই ঘরটা বানানো হয়েছিল টালীর ছাত দিয়ে। ছবির এই টালীর ছাত ঘরটার মধ্যে আলো জ্বলছিল না। শুধু নিচের তলার প্যাণ্ডেলের অগুন্তি আলোর তির্যক এক-একটা রেখা কীভাবে যেন এসে পড়ে ঘরের দরজটা সামান্য আলোকিত করেছিল।

সেই দরজার ধারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ছবি, হাতের সেই আঙুল ক'টা আর গালের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল শুধু তার। কিন্তু সেই দেখাটুকুতে ছবির মুখের ভাব ধরা পড়ছিল না।

ধরা পড়ছিল না,—এখনো আগের মতোই অনমনীয়, না নরম হয়ে এসেছে।

সতীনাথ ডাকতে আসার পরও যদি পূর্ব অবস্থাই থাকে, ধরে নিতে হবে, ছবিও তার বরের মতো পাগল হয়ে গেছে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন বোঝা গেল না। ছবি অদ্ভুত শুকনো গলায় বলল, 'তুমি আবার কেন কষ্ট করতে এলে দাদা, আমি তো বলেই দিয়েছি—'

'হ্যাঁ জানি—' সতীনাথ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ স্বরের সংমিশ্রণে বলেন, 'জানি একে-একে বাড়িশুদ্ধ লোক তোমাকে খোশামোদ করতে এসেছে, আর তুমি সবাইকে হুট্-আউট করে দিয়েছ 'খাব না, নিচে নামব না' বলে। তোমার বৌদি তো শুনলাম হাত জোড় করে ফিরে গেছে। তাতেও—তোমার—'

ছবির মুখ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

ছবি যদি ঘরের মধ্যে থেকে একটু বেরিয়ে আসতো, হয়তো দেখা যেত, কিন্তু

বেরিয়ে আসছে না ছবি। যেন ঘরের দরজায় কে তাকে গণ্ডি কেটে দিয়ে আটকে রেখে গেছে সীতার মতো। ওই চৌকাঠ ডিঙোলেই রাবণের হাতে পড়ে যাবে ও!

কিন্তু দরজাটা বন্ধ করে ফেলে নিজেকে যে ছবি একবার বিছানায় ফেলবে সে অবকাশ মিলছে না। সেই সন্ধ্যা থেকে কেবল লোকের পর লোক আসছে ছবিকে ডাকতে।

'অ ছবি, পাঁচশো লোক এসেছে নিচে, কতজন খোঁজ করছে 'ছবি ছবি' করে, আয় একবার!...'অ ছবি, কী রূপের জামাই হয়েছে তোর দাদার, দেখবি না একবার?'...'পিসিমা, সম্প্রদানের ঘরে কী সব তুমি করে আস নি, বাবা রেগে আগুন হয়ে গেছে, এসো শিগ্‌গির!...

কিন্তু ছবি অটল।

ছবির দুর্জয় মান ভাঙছে না।

ছবি বলছে, 'মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে!'

অথচ সারাদিন কিছুই না।

কোনদিনই কিছু না। গোড়া থেকে বিয়ের সব কাজই ছবি সামলাচ্ছে।...রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর খাবারঘর পূজোর ঘর চরকি ঘুরে বেড়াচ্ছে ছবি, এর মাঝখানে ঠিক এই বিয়ের সন্ধ্যায় কোন্ ফাঁকে যে সেই ঘটনাটুকু ঘটে গেছে, আর কোন্ ফাঁকে ছবি সেই তুচ্ছ ঘটনাকেই উচ্চ করে তুলে অভিমানে শয্যা নিতে গেছে, তা কেউ খেয়াল করে নি। খোঁজ পড়েছিল সম্প্রদানের সময়।

ছবি কোথায়? ছবি?

গাঁটছড়ার হলুদকড়ি কোথায় রেখে গেল ছবি? কনের লজ্জাবস্ত্র? পাওয়া যাচ্ছে না দরকারের সময়।

পাওয়া অবিশ্যি গেলই তখুনি, পাশেই ছিল। কিন্তু কেউ পাশে বসে হাতে হাতে জুগিয়ে না দিলে অসুবিধে নেই? আর শুধু গাঁটছড়ার হলুদকড়ি আর কনের লজ্জাবস্ত্রই তো নয়, নিয়মকর্মের সব কিছুই তো ছবির এক্তিয়ারে। কনের মা কত দিকে তাল দেবে? অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে হবে না তাকে।

কিন্তু সব জেনেও সবচেয়ে মোক্ষম সময় হাওয়া হয়ে গেল ছবি? ছি ছি! ধমক খাওয়া বরকে সোহাগ করতে গেল আর কি! কিন্তু এইটা কি তার সময়? পাগল-ছাগল মানুষ, আবার কী করতে কী করবে, তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রেখে নিশ্চিন্দি হয়ে নেমে আয়? বর-কনে বাসরে বসলে তখন বরং গুছিয়ে ভোজের রান্না সাজিয়ে নিয়ে তিনতলায় বসে বরকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে সোহাগ করিস!

এ কী!

এ যে বরদাস্ত করা কঠিন!

এই বাড়িভর্তি লোকের সামনে তুই তেজ করে বর নিয়ে ঘরে বসে আছিস? বলছিল 'ও খাবে না, আমি খাবো না!' ছি ছি! অমন যে জামাই হল, দাদার কত আমোদ-আহ্লাদ হল, বিয়ের সময়, স্ত্রী-আচারের সময় দেখলি না একবার? এমন কি খাওয়ায় পর্যন্ত তেজ দেখাচ্ছিস? এই উৎসব, এই কাণ্ডর রান্না-বান্না, মাছ-মিষ্টি হেন-তেন তার কিছু দাঁতে কাটবি না দুটো মানুষে? উপোস করে পড়ে থাকবি?

ভাইঝির কল্যাণ-অকল্যাণ দেখবি না? ভাই-ভাজের মাথা হেঁট করবি? ইতরতার কি মাত্রা নেই?

দাদা, তোর চাইতে কুড়ি বছরের বড়ো দাদা, বাপের মতো বললেই হয়, বাপের মতোই মানুষ করেছে তোকে, বিয়েও দিয়েছে। আর তারপর বারোমাস তিরিশদিন তোকে আর তোর পাগল বরকে পুষেছে, ঘর বানিয়ে দিয়েছে তোর জন্যে। সেই দাদা যদি পাগলাটাকে একটা ধমকেই থাকে, কি একটা ধাক্কাই দিয়ে থাকে, এই ব্যবহারটা করবি তুই? কৃতজ্ঞতার বালাই নেই শরীরে?

এত বড়ো অকৃতজ্ঞতা করে কেমন যেন দেখাচ্ছে ছবিকে, সেই দৃশ্য দেখতেই বোধ করি ছবির এই টালীছাত ঘরের দরজায় রথ-দোলের ভিড় হয়েছে তখন থেকে।

অনেকে আবার সহানুভূতিও দেখাচ্ছে।

চুপি চুপি অবশ্য।

কারণ যার বাড়ি তার বিপক্ষ দলের হয়ে কথা বলতে চুপিচুপিই ভালো। চুপিচুপি বলা যায়, 'আহা!' বলা যায়—'মরে যাই, ছোট ভগ্নীপতিটা পাগল মানুষ, বোঝে না বলেই না অমন কাজটা করে ফেলেছিল, তারজন্যে তুমি একটা বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তোমারই মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ, সেই শুভদিনে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে? বোনটা 'কারে' পড়ে তোমার কাছে পড়ে আছে বলেই না এমনটা পারলে? পয়সাওয়ালা ভাগ্যিমানী বোন হলে পারতে?

কিন্তু নিচে নেমে গিয়ে তারাই আবার রেগে আটখানা হয়ে উল্‌টো গাইতে বসেছে।

না বসবে কেন?

তারা কি খৃস্ট, না শ্রীচৈতন্য যে, রাগ নেই শরীরে? ওই সহানুভূতির উত্তরে ছবি যদি চোখের জল না ফেলে, যদি বলে, 'এসব কথা আমার ভালো লাগছে না, আপনারা নিচে যান—'

তাহলে?

খৃষ্ট-চৈতন্যের রাগ হতো এতে।

কিন্তু এসব তো সান্ধ্য লীলা!

রাত্রে, অনেকটা রাত্রে, যখন বাইরের লোক বিদায় নিয়েছে, বাড়ির লোকেরা শুধু খেতে বাকী, যখন সতীনাথ তাঁর জামাইয়ের রূপে-গুণে মোহিত, এবং নিজের ক্যাপাসিটির আহ্লাদে ভরপুর, তখন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'ক্ষিতীশ খেয়েছে?'

তখনই বোধ করি মনে পড়ল, অসভ্যের মতো একটা ঝাড়নের ওপর একরাশ লুচি মিষ্টি চপ ফ্রাই নিয়ে আসরের মাঝখানে খেতে বসেছে দেখে ক্ষিতীশকে তিনি প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলেন আসর থেকে।

কাজটা একটু গর্হিত হয়েছিল, অস্বীকার করেছেন না সতীনাথ, কিন্তু তাঁরও তো রক্তমাংসের শরীর?

সেই মাত্র বরযাত্রীর দল এসে আসরে বসেছে, এবং সতীনাথ কন্যাদান করবেন বলে তখনো অভুক্ত রয়েছেন, সেই উদ্বেগে অধীর, উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, আর আশঙ্কায় থরথর সঙ্গীন সময়ে ওই কুৎসিত বীভৎস দৃশ্য সহ্য করা কি সহজ?

সহ্য করতে পারেন নি সতীনাথ।

কিন্তু পাগলটা যে তাতে অপমানে খান্‌খান্‌ হবে, তাও আশঙ্কা করেন নি। ঘুরে গিয়ে আবার হালুইকরদের কাছে গিয়ে বসবে, এই রকমই একটা আন্দাজ ছিল। জানতে পারলেন ছবির অনুপস্থিতিতে। ছবি বিহনে শুধু তো তিনিই অসুবিধেয় পড়েন নি সারা বাড়িতেই নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, আর 'ছবি-ছবি' রব পড়ে গেছে।

সেই সময় বড়ো শালী ওই 'দানের' আসরেই কারণটা উদ্‌ঘাটিত করে ফেললেন।

'কি জানি ভাই, শুনছি তুমি নাকি কখন তোমার বোনাইকে যাচ্ছেতাই করেছ, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়েছ, তাই বোন তোমার মনের দুঃখে বর নিয়ে নিজের কুঠরিতে গিয়ে বসে আছে। সেই অবধি নামে নি। বোনাইটি বুঝি হালুকইকরদের কাছে তম্বিগম্বি করে এক পোঁটলা খাবার জোগাড় করেছিল, সে-সব উঠোনে দালানে সিঁড়িতে ছড়াছড়ি কাণ্ড! রাগ করে ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে গেছে! তা না হয় পাগল, বোন তো তোমার পাগল নয়?'

এই যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নে তখন সতীনাথও রাগে পাগল হয়ে উঠেছিলেন, নেহাৎ দানের আসনে বসে, তাই উচিত ব্যবস্থা করতে পারেন নি, কিন্তু এখন মনের মধ্যে উদারতার সুর বাজছে, এখন প্রশ্ন করা যায় 'ক্ষিতীশ খেয়েছে?'

অনুকূল, সন্ধ্যা থেকে, না হয় পঞ্চাশজন গিয়ে সেধেছে ছবিকে বিয়ে দেখতে, পাঁচজনের কাছে এসে বসতে, পঙক্তিতে বসে খেতে। পাহাড়ের মতো অচল হয়ে বসে আছে ছবি, নামানো যায় নি তাকে।

এ হেন অসভ্যতার কাহিনীটা আবার সবটাই শুনলেন স্ত্রীর মুখে। তার পরেও তার মনের মধ্যে উদার রাগিনী বাজতে থাকবে, এ আশা করা চলে না।

তেড়ে উঠে গেলেন তিনতলায়।

বললেন, 'না হয় হাতজোড়ই করছি, একবার আমাদের সঙ্গে খেতে বসবি চল।'

ছবির কি গলা কাঁপলো?

না সতীনাথের মনের ভ্রম?

বোধহয় ভ্রমই। ছবি তো খুব পরিষ্কার গলায় বলছে, 'এসব কেন বলছো দাদা, আমি তো বলছি আমার খাবার ক্ষমতা নেই, খেতে পারবো না। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে!'

সতীনাথের সেই এক পোঁটলা খাবারের বীভৎস দৃশ্যের কথা স্মরণে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কথা।...পাগল হোক ছাগল হোক, স্বামী!

নরম গলায় বললেন, 'বেশ তো, পারিস না পারিস বসবি আয় একবার। ক্ষিতীশের খাবারটা ওপরে পাঠিয়ে দিতে বলছি, ওকে খাইয়ে চলে আয়।'

ছবি তেমনি নিষ্কম্প দাঁড়িয়েই বলল, 'ও খাবে না দাদা!'

আবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

আর সেই আশ্চর্যও নয়।

সতীনাথ নেমে এলেন, শুধু কড়া গলায় একটি মন্তব্য করে, 'বেইমান হলে এই রকমই হয় বটে।'

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অমল উঠে এল।

শেষ পরিবেশনের দয়িত্ব নিয়েছে সে, অথচ সামান্য একটা মেয়ের ধনুক-ভাঙা পণে অকারণ ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর থেকে ফের একটায় গিয়ে পড়ল।

সে এদের আত্মীয় নয় কিছু নয়, পাড়ার লোক মাত্র, তার এত দায়িত্ব মাথায় নেবার কারণ নেই, তবু নিয়েছে। স্বভাবে নিয়েছে। কিন্তু আর রাত হলে তার নিজের বাড়ির লোক. কি বলবে?

সিঁড়িতে সতীনাথের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা।

সতীনাথ একবার তাকিয়ে দেখলেন, ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেন, 'ও তুমি বুঝি বাকী ছিলে?'

নেমে গেলেন।

পাড়ার ছেলে, চিরকালের চেনা জানা, অবাক কিছু হলেন না। তবে আশাও রাখলেন না।

অমলও রাখে নি।

অমলের কিছুই শুনতে বাকী নেই।

ঘটনা থেকে মন্তব্য!

তাই অমলের ভরসা নিজের উপর। তবু তার একবার দেখবার কৌতূহল হচ্ছিল। অতখানি অনমনীয় হলে দেখতে কেমন লাগে ছবিকে, বোধ করি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল অমলের!

ছবি তখন আসতে আসতে দরজটা বন্ধ করছিল। হয়তো ভাবছিল এইবার একটু শুয়ে পড়তে পারি।

অমলকে দেখে হাতটা থামালো। দরজা আধাখানা বন্ধই রইল।

অমল ভাবল, ফস্ করে কি একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাবো? দেখবো মুখটা কেমন দেখাচ্ছে ওর?

তা জ্বালল না।

বলল, 'আলোটা জ্বালো না!'

ছবি আগের মতোই শুকনো গলায় বললে, 'কী দরকার?'

'দরকার অবশ্যই নেই, কিন্তু তোমাকে কেমন যেন ভৌতিক-ভৌতিক লাগছে, তাই—'

ছবি প্রতিবাদ করল না, চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না, কৈশোর স্মৃতির মর্যাদা রক্ষা করতে এই কৌতূক-কথায় হেসেও উঠল না। ছবি শুধু ছবির মতোই দাঁড়িয়ে রইল সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে।

অমল ছবির ঘরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিল না, আধভেজানো দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ছবি। তাই অমন ঘরের মধ্যেটায় একবার চোখ ফেলবার বৃথা চেষ্টা করে বলল, 'ক্ষিতীশবাবু ঘুমোচ্ছেন?'

এখন ছবি অকারণ যেন একটু হাসলো। বললো, 'হ্যাঁ!'

'শুনলাম সতীনাথদা ওঁকে 'ইয়ে' করছেন, কিন্তু ছবি, তবু এতটা না করলেও পারতে তুমি! শুনে শুনে এত লজ্জা করছিল—'

ছবি এবার স্পষ্টই হেসে উঠল।

আর-আরও একবার মনে হল অমলের, সত্যিই ছবিকে যেন ভৌতিক-ভৌতিক দেখাচ্ছে। হাসিটা পর্যন্ত। হাসির সঙ্গে বলল ছবি, 'আমার নির্লজ্জতায় তুমি হঠাৎ লজ্জা পেতে গেল কেন অমল?'

অমল কি সত্যি দেশলাই কাঠি জ্বলাবে? দেখবে শুধু নির্লজ্জই নয়, নিতান্ত নিষ্ঠুর এই ছবির মুখটা কেমন দেখতে লাগছে?

অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা ছবিকে চিনতে কষ্টই হচ্ছে।

ছবির দাদা ঠকেছিল, না বুঝে ছবিকে একটা মাথা খারাপ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, তবু ছবি কোনো দিন দাদার নামে অভিযোগ করে নি। ছবির ভাসুর পাগল-ভাই আর ভাদ্রবৌকে এখানে চালান করে দিয়েছিল, তার জন্যেও ছবি গাল দেয় নি তাদের।

ছবি অমলের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দেয় নি কোনো দিন। সহজ স্বাভাবিকভাবে ছবি কাজকর্ম করেছে, কুমারীকালে যে ভাবে এ সংসারের দায়িত্ব নিত, তাই নিয়েছে, বেশির মধ্যে পাগলকে সামলেছে।

কিন্তু সব কিছুর উপর চমৎকার একটা কৌতূকের বর্ম পরিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে ছবি। অমল কী না জানে, অমল সর্বদা আসে!

ক্ষিতীশকে অনেকক্ষণ না দেখলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ছবি, সেও হাসির ছলে। গল্প করতে করতে সহসা উঠে পড়ে বলেছে, 'এই সেরেছে, অনেকক্ষণ যেন আমার নিধিটিকে দেখি নি মনে হচ্ছে, যাই দেখি আবার বৈরাগী হয়ে চলে গেল কি না!'...বলেছে, 'কটা বাজলো? ওমা তা তো মেঘে বেশ বেলা হয়ে গেছে! দেখি আবার প্রভু নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি খাচ্ছেন কি না!' বলেছে, 'ওই দেখ মুখ কালি করে হঠাৎ চলে গেলেন দয়াময়, আমরা জমিয়ে গল্প করছি, প্রাণে সহ্য হল না। চললাম বাবা। নচেৎ ভোলানাথ রুদ্র হয়ে বসে থাকবেন!'

পাগলের পাগলজনোচিত আচরণে যদি কেউ ঠাট্টা বা বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কোনো দিন রাগ করতে দেখা যায় নি ছবিকে। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছে, 'বল বাবা, তোমরা সবাই মিলে একটু বল! আমার কিছু কাজ কমুক! জামাইবাবু বলে সমীহ না করে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ' করলে উপকার হয় ওর!'

হেসে হেসেই বলেছে।

অথচ আজ বরের ওইটুকু সত্যিকার অপমানেই ভোল বদলে গেল ছবির?

সতীনাথের স্ত্রীর কথাই তা হলে সত্যি বলে ধরতে হবে? ভাবতে হবে হিংসের জ্বালায় সামান্য একটু ছুতো পেয়েই এমনটা করেছে ছবি? দাদার মেয়ের এত ভালো বিয়ে হলো, অমন সুন্দর বর হলো, এতে বুক ফেটে যাচ্ছে তার!

ছবির সম্পর্কে অমন কথা ভাবা যায় না।

কিন্তু নিজেই ভাবাচ্ছে ছবি।

এই অশোভন আচরণ আর বিসদৃশ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাবিয়ে ছাড়ছে।

ঈর্ষাই!

নইলে কবে এমন পতিভক্তি ছিল ছবির? বরং তার বৌদি বলেছে, 'স্বামী পাগল বলে এতটুকু দুঃখু আছে ছবির, তা বোঝাও যায় না! কি অদ্ভুত অটুট মন বাবা!'

ছবির সেই অটুট মন টুটোফুটো হয়ে গেছে অতএব হিংসের জ্বালাতেই!

কিন্তু অমল এ-সব চিন্তার ওঠাপড়া প্রকাশ করল না! শুধু বলল, 'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর ছবি!'

ছবি বলল, 'আজ জানলে?' তারপর বলল, 'কিন্তু তুমি শুদ্ধ কেন এলে বল দেখি? খাওয়ার জন্য ডাকতে নাকি?'

অমল আহত দৃষ্টি তুলে আর একবার চেষ্টা করল ছবিকে দেখতে। তারপর বলল, 'না, তোমাকে ডাকতে আসি এত দুঃসাহস নেই। ভাবছিলাম—ক্ষিতীশবাবুকে খেতে না দিয়ে আটকে রেখে দাদাকে আর কতটুকু শাস্তি দিতে পারলে? শুধু ওই বেচারী ভদ্রলোককেই জব্দ করলে। খুব উৎসাহ করে আমায় বলেছিলেন, তুমি আমায় পরিবেশন করে খাওয়াবে, বুঝলে? এরা ভালো করে দেবে না!'

কথা শেষ করে হাসল একটু অমল। বললো, 'অবশ্য 'এরা' বলেন নি' বলেছিলেন 'শালারা'!

ছবির কি এতক্ষণ উপোস করে থেকে গলাটা অত বেশি শুকিয়ে গেছে? না কি এতক্ষণকার অশোভন আচরণের অনুতাপে? নইলে গলাটা তো বেশ সুরেলাই ছিল ছবির!

ছিল, এখন নেই। এখন সেই শুকনো গলাতেই বলে ছবি, 'তা তোমার পরিবেশনের অপেক্ষা তো রাখে নি, নিজেই তো—'

'থাক্ ছবি, সে সব কথায়...তুমি খাও না খাও, ওঁকে একটু তুলে দাও, আমার সত্য রক্ষা করি।'

ছবি তার কৈশোর স্মৃতির মর্যাদাকে একবারে ধুলিসাৎ করলো। ছবি তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বললো, 'ও খাবে না!'

'ছবি! বাস্তবিকই তুমি যতপরোনাস্তি অসভ্যতা করছো! সবেরই সীমা থাকা দরকার। আজ রাগ করে খেতে দেবে না তুমি ওঁকে, কাল তো দিতে হবে? তখন?'

ছবি এবার হেসে উঠল।

সত্যিকার হেসে উঠল। শব্দ করে।

বললো, 'কালও খাবে না অমল, কাল না পরশু না, কোনোদিন না!'

অমল এই সাধারণ রাগের কথাটায় এমন ভয় পেল কেন? ছবিকে কি সত্যি ভৌতিক মনে হল অমলের, ওই হাসি শুনে?

তাই অমল হঠাৎ 'ছবি' বলে অমন আর্তনাদ করে উঠল!

ছবি এ ডাকের উত্তর দিল না। ছবি নড়লও না।

আর ছবির সেই অনড় মূর্তিটার দিকে চেয়ে অমল হঠাৎ বহুকালের ভুলে যাওয়া একটা বোকামি করে বসলো। একেবারে কাছে সরে এসে কপাট ধরে থাকা হাতটা চেপে ধরলো জোরে। বললো, 'ছবি, আলো জ্বালাও!'

ছবি আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

বললো, 'কী হবে?'

'আমি দেখবো!'

'দেখবার কিছু নেই অমল!'

'ছবি নিজেকে এতে নির্ভুল মনে করো না, দরজা ছাড়ো, আমায় দেখতে দাও!'

ছবি তবু সরে গেল না।

শুধু স্বরটা দৃঢ় করলো, 'সত্যিই দেখবার কিছু নেই অমল।'

অমলও কি ভৌতিক হয়ে গেছে?

অমলকেই বা অমন দেখাচ্ছে কেন?

অমল কি ভুলে গেছে তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিচের লোকেরা কী ভাবছে? ওদের কৈশোরের ইতিহাস কি তাদের কারুর মনে নেই?

অনেকক্ষণ পরে বোধহয় অমলের মনে পড়লো নিচের তলায় একটা জগৎ আছে। তাকে নামতে হবে। তাই বললো, 'ছবি এটা কি! 'শালা আমায় খেতে দিল না' বলে নিজের মাথাতেই কিল বসাতে বসলো—'

'ছবি, তুমি কি পাথরের?

'হয়তো তাই!'

'ছবি, নিচে গিয়ে ওদের কী বলবো?'

'কিচ্ছু না অমল, দোহাই তোমার। বর-কনে বাসরে বসেছে, ওদের এই রাতটাকে ধ্বংস করে দিও না।'

'ছবি, কী করে পারছো?

'পারতে তো হবেই অমল! সীমারেখাটা ভুললে চলবে কেন? ওদের এই আহ্লাদের সময় কি আমি আমার—'

'সারারাত এইভাবে থাকবে তুমি?'

'না, শোবো। বড্ড ঘুম পেয়েছে, মন হচ্ছে পড়ে যাবো।'

অভদ্র আর অসভ্য ছবি হঠাৎ অমলের মুখের সামনেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

খুট করে একটা শব্দ হল। ছিটকিনির শব্দ।

হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ না করে আর পারছে না ছবি। সতীনাথের কথাটাই এখন ঠিক মনে হচ্ছে ওর, সব কিছুরই মাত্রা থাকে, থাকা উচিত!

কয়েক ঘণ্টা এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অন্ধকারটার মধ্যে ডুবে থাকতে পেলে আবার ছবি শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। আবার কাল সকালে স্বাভাবিক ছন্দে নিচে নেমে গিয়ে সহজ গলায় বলতে পারবে, 'কাল বিয়ের গোলমালের মধ্যে তোমাদের আর ব্যস্ত করি নি, কিন্তু আর বোধহয় না করলে চলবে না। এসে দেখ এবার! যা করবার তোমাদেরই তো করতে হবে!'

কাঁচ পুতি হীরে, ১৯৬৭

সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০)
জন্ম হাজারিবাগে। অসামান্য শক্তিশালী লেখক। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁর অনুরাগ। প্রথম জীবন কেটেছে ছোট-নাগপুর অঞ্চলে। তাঁর বহু রচনার পটভূমি এই অঞ্চল। তাঁর বিচিত্র ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলেছে বৈদগ্ধ্য ও শিল্পনৈপুণ্য। আদিবাসী জীবন থেকে সামরিক জীবন, নৃতত্ত্ব থেকে চারুকলা —সর্ববিষয়ে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মানবমনের চোরাগলির রহস্য উদঘাটনে নিপুণ।

ঠগিনী

সনাতন আর সনাতনের মেয়ে সুধা। যেমন বাপ তেমন মেয়ে।

একের পর এক অদ্ভুত এক-একটা ঘটনা ঘটে, আর সেই ঘটনায় বাপ যেমন বেদানায় একেবারে ভেঙে পড়ে ও ডুকরে কাঁদে, তেমনি মেয়েও ব্যথার ভারে মুখ তুলে তাকাতেও পারে না, চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। যারা কাছে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে, তাদেরও চোখে জল আর বুকে দীর্ঘশ্বাস দেখা দেয়।—আহা কি কষ্টের কথা। একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই যার, সে মানুষের বুক তো ভেঙেই পড়বে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে গিয়ে।

সুধার বিয়ের পরদিন যখন সুধাকে নিয়ে বিদায় নেবার জন্য তৈরি হয় বর আর বরযাত্রী এবং আরও দু-চারজন, তখন ডুকরে কেঁদে ওঠে সনাতন, আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সুধা।

কিন্তু একমাস যেতে না যেতে পাড়ার এইসব মানুষ, এবং ওই বর ও আরও অনেকে বেশ ভালো করে বুঝতে পারে, হ্যাঁ ঠিক, একেবারে বর্ণে বর্ণে ঠিক, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। যেমন ধড়িবাজ সনাতন তেমনই ধড়িবাজ তার মেয়ে। মানুষকে ঠকাবার কায়দা আর কীর্তিতে দুজনেই সমান চৌকস। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। যেমন বাপ তেমনই মেয়ে।

পুলিশ বলে, যেমন মেয়ে তেমনই বাপ। এই নিয়ে তিনবার হলো। একবার তারকেশ্বরে আর একবার বসিরহাটে এই রকম জোচ্চুরির দুটো কেস হয়েছে। মাত্র দুমাসের মধ্যে দুটো কেস। এটা হলো থার্ড কেস। তিনটে ঘটনা এই একই বাপ এবং একই মেয়ের কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। এই রকম করে মানুষ ঠকানো ও দুজনের পেশা।

ভাটপাড়ার বাজারের কাছে পাড়ার একটি গলির মধ্যে একটা ছোট ঘরের দরজার বন্ধ তালা ভেঙে তল্লাসী করে পুলিশ। কিন্তু একটা কুটোও পড়ে নেই সেই শূন্য-ঘরের কোন কোণে। সনাতন আর সুধা, সেই বাপ আর মেয়ে যেন এক অদ্ভুত ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে নিজেদের একেবারে হাওয়াতে মিশিয়ে দিয়েছে। কখন পালিয়ে গেল, কেউ বলতে পারে না। পাড়ার লোক যারা একমাস আগে সেই বাপ

ও মেয়ের চোখের জল দেখে নিজেরাও কাঁদ-কাঁদ হয়েছিল, লজ্জা পায় তারা এবং আক্ষেপ করে।—বাস্তবিক এই সংসারই একটা চিড়িয়াখানা, কি না কাণ্ড হয় এখানে।

কেউ কেউ বলেন—চিড়িয়াখানাতে এ রকম কুৎসিত কাণ্ড হয় না মশাই, মানুষের সংসারে হয়।

আর একজন বলেন—লজ্জার ব্যাপার এই যে, আমাদের পাড়াতেই আমাদের চোখের উপর দিয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল' কোথাকার একটা লোক আর একটা মেয়ে এসে ক'দিনের মধ্যে পাড়াশুদ্ধ লোককে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে কেটে পড়লো মশাই। কেউ ওদের একটু সন্দেহ করতে পারলো না।

হ্যাঁ, কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। ঐ ডুকরে কাঁদা আর ফুঁপিয়ে কাঁদা দৃশ্যটার মধ্যে যে অতি চমৎকার একটা জোচ্চুরি হাসছে, সেটা পাড়ার লোকের চোখে আর বর ও বরযাত্রীদের চোখে ধরা পড়ে নি। ধরা পড়বেই বা কেমন করে? বাপ ও মেয়ের সেই করুণ কান্নার ছবি এখনও স্মরণ করলে মনে হয়, না, জোচ্চুরির ব্যাপার নয়, অন্য কোন ব্যাপার আছে।

পুলিশ বলে—অন্য কোন ব্যাপার নয়। ওরা বাপ ও মেয়ে ঠিকই। এক-একটা নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নাম নিয়ে আর নতুন জাতের নাম নিয়ে বাপেতে-মেয়েতে কিছুদিন থাকে। তারপরেই এই রকম একটা কাণ্ড করে সরে পড়ে।

পাড়ার লোকও দুঃখে ও লজ্জায়, এবং যেন অপরাধীর মতো মুখের ভাব করে তাকিয়ে থাকে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে, যিনি মাত্র এক মাস আগে টোপর মাথায় দিয়ে এক সন্ধ্যায় এই পাড়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজকের ঐ শূন্য-ঘরের এক গরীব পিতাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার জন্য। পাড়ার কয়েকটা ছোকরা মুখ টিপে হাসতেও থাকে।

ভদ্রলোক একটু বয়স্ক, বয়স পঁয়তাল্লিশেরও বেশি হবে, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। নৈহাটিতে কাপড়ের দোকান আছে ভদ্রলোকের। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান এক ব্যবসায়ী মানুষ। আবার বিয়ে করবার জন্যে প্রস্তুতও ছিলেন না, ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সনাতনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হবার পর এবং সনাতনবাবুর দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়ার পর তাঁর এই বয়সের মনও সংসারের কাছ থেকে একটা মিষ্টি হাসি পাওয়ার জন্য বড়োই বিচলিত হয়ে উঠলো। এই গলির ঐ ঘরেতে সনাতনবাবুর আমন্ত্রণে একদিন একটু পিঠে আর পায়েস খেতে এসে মনে মনে ঠিক করে ফেললেন তিনি, সনাতনবাবুকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতেই হবে। স্বজাতের এক গরীবের এত সুন্দরী একটি মেয়ে এইভাবে পড়ে আছে এই গলির অন্ধকারে; ভাবতেও কষ্ট হয়েছিল নৈহাটির সেই কাপড়-বেচা আর বেশ কিছু টাকা-পয়সাঅলা মানুষটির মনে। মেয়ের বাপ সনাতনকে নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে, এবং দানসামগ্রীর জন্য আর কিছু দিয়ে, আর মেয়ের জন্য দশভরি সোনার অলঙ্কার দিয়ে সনাতনের সম্মতি ও একটা শুভদিন স্থির করে ফেললেন

নৈহাটির গণেশ বস্ত্রালয়ের এই মালিক। বেচারা! সুন্দরী সুধার ঘোমটা ঢাকা মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ধন্য হয়ে এবং সুধাকে নিয়ে এক সকালে এই গলির ঐ ঘর থেকে বিদায় নিলেন যে মানুষটি, তিনিই আজ পুলিশের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে আছেন এ ঘরের দরজার কাছে। বিয়ের দিন সাতেক পরে সনাতন নিজে নৈহাটিতে গিয়ে সুধাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল এই বাসাতেই। তারপর আর ক'দিন যে এখানে ছিল, তা ঠিক কেউ বলতে পারে না! চিঠি দিয়েও কোন খবর না পেয়ে, এবং নিজে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পেয়ে একদিন চমকে উঠলেন গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিক। পুলিশে খবর দেওয়া হলো, এবং পুলিশ এখন বলছে, হ্যাঁ, এই নিয়ে তৃতীয়বার, এইভাবেই আরও দুবার ঐ বাপ তার ঐ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, আর বিয়ের ক'দিন পরেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বাপ ও মেয়ে দুজনেই। ওদের আসল নামও জানে না পুলিশ

তারকেশ্বরে ওরা ছিল ব্রাহ্মণ এবং বসিরহাটে কায়স্থ। ভাটপাড়ায় এসে রয়েছে বৈদ্য। তারকেশ্বরে কেসটা হলো, প্রসন্ন চক্রবর্তী নামে এক বাপ এবং সুনয়না নামে তাঁর এক মেয়ের জোচ্চুরি। বসিরহাটের কেসটা হলো, সদানন্দ ঘোষ নামে এক বাপ আর মাধবী নামে এক মেয়ের জোচ্চুরির কেস। আর এখন ভাটপাড়ার এই গলিতে তারাই সনাতন সেন আর সুধা সেন নামে অদ্ভুত এক বাপ এবং অদ্ভুত এক মেয়ের এক জোচ্চুরির স্মৃতিটুকু শুধু রেখে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তিনজন নিরীহ ও বিশ্বাসী মানুষের জীবনকে মিথ্যা বাসরঘর আর ভুয়া ফুলশয্যা দিয়ে নির্মমভাবে ঠকিয়ে এই পৃথিবীর জনতার ভিড়ের মধ্যে এখন কে জানে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে এক অদ্ভুত ঠগ আর এক অদ্ভুত ঠগিনী মেয়ে। যেমন বাপ তার তেমনই মেয়ে। এবং যেমন মেয়ে তেমনই তার বাপ।

ভাটপাড়ার গলি থেকে চিন্তা করতে করতে ফিরে যায় পুলিশ। পাড়ার লোকেরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। আর, গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিক একটা হাসি-হাসি শান্ত ও সুন্দর মুখ কল্পনায় দেখতে পেয়ে দুঃখে ও বিস্ময়ে শিউরে ওঠেন।—উঃ, এরকম করেও মানুষ ঠকাতে পারে মানুষকে!

ভাটপাড়ার গলি জানে না, পুলিশও অনুমান করতে পারে না, আর গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিকের মনও কল্পনা করতে পারে না যে, ঠিক সেই মুহূর্তে রানাঘাটের এক পল্লীর এক ক্ষুদ্র গৃহের জানালার দিকে তাকিয়ে এইভাবে নিজের ভাগ্যকে এক নিষ্ঠুর ছলনার জালে সমর্পণ করবার জন্য হাসছে আর একটা মানুষের চোখ! বিজয়বাবু নামে এক ভদ্রলোকের করবী নামে এক তরুণী কন্যা কথা বলছে রমেশ নামে এক যুবকের সঙ্গে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর থেকে করবী অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলে আপনি কেন বারবার আসেন?

রমেশ উৎফুল্লভাবে হাসতে থাকে। এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে কি বলেছে জান? যে মেয়ে আমার বউ হবে, তার নামের প্রথম অক্ষর হলো 'ক'।

করবীও হাসে। কিন্তু বুঝতে পারেন না কেন, এরকম করে শুধু রোজই এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার শুধু দুর্নাম হবে, আর কিছুই হবে না।

সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে রমেশ বলে—আমি যে না এসে পারছি না করবী। যেদিন তুমি প্রথম তাকিয়েছ আমার দিকে, সেদিনই বুঝেছি যে তুমিই আমার শান্তি আর সুখ।

করবী বলে এ আপনার বড়োলোকী খেয়াল। এখন আসতে ভালো লাগছে, কিন্তু আর ক'দিন পরে এদিকের কথা ভুলেও মনে পড়বে না, আসতে ভালোও লাগবে না, আর আসবেনও না। তবে কেন মিছামিছি...।

রমেশ বলে—আমি বড়লোক নই; বড়োলোকী খেয়ালও আমার নেই। আমি তোমাকে দেখতে আসি প্রাণের দায়ে। এটা আমার খেয়াল নয় করবী।

করবী—আপনি মোটেই বড়লোক না?

রমেশ—মোটেই না।

করবী—কি করেন আপনি?

রমেশ—আমি আর্টিস্ট।

করবী—তার মানে?

রমেশ—কলকাতায় তুমি ছিলে কখনো?

করবী—হ্যাঁ, ছিলাম কিছুদিন।

রমেশ—সিনেমা ছবি দেখেছ কখনো?

করবী—দু-একটা দেখেছি।

রমেশ—সিনেমা হাউসের দেয়ালে আঁকা বড়ো বড়ো রঙীন ছবিগুলি চোখে পড়েছে কখনো?

করবী—হ্যাঁ।

রমেশ—ঐ ছবি আমি আঁকি।

করবী—তার জন্য কি টাকা-পয়সা পান?

রমেশ—নিশ্চয়। ঐ তো আমার রোজাগার। আর ভগবানের আশীর্বাদে একরকম মন্দ নয় আমার রোজগার।

করবী—মাসে পঞ্চাশ টাকা হয়?

রমেশ হাসে—তা হয় বৈকি।

করবী—ঠিক কত হয় বলুন না?

রমেশ—যাই হোক না কেন, তাতে তোমাকে সুখে রাখতে পারবো। করবী মুখ ভার করে বলে—হ্যাঁ, কাঙালের মেয়েকে সুখী করতে বছরে একজোড়া শাড়ি আর

রোজ একবেলা দুমুঠো ভাত দরকার, তার বেশি আর কিছু দরকার হয় না।

রমেশ বিব্রতভাবে বলে—তা কেন হবে? আমি কি বছরে একজোড়া ধুতি পরি, না রোজ একবেলা দুমুঠো ভাত খাই?

করবী হাসে—তাহলে বলুন, আপনার টাকা আছে।

রমেশ—তোমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবার মতো, তোমাকে কষ্ট না দেবার মতো টাকা আছে বৈকি। তবে...ঐ ওরকম নয়।

দূরে এক মারোয়াড়ী বনিকের প্রকাণ্ড একটা বাড়ির দিকে হাত তুলে রমেশ বলে—ওরকম বড়োলোক আমি নই, তুমিও নও করবী; কাজেই...।

করবী—বিয়ের খরচ আসবে কোথা থেকে?

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবে। তারপর একটু হতাশ ভাবে বলে, বিজয়বাবুর কি একেবারে কিছুই নেই?

ছলছল করে করবীর দুই চোখ। থাকলে কি আর...।

রমেশ—কত টাকা লাগতে পারে?

করবী—আমি তো জানি, ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে নমো নমো করেও সারতে হলে অন্তত দু হাজার টাকা লাগে।

রমেশ বিস্মিত হয়।—দু হাজার!

করবীর চোখের কোণে একটা সন্দেহভরা বিরক্তির ভাব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—কি ভাবছেন? পারবেন না এই সামান্য দু হাজার টাকা জোগাড় করতে?

রমেশ বিষণ্ণভাবে বলে—পারি, তবে তাড়াতাড়ি যোগাড় করতে হলে নানা জায়গা থেকে দুশো-একশো করে ধার করা ছাড়া উপায় নেই।

করবী—তাহলে ধার করুন। ধার একদিন শোধ করতেও পারবেন। কিন্তু দেরি করলে..।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় করবী। আবার ছলছল করে দুই চোখ।

রমেশ বলে—কি হলো?

করবী—সত্যিই কি ভালোবাসো আমাকে?

রমেশ—হ্যাঁ করবী।

করবী—তবে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর; যদি না কর তবে বোধহয় আমাকে মরতেই হবে।

বিচলিত হয় রমেশ—এ কি কথা বলছো?

করবী হ্যাঁ, বদ্যিবাটির এক দোজবরে বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিয়ের খরচের জন্য তিন হাজার টাকা বাবাকে দিতে চেয়েছেন বদ্যিবাটির ভদ্রলোক।

রমেশ তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে ধরে। চোখ আর মুখ যেন হঠাৎ

এক প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে ওঠে। করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রমেশ বলে—কখনো হতে দেব না করবী। বিজয়বাবুকে তুমি বারণ করে দাও, যেন বুড়োর টাকা স্পর্শ না করেন।

সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে রমেশ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে আমি কথা দিচ্ছি করবী। বিয়ের সব খরচ আমার। দশ দিনের মধ্যে তোমাকে বিয়ে করে আমার কাছে নিয়ে যাব।

চলে যায় রমেশ।

ছোট একটি উৎসব হয়ে গেল রানাঘাটের সেই পাড়ার সেই ক্ষুদ্র গৃহের আঙ্গিনায়। পাড়ার লোক তো এই ক'দিনের মধ্যে মুগ্ধ হয়েই গিয়েছিল বিজয়বাবু নামে নবাগন্তুক এই গবীর ভদ্রলোক আর করবী নামে তাঁর শান্ত ও সুন্দর মেয়েটির ব্যবহারে। খাওয়া-দাওয়ার সামান্য একটু ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন বিজয়বাবু, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকেরা বাধা দিয়েছেন বিজয়বাবুকে।—মিথ্যে এসব বাজে খরচ করার কোন দরকার নেই মশাই। আপনার মতো অবস্থার লোকের পক্ষে এসব খরচ একেবারে একটা অন্যায় খরচ।

শুধু দেড়হাজার টাকার অলঙ্কারে মেয়েকে সাজিয়ে দিয়ে এবং অন্য খরচের কাজ নমো নমো করে সেরে দিয়ে শুভকাজ সম্পুর্ণ করলেন বিজয়বাবু। পাড়ার লোক জানলো, ভদ্রলোকের জীবনের যা-কিছু পুঁজি জমানো ছিল সব খরচ করে মেয়েকে সোনার অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছেন। এতটা করবার কোন দরকার ছিল না, কারণ পাত্রপক্ষ থেকে এতটা দাবি ছিল না। যাই হোক, একটি মাত্র দায় তাই সেই দায় পালন করতে গিয়ে ভদ্রলোক নিজেকে ভিখিরী করে দিলেন। মেয়েকে বড়ো ভালোবাসেন বিজয়বাবু।

রমেশের দেওয়া টাকা দিয়ে কেনা অলঙ্কারে সেজে নিয়ে রমেশের সঙ্গে চললো রমেশের পরিণীতা করবী। মেয়ে বিদায়ের সময় সেই রকমই করুণ হয়ে জেগে উঠলো সেই দৃশ্য একবার তারেকশ্বর, একবার বসিরহাট আর একবার ভাটপাড়ার এক-একটি পাড়ার চোখ করুণ করে দিয়েছে। ডুকরে কেঁদে ওঠেন বিজয়বাবু এবং ফুঁপিয়ে কাঁদে করবী।

রানাঘাটের একটি পাড়ার অনেক মানুষের চোখ করুণ করে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল করবী। আর সেইদিনই সন্ধ্যায় কলকাতার বাগবাজারের এক গলিতে একটি এক-ঘরে বাসার ভিতরে এসে দাঁড়ালো রমেশের নববিবাহিত বধূ।

তার দুদিন পরেই বাগবাজারের গলিতে ক্ষুদ্র সেই বাসার বক্ষে উৎসবের বাতি জ্বলে সারারাত। বউভাত আর ফুলশয্যা। উৎসবে সমারোহ নেই, কিন্তু হাসি আর

কলরবের সমারোহ আছে। রমেশের আপন বলতে এই পৃথিবীতে যারা আছে, তাদেরই কয়েকজন এসে রমেশের জীবনের এই উৎসবের সকল কাজের ভার নিয়েছে। এসেছেন এক মাসী এবং তাঁর তিনি মেয়ে। এলেন এক খুড়ো তাঁর দশটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে। রমেশের দুই বন্ধুর মা আর এক বন্ধুর স্ত্রীও এলেন। বউ দেখে খুশি হলেন সবাই। একটি রাত ও একটি সকাল-বেলাকে ব্যস্ততায়, মুখরতায় এবং হাসাহাসি ও হাঁকডাকে ভরে দিয়ে যখন চলে গেলেন সকলে, তখন বিকালের রোদ ঘরের জানালায় এসে লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে নববধূ এতক্ষণে জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে; মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়ে তার বড়ো বড়ো কাজল-পরা চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকে তাকায়, আর রমেশ তাকিয়ে থাকে তার করবীর মুখের দিকে।

রমেশ বলে—আমি পটের ওপর তোমার একটা ছবি আঁকবো করবী। দুদিনেই শেষ করে ফেলবো, তারপর স্বচক্ষে দেখে বুঝবে, আমার এই হাতে আমি কি করতে পারি।

করবী উৎসুক ভাবে তাকায়।—বুঝতে পারছি না, কি বলছো।

রমেশ—তোমার চোখ দুটিকে একেবারে জীবন্ত করে তুলবো ছবিতে।

করবী—করে রাখ, আমি ফিরে এসে দেখবো।

রমেশ আশ্চর্য হয়—কোথায় যাবে তুমি?

করবী—বাবার কাছে।

রমেশ—তা তো যাবেই, কিন্তু আজ-কালের মধ্যে তা যাচ্ছ না।

করবী—যেতে চাই না, তবে বাবা যদি এসে পড়েন, না যেয়ে পারবো না।

রমেশ—তোমার বাবার আসবার কথা আছে নাকি?

করবী—আমার মনে হয়, কাল সকালেই এসে পড়বেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে করবী—। তারপর হঠাৎ যেন একটা দুঃসহ বেদনায় ছটফট করে ওঠে।—উঃ বাবার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভালো লাগে না। বোধহয় এখনো কাঁদছেন।

সান্ত্বনার সুরে রমেশ বলে—আশ্চর্য নয়, তুমিই তো তাঁর একমাত্র সন্তান। তোমার বাবার কষ্ট আমি বুঝতে পারি করবী। কিন্তু...দেখা যাক্, আসুন তো তোমার বাবা, তারপর আমিই তাঁকে বুঝিয়ে বলবো।

করবী—কি বলবে তুমি?

রমেশ—মাস খানেক পরে তুমি যাবে, তার আগে যেন তোমাকে নিয়ে যাবার পীড়াপীড়ি না করেন।

করবী—বাবা বোধহয় রাজি হবেন না। আর আমিও বলি, তুমি আপত্তি করো না, বাবার মনে দুঃখু দিও না।

রমেশ বিষণ্নভাবে হাসে—কিন্তু আমার মনের দুঃখ কি উনি বুঝবেন না?

করবী—তোমার মনের আবার কিসের দুঃখ?

রমেশ—তোমার বাবা যদি কাল আসেন আর তুমি যদি তাঁর সঙ্গে চলে যাও তবে আমার...আমার যে বড্ড খারাপ লাগবে করবী।

রমেশের মুখের দিকে কাজল-পরা বড়ো বড়ো চোখের দৃষ্টি একটু তীব্র করে দেখতে থাকে করবী।

রমেশ বলে—যদি তুমি যাও, তবে আমিও তো তোমার সঙ্গে যাব। রানাঘাটে ক'দিন থেকে তারপর আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবো।

করবী বলে—ছিঃ, তোমার একটুও মান-সম্মান জ্ঞান নেই? যেতে না বললে শ্বশুর-বাড়িতে কখনো যায় মানুষ?

রমেশ—তোমার বাবা কি আমাকেও সঙ্গে যেতে বলবেন না?

করবী—না।

রমেশ—কেন?

করবী আমতা-আমতা করে।—কে জানে কেন?

রমেশ—কিন্তু, তুমিই তো বাবাকে বলতে পারে।

করবী—কী বলবো?

রমেশ—আমাকেও যেন সঙ্গে যেতে বলেন।

করবী—ছিঃ, আমাকে কি একেবারে একটা বেহায়া মনে করেছ? মেয়ে হয়ে বাপকে ও-কথা বলা যায়? কি বিচ্ছিরি লজ্জার কথা।

চুপ করে থাকে রমেশ। করবী বলে—তুমি গম্ভীর হলে কেন? কোন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

রমেশ—সন্দেহ? সন্দেহ আবার কিসের?

করবী—বোধহয় সন্দেহ হচ্ছে যে তোমার জন্য আমার মনে কোন টান নেই।

রমেশ—আমার জন্য তোমার মনের কোন টান নেই, এ-সন্দেহ হবার আগে আমি মরেই যাব।

করবীর চোখ দুটো হঠাৎ কেঁপে ওঠে, বোধহয় ওর বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা ভয় ছটফট করে উঠেছে। আস্তে আস্তে, যেন একটু হাঁসফাঁস করে বলতে থাকে করবী—তুমি মরবে কেন? তার চেয়ে বরং আমিই মরে যাব, আর তুমি এই ঘরে নতুন বউ নিয়ে একদিন আমার কথা গল্প করবে আর হাসবে।

রমেশ—এ রকম ভয়ানক কথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই করবী।

করবী হাসে—ভাগ্যিমানের বউ মরে।

রমেশ—মিথ্যে কথা।

রমেশও হাসতে-হাসতে কাছে এগিয়ে এসে করবীর হাতে ধরে—এ রকম বউ কারও হয় না।

চমকে ওঠে করবী। রমেশ হাসতে-হাসতে বলে—এরকম বউ যদি মরে যায়, তবে সে অভাগা স্বামীরও বেঁচে থেকে লাভ নেই।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকায় করবী। তারপর উঠে গিয়ে খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। যেন রমেশের মুখের দিকে তাকাতে চায় না, আর রমেশের ঐ চোখের কাছে নিজের মুখটাকেও আর দেখাতে চায় না করবী।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। করবী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে—তুমি কি আজ খাবে না, আর আমাকেও খেতে দেবে না বলে ঠিক করেছ?

রমেশ—তার মানে?

করবী—বাইরে থেকে খাবার-টাবার কিনে আনবার গরজ দেখছি না, অথচ আমাকে রান্না-বান্না করতেও বলছো না।

উত্তর দিতে গিয়ে রমেশের গলার স্বরে একটা আনন্দ যেন লাফ দিয়ে ওঠে—তুমি রাঁধবে?

করবী—হ্যাঁ, এই একটা রাত্রি তো। একটু খেটে যাই তোমার ঘরে।

হাসতে থাকে করবী। রমেশও হেসে হেসে বলে এতক্ষণ ধরে এই কথাটা বলবার জন্য আমার মনটা ছটফট করছিল।

করবী—কি কথা?

রমেশ—এতদিন ধরে হোটেলের রান্না খেয়ে আসছি।, কিন্তু আজ তুমি ঘরে থাকতে হোটেলের থেকে খাবার আনতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

করবী—আমার হাতের রান্না খাবার জন্য এতই লোভ হয়েছে তোমার?

রমেশ—হয়েছে বৈকি।

করবী যেন অন্যমনস্কের মতো অন্যদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেলে—কিন্তু এ-রকম লোভ না করলেই ভালো করতে।

রমেশ—চিরকাল এই লোভ করবো।

তারপর আর দেরি হয় না। বাগবাজারের গলিতে ক্ষুদ্র এক ঘরের ভিতর থেকে কয়লা-পোড়া ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যায় বাতাসে। এক নববধূর হাতে ঐ ঘরের ভিতরে নতুন এক গেরস্থালীর আনন্দ খুট-খাট আর টুং-টাং শব্দ করে বাজতে থাকে থালা-বাসনের আর হাতা-খুন্তি ও হাঁড়ি-কুড়ির গায়ে গায়ে। নতুন শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ায়, হলুদ মাখা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের উপর থেকে এলো-মেলো ও ফুর্‌ফুরে চুলের উপদ্রব ঠেলে সিঁথির দুপাশে সরিয়ে দেয়, কাজ করে এক নতুন গৃহিণী।

রান্না শেষ হয়ে গেল। ঘরের মেঝেতে আসন পাতে করবী। খেতে বসে রমেশ।

আসনের উপর বসে করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রমেশ। কি যেন বলতে চায় রমেশ। কি-কথা যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করছে রমেশের মনের মধ্যে।

করবী বলে—খেতে বসে আবার এত গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

রমেশ বলে—একটি কথা বলবো?

করবী—বল।

রমেশ—একা খেতে ইচ্ছে করছে না।

করবী—তার মানে?

রমেশ—তুমিও এস এক-থালাতে দুজনে এক সঙ্গে খাই। আবার চমকে ওঠে করবী, কিন্তু কোন কথা বলতে না পেয়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেশই উঠে দাঁড়ায়। হেসে-হেসে অথচ বেশ শক্ত করে করবীর হাত ধরে করবীকে আসনের কাছে বসিয়ে দিয়ে রমেশ বলে—এরপর তো কাজের তাড়ায় কত সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার সঙ্গে বসে এক থালাতে এভাবে খাওয়ার আনন্দ জীবেন আর ক'দিন পাব কে জানে?

খেতে বসে করবী। রমেশ ও করবী এক সঙ্গে থালার উপর হাত চালিয়ে গরম ভাতের ছোট একটি স্তবক ভাঙে। যেন জীবনের নতুন একটা ব্রত খেলছে রমেশ ও তার ভালোবেসে বিয়ে-করা সঙ্গিনী।

খেতে-খেতে কেমন যেন কান্না-ধরা গলায় প্রশ্ন করে করবী তোমাকে খুব খাটতে হয় বুঝি?

রমেশ—নিশ্চয়। কাজ তো কাউকে দয়ামায়া করে না। জ্বরগায়ে কতদিন কাজ করতে ছুটেছি।

করবী—এত খাটতে হয় কেন?

রমেশ—পেটের জন্য।

করবী—কত রোজগার কর?

রমেশ—কোন মাসে পঞ্চাশ, কোন মাসে একশো, কোন মাসে কিছুই নয়।

করবী—তার উপর আমি এক নতুন দায় জুটেছি, এবার তাহলে তুমি খেটে-খেটে পাগল হয়ে যাবে বোধহয়।

রমেশ—মোটেই না, এবার থেকে মনের সুখে আরও বেশি খাটতে পারবো।

করবী—তুমি অনেক টাকা ধারও তো করেছ?

রমেশ হেসে-হেসে সেই ধারের ভার যেন তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চায়। দুটি বছর জোর খেটে সে ধার শোধ করে দেব। তারজন্য কোন পরোয়া করি না।

করবীর মাথটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে। হাত থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে করবী। রমেশ প্রশ্ন করে।—কি হলো, তুমি খাচ্ছ না যে?

করবীর স্তব্ধ হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকে রমেশ। তারপরে অদ্ভুত এক ব্যাপার

দেখে আর্তনাদ করে ওঠে।—এ কি করবী?

টপ্ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়েছে করবীর হেঁট মাথার ছায়ায় লুকানো দুটি চোখ থেকে, করবীরই হাতের উপর।

হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়ায় করবী। কোমরে জড়ানো আঁচল আলগা করে নিয়ে চোখ মোছে। তারপরেই বলে—শোন।

রমেশ—বল।

করবী—তুমি বাঁচতে চাও?

রমেশ—এ-কথার মানে কি করবী?

করবী—যদি বাঁচতে চাও তবে এখুনি পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দাও।

রমেশের চোখ থরথর করে কাঁপে—এ-কথারই বা মানে কি করবী?

করবী—আমি তোমাকে ঠকাতে এসেছি। আমি তোমার স্ব-জাত নই, আমি করবী নই, আমি কুমারী নই।...আমি হলাম...।

চেঁচিয়ে ওঠে করবী।—আমি এক ভয়ঙ্কর বাপের ভয়ঙ্কর মেয়ে। আমি তোমার ঘর করতে তোমার কাছে আসি নি, পালিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।

যেন থিয়েটারের একটা মেয়ে, মিথ্যে একটা ঢং ধরেছে। মজা করার জন্য আর ঠাট্টা করে মিছামিছি রমেশকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে। রাজকুমারীর সাজ সেজে এক মায়াবিনী ডাকিনী একটা রাজাকে ঠিক এই রকমই ঢং ধরে বেহায়ার মতো কতগুলি ভয়ঙ্কর কথা বলে পালিয়ে গেল, কি-যেন সেই হতভাগা রাজাটার নামটা মনে করতে পারে না রমেশ, থিয়েটারের সেই নাটকটার নামও মনে পড়ে না।

তবু ভয় পায় রমেশ। চুপ করে যেন মৃত্যুর বার্তা শুনছে রমেশ করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে রমেশ, সত্যই এই মুখ কি এক ভয়ঙ্কর ঠগিনীর মুখ হতে পারে।

করবী বলে—আমি জানি, তুমি পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারবে না। তুমি এত বোকা আর এত দুর্বল।

গায়ের সব গহনা এক-এক করে খুলে মেঝের উপর রাখে করবী।

—এই নাও, তোমার অন্তত দেড় হাজার টাকা বাঁচলো। এইবার আমাকে চুপচাপ চলে যেতে দাও।

রমেশ—কোথায় যাবে তুমি?

উত্তর দেয় না করবী।

রমেশ কঠোর-স্বরে চিৎকার করে।—ভয়ঙ্কর বাপের কাছেই ফিরে যেতে চাও?

উত্তর দেয় না করবী।

রমেশ প্রশ্ন করে—আমার কথার উত্তর দাও করবী।

চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে করবী—তুমি বলো, তুমি আমাকে যেতে দিতে চাও না।

শান্ত হয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে রমেশ। তারপর ছলছল চোখ নিয়ে করবীর হাত ধরে। যেতে দিতে ইচ্ছে করে না।

করবী—তবে শোন।

রমেশ—বল।

করবী—আজ এখুনি দুজনে এখান থেকে সরে পড়ি।

রমেশ—কোথায় যাবে?

করবী—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আর যেখানে রাখবে।

আর দেরি করে না রমেশ। সেই রাত্রেই শূন্য হয়ে গেল বাগবাজারের গলির ক্ষুদ্র একটি বাসা। ঠগের মেয়ে ঠগিনী জীবনের শেষবারের মতো পৃথিবীর একটি পাড়াকে শুধু ভাবিয়ে দিয়ে সরে পড়লো তার স্বামীর সঙ্গে।

ঠকিয়ে গেল শুধু একজনকে। রানাঘাট থেকে এক বিজয়বাবু এসে পরদিন সকালে যখন বাগবাজারের গলিতে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখে অবাক হয়ে গেলেন, সেই ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। নিরেট কঠিন ও নিষ্ঠুর একটা তালা। দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলেন বিজয়বাবু ঘরের ভিতরটা শূন্য। কি ভয়ানক একটা শূন্যতা!

কিন্তু বেশিক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় নি। পুলিশ এসে হাত চেপে ধরতেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো বিজয়বাবু নামে লোকটা।

ইস্, মেয়ে হয়ে বাপকে কি এমন করে ঠকাতে হয় রে ঠগিনী!

গল্প সংগ্রহ, ১৯৭০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)
জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে। মিতভাষী মৃদুভাষী নরেন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসও, এক অর্থে, তাঁর সুমিতভাষণ। মধ্যবিত্ত-জীবনের নিপুণ রূপকার। দুর্জ্ঞেয় মানবমনের রহস্য উন্মোচনে ও হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষণে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনী-বিন্যাসে ও চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর অনায়াস নৈপুণ্য সহজেই চোখে পড়ে।

একটি প্রেমের গল্প

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রভাতবাবু বললেন, 'লিখছেন? তবে থাক। এখন আর ডিস্টার্ব করব না।'

আমি কাগজ-কলম সরিয়ে রেখে আমার শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, 'আসুন আসুন। ভিতরে আসুন।'

প্রভাতবাবু একটু দ্বিধান্বিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনি লিখছিলেন যে।'

বললাম, 'সব লেখাই কি লেখা? দু-একখানা চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছিলাম আসুন।'

আমন্ত্রণ পেয়ে প্রভাতবাবু এবার ঘরে ঢুকলেন। সোফায় বসে হাতের ছাতাটিকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিলেন। যাওয়ার সময় পাছে নিতে ভুল হয়ে যায় সেই জন্যেই বোধ হয়। প্রিয়বস্তুটিকে চোখের আড়াল করতে চান না।

তিনি আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উচ্চাসন থেকে নেমে তাঁর সামনের নিচু সোফাটিতে বসলাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'খুব চিঠিপত্র লেখেন বুঝি? এক সময় আমারও চিঠি লেখার নেশা ছিল। রাত জেগে জেগে বন্ধুদের চিঠি লিখতাম। এদিক থেকে আমাকে a man of letters বলতে পারেন।'

আমি তাঁর নিজের দেওয়া খেতাবটি স্মিতমুখে স্বীকার করে নিয়ে বললাম, 'চা চলবে?'

চায়ের কথায় প্রভাতবাবু প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'তা চলতে পারে। কিন্তু এই দুপুর বেলায় চা চেয়ে আপনার আশ্রমপীড়া ঘটাব না তো? গার্হস্থ্যাশ্রম। নিজে তো আর গৃহী নই। তাই ভয়ে ভয়ে চলি পাছে অপরের গৃহিণীর শান্তিভঙ্গ করি।'

আমি অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দু কাপ চায়ের ফরমাস করে আবার নিজের জায়গায় এসে বসলাম।

প্রভাতবাবু নামেই প্রভাত। তাঁর বেড়াবার আর গল্প করবার সময় দিনদুপুর আর রাতদুপুর। বয়সে চুয়াত্তর হয়েছে। শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু মনকে জীর্ণ হতে দেন নি। বাসে ট্রামে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেন। খুব সামাজিক মানুষ, পছন্দ মতো

সভা-সমিতিতে গিয়ে হাজির হন। পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজখবর নেন। আবার নতুন বন্ধু আহরণেরও বিরাম নেই। ছেলের বয়সী নাতির বয়সী সকলেরই তিনি সমবয়সী। ও'র নিজের অবশ্য ছেলেও নেই নাতিও নেই। প্রভাতবাবু অকৃতদার।

একটু এ কথা সে কথার পর আমি বললাম, 'ভালো কথা প্রভাতবাবু। পরশু রাত্রে তো আপনি এলেন না আমার দু-একজন বন্ধুকে বলে রেখেছিলাম। তারা এসেছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম।'

প্রভাতবাবু একটু জিভ কেটে লজ্জিতভাবে বললেন, 'ভুলে গিয়েছিলাম কল্যাণবাবু, একবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, পরশু রাত্রে আমি ছিলাম আলিপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে এক অ্যানিভারসারি আমরা উদ্‌যাপন করলাম।'

বললাম, 'আপনার বন্ধুর বার্থ অ্যানিভারসারি বুঝি?'

প্রভাতবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, ওসব কিছু নয়। জন্মদিন-টন্মদিন সে কোন দিন পালন করে না। এর আগে পূজাপার্বণ কোন অনুষ্ঠানই তাকে পালন করতে দেখি নি। না সামাজিকভাবে না ব্যক্তিগতভাবে। সন্ধ্যা-আহ্নিক, জপ-তপ, আসন-টাসন কিচ্ছু না। বরং আমিই তাকে মাঝে মাঝে বলেছি, শৈলেন even the devil has his rituals তুই কি ডেভিলেরও বাড়া হলি? তারপর কিছুকাল ধরে দেখছি একটি অনুষ্ঠান পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সে পালন করে। বছরে একটি মাত্র দিন। সেই অনুষ্ঠানে একটি মাত্র ব্যক্তিকে সে নিমন্ত্রণ করে।'

বললাম, 'সেই ব্যক্তিটি কি আপনি?'

প্রভাতবাবু স্মিত মুখে সে কথা স্বীকার করলেন।

চা এসে গেল। প্রভাতবাবু চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়েই পকেট থেকে প্যাকেট বার করে একটি সিগারেট ধরালেন। সস্তা সিগারেটই খান প্রভাতবাবু।

আমি খাই না জেনেও সকৌতুকে একটি অফার করে বললেন, 'চলবে না কি?'

আমার মাথা নাড়া দেখে হেসে বললেন, 'বেশ আছেন। আমি যে কবে সিগারেট খেতে শুরু করেছি মনেই নেই। বোধ হয় স্তন্যপান ছেড়ে দিয়েই ধূমপান ধরেছি।'

আমি বললাম, 'কিসের অনুষ্ঠানের কথা বলছিলেন।'

প্রভাতবাবু বললেন, 'দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। গল্প না লিখলেও লেখার রীতিনীতি তো অল্পস্বল্প জানি। বিয়ে না করলেও বরযাত্রী যেমন হাজার বার গিয়েছি। সাসপেন্স নষ্ট করবার মতো আহাম্মক বলে কি আমাকে মনে হয়? কথার মাথা যদি আগেই ভেঙে দিই আপনি আমার গল্পে কান পাতবেন কেন?'

'গল্প অবশ্য আমার নয়, আমার সেই বন্ধুর। আপনাকে কিছু বলতে ভয় হয়। আপনার পেটে তো থাকে না। গোপনে যা কিছু বলি সঙ্গোপনে তা দশ জনের কানে তুলে দিয়ে তবে আপনার নিবৃত্তি। কিন্তু এ গল্প লিখে আপনার সুবিধে হবে না কল্যাণবাবু। এ গল্পের আপনি শ্রোতা পাবেন না। বড্ড পুরোন আমলের গল্প। শুধু

পুরোন দিন নয় পুরোন পরিবেশ নয় old values-এরও গল্প। পুরোন দিন। কিন্তু আমাদের কাছে তা নতুনই ছিল। আমাদের তখন যৌবনকাল। কতকাল আগে? ধরুন প্রায় আধখানা শতাব্দী। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন সেদিনের কথা। মাঝে মাঝে। আবার অন্য সময় মনে হত কত সুদূর সেই দিনগুলি। Deep past, নিজের অতীতকে মনে হয় যেন ঐতিহাসিক কি প্রাগৈতিহাসিক আমল।

'সেই আমলে পশ্চিম সীমান্তের এক শহরে কলকাতা থেকে বদলি হলাম। আমি ঘরকুনো নই। তবু যেতে মন সরছিল না। কলকাতায় প্রচুর বন্ধু-বান্ধব। অফিসের সময়টুকু ছাড়া আড্ডা দিয়ে দিন কাটে, রাত ভোর হয়। সে আড্ডায় সাহিত্য আছে, সঙ্গীত আছে, থিয়েটার আছে। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেখানে চাকরি ছাড়া আর কী থাকবে? সে চাকরিও আবার কী ধরনের শুনুন। সেনাবাহিনীর খাইখরচা পোষাক-আষাকে কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় বসে বসে তার কড়া-ক্রান্তি মেলানো। আমার যা জীবন তাতে ওই হিসেবের কাজে আমার মন ছিল না। তবু চাকরি হল চাকরি। স্বামীকে ভালো না বাসলেও সতী নারীর তার ঘর করা ছাড়া উপায় কি।

সেই শহরে আমি একটা মাঝারি ধরনের মেসে গিয়ে আস্তানা গাড়লাম। যতটা নির্বান্ধব নিজেকে ভেবেছিলাম দেখলাম তা হই নি। আমার মেসের ঘরে ছোটখাট বেশ একটি আড্ডা জমে উঠেছে। গান গল্প হাসি ঠাট্টা তাস পাশা সবই চলে। যাদের অন্যরকমের নেশা আছে তারাও তার ব্যবস্থা করে নেয়। সেই আড্ডায় আমাদের শৈলেন সেনও আসতে শুরু করল। শৈলেন আমার কলীগ। শুধু একই সেকশনে আমরা কাজ করি। শৈলেন আমার মতো নয়। মন দিয়ে কাজকর্ম করে। বেশ গুণবান ছেলে। কিন্তু গুণের চেয়েও বেশি চোখে পড়ে ওর রূপ। আমার বন্ধু হলে কি হবে আমার মতো কালো-কুচ্ছিত নয়। মাথায় আমার চেয়ে ইঞ্চিখানেক কি ইঞ্চি দেড়েক খাটো। আমি তো প্রায় ছ-ফুট। শৈলেন অত লম্বা নয়।

কিন্তু তার কোন দিকে তার কোন ঘাটতি নেই। টুকটুকে রঙ, টানা নাক চোখ, মাথা ভরতি কালো কুচকুচে চুল। সুন্দর গড়ন। শৈলেন অবশ্য স্পোর্টসম্যান কি জিমন্যাস্ট ছিল না। তবু ওর রূপ মেয়েলি রূপ নয়, পুরুষেরই রূপ। সেই পৌরুষ ওর গাম্ভীর্যে ধৈর্যে স্থিরতায় ফুটে উঠত। যতদূর মনে হয় আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব অসবর্ণ বন্ধুত্ব। ওর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার মধ্যে নেই। আবার আমার মধ্যেও হয় তো এমন কিছু ছিল যার অভাব ও নিজে নিজে মনে মনে অনুভব করত। আমাদের প্রথম আকর্ষণ সেই বিসদৃশতার আকর্ষণ।

শৈলেন আমাদের আড্ডায় চুপচাপ এসে বসে থাকত। কখনো আমার র‍্যাক থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পড়ত, কখনো বা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো আর পাঁচজনের কাণ্ডকারখানা। লাজুক মুখচোরা স্বভাব ছিল খুব। এখন আর অবশ্য তেমন নেই।

সবাই চলে গেলে যদি সময় থাকত শৈলেন আমার কাছে এসে বসত। তখন সমবয়সী সমরুচি দুই যুবক বন্ধুর মধ্যে যে সব কথা হয় আমাদের তাই হত।

সেদিন শৈলেন নির্জন স্থান কাল বেছে আমাকে বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বেশ তো বল।'

প্রস্তাবনাটুকু করে শৈলেন চুপ করে রইল।

আমি বললাম, 'কী হল? কথা থাকার কি এই নমুনা!'

শৈলেন বলল, 'না থাক গে।'

বললাম, 'থাকবে কেন। তুমি যা বলতে পারছ না, আমি বলে দিচ্ছি।' তারপর ওর গলার অনুকরণ করে বললেন, 'প্রভাত আমি ভাই প্রেমে পড়েছি। পড়েছি মানে পড়ে একবারে অতলে তলিয়ে গেছি। এখন তুমি আমাকে উদ্ধার কর।'

শৈলেন বলল, 'কি করে বুঝলে ও কথা আমারই কথা।'

'বুঝতে কি আর বাকি থাকে? তোমাদের বাড়িতে গিয়েই সেদিন আমি টের পেয়েছি।

শৈলেন চুপ করে রইল।

সেই শহরে আমিই মেসের বাসিন্দা ছিলাম, শৈলেন তা ছিল না। সেখানে ওর বাবা বিরাট এক সরকারী কোয়ার্টারে বাস করতেন। বাবা মা ভাই বোন-টোন নিয়ে এক বৃহৎ পরিবার।

শৈলেন অফিস ছুটির পর আমাকে মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেত। ওর মা আমাকে ছেলের মতো যত্ন করতেন। নিজের হাতে খাবার তৈরি করে খেতে দিতেন। ওর ভাইবোনগুলিও আমাকে খুব ভালোবাসত। আপনাকে বলতে বাধা নেই সেকালের আরো কয়েকটি প্রবাসী বাঙালী বাড়ির দরজা আমার কাছে সহজেই খুলে গিয়েছিল। তবু শৈলেনদের বাড়িই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো।

ওদের বাড়িতেই আমি মাধুরীকে প্রথম দেখি। মেয়েটির রূপলাবণ্য দেখে আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি শৈলেনেরই বোন। একই রকমের মাজা রং। মেয়ে বলে আরো বেশি ফর্সা মনে হয়। মুখশ্রীও ভারি সুন্দর। আমার নিজের অবশ্য একটু লম্বাটে ছাঁচই পছন্দ। কিন্তু বাটার মতো মুখও যে একটি ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো দেখতে হয় তা যেন আমি সেই প্রথম দেখলাম। মাথায় এক রাশ চুল। যেমন ঘন তেমনি কালো আর লম্বা। অমন রেশমের মতো সুন্দর চুল আমি আর দেখি নি। মাধুরী যে শৈলেনের বোন না, শৈলেনের মাকে মাসীমা মাসীমা বলে ডাকলেও, ও যে কোন মাসীর মেয়ে নয় খানিক বাদেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। মাধুরীরা জাতে বামুন, পদবীতে মুখুজ্যে। শৈলেনরা যে মহল্লায় যে রাস্তায় থাকে মাধুরীদের বাড়িও সেইখানে। কয়েক গজের মাত্র ব্যবধান। দুই পরিবারের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা, যাওয়া-আসা,

খাওয়া-দাওয়া সব চলে। এ বাড়ির মা ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের মাসীমা। ও বাড়ির মা এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের মাসীমণি।

শৈলেন বলল, 'তুমি কী করে বুঝলে?

আমি বললাম, 'বুঝলাম তোমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাবার ভঙ্গি দেখে। তোমার টেবিলের ওপর মাধুরীর নাম লেখা বইগুলি দেখে। তার গানের খাতায় তোমার নিজের হাতের নাম লেখা দেখে।'

শৈলেন ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেলল। বলল, 'ওইটুকু সময়ের মধ্যে তুমি এত দেখে ফেললে। প্রভু, তোমার গোয়েন্দা বিভাগে কাজ নেওয়া উচিত ছিল।'

শৈলেন আদর করে আমাকে প্রভু বলে ডাকত। কখনো বা বলত গুরুদেব। আমি ছিলাম ওর friend, philosopher guide.

ধরা পড়ে গিয়ে শৈলেন সব কথাই আমাকে বলল। ও তো বলবার জন্যে এসেছিল। ওদের সেই কৈশোরের ভালোবাসার কথা, সবাইকে লুকিয়ে মেলামেশার কথা, প্রথম তারুণ্যের, ভরা যৌবনের একমাত্র নেশার কথা শৈলেন আমাকে সবই খুলে বলল। এক সময় ছিল যখন ওরা লুকোতেই ভালোবাসত। বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে লুকোত, নিজেদের কাছ থেকেও লুকোত। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। এখন ওরা চায় ওদের ভালোবাসাকে দুই বাড়ির বাসিন্দারাই স্বীকার করে নিক। যে মাধুরী ওদের বাড়িতে মেয়ের মতোই আদর-যত্ন পায় সে এবার বউ হয়ে ঘর আলো করে তুলুক। যে শৈলেন মাধুরীদের বাড়িতে সৎ আদর্শবান ছেলের সম্মান পেয়ে থাকে সে আরো একটি মধুর পদগৌরব লাভ করুক। জামাতৃপদ।

আমি বল্লাম, 'বাধা কিসের?'

শৈলেন বলল, 'বাধা জাতের।'

আমি বললাম, 'ধুত্তোরি তোর জাত। এক কাজ কর না, মাধুরীর বাবা যদি স্বেচ্ছায় সম্প্রদান না করেন, তুমি সুভদ্রা হরণ কর। আমি তোমাদের রথ চালিয়ে নেব। সর্ব ধর্ম পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' শৈলেন বলল, 'না ভাই তা হবার নয়।'

'কেন? মাধুরী কি ভয় পায়?'

শৈলেন বলল, ভয় আছে, দ্বিধা আছে। তা ছাড়া ওর ওই গোঁড়া বদরাগী বাপকে বড় বেশি ভালোবাসে। বাপের অমতে কিছু করবার কথা মাধুরী ভাবতেই পারে না।'

বললাম, 'তাহলে চল ওই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে আমরা বুঝিয়ে শুঝিয়ে রাজি করবই। আমি তোমার উকিল হতে রাজী আছি।'

শৈলেন বলল, 'ওরে বাবা। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ির দরজা আমাদের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার বাবাও কি সেই অপমান সহ্য করবেন? একটি জানালাও ওদের দিকে খোলা রাখবেন না।

ব্যাপারটা জানে সবাই, বোঝেও সবাই। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে উচ্চারণ করে না। তাহলে এতদিনের পুরোন বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।'

বললাম, 'তোমার বাবা-মার কি মত?'

শৈলেন বলল, 'তাঁদের মত নেই। এই ভালোবাসার বিয়েতে তাঁদের বড় ভয়। তাঁদের ধারণা এই গন্ধর্ব বিয়ের পর আমরা আলাদা কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধব। বাপ-মা ভাইবোনেদের দেখব না।'

শৈলেন নিজে তো ভীতুই। আমিও যে ওর জন্যে কিছু বীরত্ব দেখাব তাও হতে দিল না। ওর ভয় তাতে সব নষ্ট হয়ে যাবে যেটুকু পাচ্ছে তাও হারাবে। আর কিছু না হোক দিনান্তে দুজনের দেখা তো হচ্ছে, একজন আর একজনের গলা তো শুনতে পাচ্ছে, লুকিয়ে লুকিয়ে অল্প-অল্প আদর-আহ্লাদটুকু তো চলছে সেইটুকুও আর থাকবে না।

আমি হেসে বললাম, 'শৈলেন তুমি তাহলে ওই গল্প নিয়েই থাকো। বড় কোন আশা আর কোরো না।'

তারপর দুই বাড়িতেই গোপনে গোপনে কিছুদিন ঘটক যাতায়াত করতে শুরু করল। মাধুরীরও সম্বন্ধ দেখা চলতে লাগল। শৈলেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাত্রীর খোঁজ খবর নেওয়া চলল। পণযৌতুক সহ সালঙ্কারা কন্যা অনেকেই ওকে সম্প্রদান করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু শৈলেন গররাজী। ফলে ঘটকরাই শুধু আনাগোনা করে। একটি প্রজাপতিও কোন বাড়িতে উড়ে বসে না।

তারপর আমি সিমলায় বদলী হলাম। চলে আসার দিনে মাধুরী ওদের বাগান থেকে বড় একটি রক্তগোলাপের তোড়া আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল। আর পেয়েছিলাম দুটি অমূল্য মুক্তা বিন্দু।

ওর সেই কালো আয়ত সিক্ত দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বলেছিলাম,'মাধু অমন করছ কেন?'

মাধুরী বলেছিল, 'প্রভাতদা, আমাদের তো আর কোন বন্ধু নেই। আমাদের ভুলে যেয়ো না।'

আমি আমার বন্ধুর প্রভু, প্রতিভু। তার চেয়ে বেশি কিছু নই। আমি সব সময় auxiliary verb. কখনো মূল ক্রিয়াপদ হই নি, কি হতে পারি নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় না কিছু কম পেয়েছি। শৈলেনকে বললে, কি হবে। আমিও তো অল্প নিয়েই আছি। আমিও তো অল্প অল্প ক্ষুদ-কুঁড়ো দিয়েই জীবনভর ভিক্ষের থলি ভরে তুলেছি।

প্রভাতবাবু ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'ওরে বাবা। এবার সংক্ষেপে সারি। নইলে আপনি গিন্নীর তাড়া খাবেন, আমার এক কাপ চায়ের বরাদ্দও বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সিমলায় বদলি হবার কিছুদিন বাদে শৈলেন গেল পাটনায়। সরকার ভাগ্যনিয়ন্তা। আমাদের দুই বন্ধুকে মাঝে মাঝে অনেক দূরে দূরে ঠেলে দেন। আবার

কখনো-কখনো আমরা একই স্টেশনে ছ মাস কি এক বছরের জন্যে মুখোমুখি দাঁড়াই, একই টেবিলে মুখোমুখি বসে কাজ করি গল্প করি। দেখে আনন্দ হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চেহারা বদলাচ্ছে, আমরা জীবনের এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে বদলি হচ্ছি। কিন্তু একটি জায়গায় আমাদের কোন অদল-বদল হয় নি। সে ক্ষেত্রটি বন্ধুত্বের। আমরা ছ মাসের মধ্যে আপনি থেকে তুমিতে নেমেছিলাম, তুমি থেকে তুইতে নামতেও বছর দুয়েকের বেশি দেরি হয় নি। দূরে থাকলেও আমার একজন আর একজনের সব খবরই রাখি। চিঠিপত্রই বেশি চলে। দেখা-সাক্ষাৎ কখনো-সখনো। মাধুরীর মা মারা গেছেন। দুই ভাই বড় হয়েছে। বাপ আরো বুড়ো। সেই জাঁদরেল বাপ এখন একেবারে অসহায় মেয়ের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। একাধারে মাধুরী যেন জায়া জননী দুহিতা। শৈলেনের বাবা মা দুই-ই মারা গেছেন। ভাইবোনেরা তাকে জ্ঞান করে 'ত্বমেব পিতা চ মাতা ত্বমেব'। শৈলেন তাদের বিয়ে-থা দিয়েছে। তারা যে যার চাকরির জায়গায় সংসার পেতেছে। তবু চিরকুমার বড়দাদা সংসারের বটবৃক্ষ। আমি ওকে চিঠিপত্র লিখতাম। মাধুরীর সঙ্গেও চিঠিপত্র চলত।

তারপর আমি আর শৈলেন প্রায় একই সঙ্গে রিটায়ার করি। শৈলেন এক্সটেনশন পেয়েছিল, গোটা কয়েক প্রমোশনও পেয়েছিল। আমি পাই নি। তার বদলে আমি সারা ভারত টো-টো করে ঘুরেছি, শখের রঙ্গমঞ্চে উঠে গালে রং মেখে, মাথায় পরচুলা লাগিয়ে বুড়ো বয়সেও হিরো সেজেছি, মাঝে মাঝে আধা-সাহিত্যিক, আধা-রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে উঠে বসেছি। এখন ধর্মসভায় যাই, আপনি তা নিয়ে মনে মনে হাসেন।

এখন আমার আর শৈলেনের দেখা হয় ডালহৌসিতে পেনসনের টাকাটি আনতে গিয়ে। শৈলেন আর আমি দুজনেই রিটায়ার করার পর থেকে কলকাতায় আছি। ও দক্ষিণে আমি উত্তরে। ঘনঘন দেখা-সাক্ষাৎ আর হয় না আর চিঠিপত্র লেখালেখিও বন্ধ। শৈলেন একবার লিখেছিল, 'তোর হাতের লেখা একেবারে অপাঠ্য হয়ে গেছে। একটুও বুঝতে পারিনে।' তারপর থেকে আমি ওকে রাগ করে চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েছি। এখন শুধু ফোনে কথা বলি। শৈলেন আলিপুরে সুন্দর একটি দোতলা বাড়ি করেছে। আগে ভাইপো-ভাইঝিরা থাকত এখন নাতি-নাতনিরা। কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে। আমাকে বাড়ি ঘর কিছু করতে হয় নি। পৈতৃক বাড়ি আছে। দাদার সঙ্গে আমি তার অংশীদার। কিন্তু নামেই। মনে মনে আমি অনিকেত জানেনই তো। বাড়িতে কতটুকু সময়ই বা থাকি। আজ থেকে বছর বার আগের কথা। পেনসনের টাকাটা গুনে নিচ্ছি কে যে পিছন থেকে খপ করে আমার হাতখানা ধরে ফেলল, 'এই পরমার্থবাদী। অর্থের ওপর অত লোভ কেন রে।'

চেয়ে দেখি শৈলেন। হেসে বললাম, 'বুড়ো বয়সে কামিনী ছাড়া যায় কিন্তু কাঞ্চন ছাড়া যায় না। ফলমূল কিনতেও পয়সা লাগে।'

শৈলেন আমাকে নিয়ে গেল এক চায়ের দোকানে। বলল, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

একটা নিরিবিলি টেবিল বেছে নিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। জরা কারো ধরেছে চুলের মুঠি, ঘুষি মেরেছে কারো বা দাঁতের গোড়ায়। শৈলেনের মাথা একেবারে সাফ আমার দু পাটি দাঁত বাঁধানো।

শৈলেন বেশি কথা না বলে বুক পকেট থেকে একখানা খামের চিঠি বের করে আমাকে দেখাল। বলল, 'পড়ে দেখ।'

খুবই চেনা হাতের লেখা। এখনো অকম্পিত মুক্তার অক্ষর।

বললাম 'এ তো তোর চিঠি।'

শৈলেন ধমক দিয়ে বলল 'আহা পড়ই না। আমার চিঠি যেন তুই কোনদিন পড়িস নি।'

খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা বের করে পড়লাম। কাগজখানা পুরো মাপের কিন্তু চিঠিতে দুটি মাত্র লাইন। 'তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। অবশ্য এসো। ইতি তোমার মাধুরী।'

হেসে বললাম, 'আমি আমার কথাটা amend করে নিচ্ছি। দেখছি, বুড়ো বয়সেও কাউকে কামিনীতেও ছাড়ে না। কোথায় আছে সে?'

শৈলেন বলল, 'ব্যারাকপুরে, ভাইদের কাছে।'

বাবা মার যাবার পর মাধুরীরা যে লক্ষ্ণৌর বাসা তুলে দিয়ে কলকাতার দিকে চলে এসেছে তা জানতাম। কিন্তু ঠিক কোথায় আছে তা জানতাম না।

শৈলেন বলল, 'ভাইরা চাকরি-বাকরি করে। মাধুরীও স্কুলে মাস্টারি নিয়েছিল। শরীর ভেঙে পড়ায় বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। শুনেছি ওর বাবা বেশি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। হাজার তিরিশেক টাকা জোম করে মেয়েকে গছিয়ে দিয়ে গেছেন। ছেলেরাও কিছু কিছু পেয়েছে।'

ইদানীংকার খবর আমি আর রাখতাম না। অনেকদিন চিঠিপত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শৈলেন বলল, 'বহুদিন ধরে অসুখে ভুগছে। চল একবার দেখে আসি। শুনে আসি জরুরী কথাটা কী।'

বললাম, 'তুই একাই যা। আমি গেলে তো কথা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'না, তুইও চল। আজই চল।'

আমি বলেছিলাম, আর একদিন যাওয়া যাবে। কিন্তু শৈলেন আর দেরি করতে রাজী নয়। আবার কবে দেখা হবে কে জানে।

দুজনে দুজনের বাড়িতে দুটি ফোন করে দিয়ে আমরা চললাম। ব্যারাকপুরে। শৈলেন ট্যাক্সি করতে চেয়েছিল। আমি বললাম, 'পেনসনের গোনা টাকা অত বেহিসেবি খরচ করিসনে। চল বাসেই যাই।'

যাওয়ার সময় আমি কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে এক ডজন বেশ টাটকা বড় সাইজের রজনীগন্ধা নিয়ে গেলাম।

শৈলেন ঠাট্টা করে বলল, 'তোর দেখি, এসব শখ খুব আছে।'

স্টেশনের কাছাকাছিই বাড়িটি। দোতলার একটি ফ্ল্যাটে ওরা থাকে।

কড়া নাড়তে একটি বউ এসে দোর খুলে দিল। আমরা নিজেদের পরিচয় দিতে সে আমাদের মাধুরীর ঘরে নিয়ে গেল।

ছোট্ট একখানা খাটের ওপর মাধুরী শুয়ে আছে। ধবধবে বিছানা, পরিপাটি করে পাতা। ঘরখানিও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে মাধুরীর? বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে দেহ। ওর যেন উঠে বসবার শক্তি নেই।

তবু মাধুরীর যেন আমাদের দেখে নতুন শক্তি পেল। 'উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।'

আমার দিকে চেয়ে, একটু হেসে বলল, 'আমি জানতাম, তুমিও আসবে।'

তারপর মাধুরী কি কাণ্ডটা করল শুনুন। ওর দুই ভাইয়ের বউকে ডেকে বলল, 'ও ঘরে লক্ষ্মীর আসনের কাছে একটি সিঁদুরের মুছি আছে। তাতে সিঁদুর গুলে রেখেছি, নিয়ে এসো।'

ছোট বউ নিয়ে এল সিঁদুরের মুছি। মাধুরী তার হাত থেকে সেটি তুলে নিয়ে শৈলেনের হাতে দিয়ে বলল, 'ওই সিঁদুর আমার সিঁথিতে পরিয়ে দাও। আমি আইবুড়ো থেকে মরতে চাইনে।'

আমি চেয়ে দেখলাম মাধুরীর সেই মেঘের মত কেশরাশি আর নেই। বয়সে ততটা নয়, কিন্তু রোগব্যাধিতে ওর চুল পাতলা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রূপালি রেখাও চোখে পড়ছিল।

শৈলেন ওকে সিঁদুর পরিয়ে দিল। বউরা শাঁখ বাজতে চেয়েছিল কিন্তু মাধুরী হাত ইশারায় তাদের বারণ করল।

আমি বললাম, 'মাধু, তুমি পাকা চুলে সিঁদুর পরবে বলে এতদিন বসেছিলে?'

প্রতিপদের চাঁদের মতো মাধুরীর মুখে এক চিলতে হাসিরেখা। মাধুরী বলল, 'ঠিক আছে। প্রভাতদা এবার তুমি বাকি মন্ত্রটুকু পড়িয়ে দাও।'

আমি কি বামনে যে মন্ত্র পড়াব? তাছাড়া আমি নিজেই মন্ত্রমুগ্ধ। তবু আমি ধীরে ধীরে দুটি লাইন আবৃত্তি করলাম। 'যদিদং হৃদয়ং তব। তদিদং হৃদয়ং মম।'

ওরা পড়ল না, কিন্তু কান পেতে শুনল।

জীবনে কত বিয়ের বরযাত্রীই না গিয়েছি। কত দূর দুর্গম জায়গায় দুঃসাহসিক অভিযান। কিন্তু এমন বরযাত্রী কখনো হই নি কল্যাণবাবু, এমন পৌরোহিত্যও কখনো করি নি।

সেদিনের সেই রজনীগন্ধার গুচ্ছ কিনে নেওয়া আমার সার্থক হয়েছিল। সেই

ফুল মাধুরীর বিছানার এক পাশে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণের জন্যে ওর রোগশয্যা হয়ে উঠল ফুলশয্যা।

মাধুরী কিন্তু তারপর বেশিদিন বাঁচল না। ওর ভাইরা খরচপত্র করে চিকিৎসা করেছিল। শৈলেনও চেষ্টার ত্রুটি করে নি। কলকাতায় এনে সেরা নার্সিং হোমে রেখেছিল। কিন্তু ওর পেটের আলসার কিছুতেই ভালো হল না। অপারেশন টেবিলেই ও মারা গেল। আমি আর এক ডজন রজনীগন্ধা নিয়ে ওকে দেখতে গেলাম।

মুখাগ্নি করেছিল শৈলেনই। নিজের গাঁট থেকে হাজার পাঁচেক টাকা বার করে শ্রাদ্ধশান্তি করল। লোকজন খাওয়াল। কীর্তনীওয়ালাদের ডাকল বাড়িতে। আমরা তো অবাক। এর আগে কোনদিন এসব ব্যাপারে ওর বিশ্বাস ছিল না। বুঝতে পারলাম মাধুরীর ইচ্ছা।

সেই মধুর হৃদয়ের আরো একটি অন্তিম ইচ্ছার নিদর্শনও শৈলেন আমাকে দেখাল। আগে যেমন প্রেমপত্র বুকপকেটে নিয়ে ঘুরত তেমনি আবো একখানি মোটা এনভেলপ ওর পকেটে ঘুরছিল। মাধুরী বলে গিয়েছিল আমি মরার আগে এ চিঠি খুলবে না।

খোলার পর দেখা গেল চিঠি নয়, একটি সবুজ রং-এর খামে তিরিশ হাজার টাকার চেক মাধুরী শৈলেনকে লিখে দিয়ে গেছে।

শৈলেন বলল, 'আমি এ টাকা নেব কেন?'

আমি বললাম, 'নিয়ে নাও। বিয়ে করেছ যৌতুক তো কিছু পাও নি। পণের টাকাটা ছাড়বে কেন?'

শৈলেন মাধুরীর ভাইদের কিছু দিল। আর বাকিটা দিল হাসপাতালে। মাধুরীর নামে একটি বেড খোলার জন্যে দুঃস্থ নারীদের সেখানে চিকিৎসা হয়।

তারপর থেকে বছরে একটি দিন মৃত্যুতিথি পালন করে শৈলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমিই একমাত্র অতিথি। ঘরের দেয়ালে মাধুরীর মাঝারি সাইজের একখানি ফটো টাঙানো। তার একালের ফটো নয়, সেকালের ফটো। তার সেই প্রথম তারুণ্যের।

সেই উদ্ভিন্নযৌবনার ছবি সামনে নিয়ে আমরা দুই বুড়ো দুখানি চেয়ার পেতে মুখোমুখি বসি। চা খাই, গল্প করি। কখনো বা সব কথা বন্ধ করে শুধু চুপ করে বসে থাকি।

শৈলেন মৃত্যুর হাত থেকে একটি প্রেমকে রক্ষা করছে। আর আমি জরার হাত থেকে একটি বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে চলেছি।

প্রভাতবাবু উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাটি সামনে থাকা সত্ত্বেও আজ তিনি ভুলে ফেলে যাচ্ছিলেন। আমি সেটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্কস্।'

শারদীয় 'দেশ', অক্টোবর ১৯৭২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) জন্ম অধুনা বাংলাদেশের দিনাজপুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রীডার ছিলেন। গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক চিত্রনাট্য প্রবন্ধ শিশুসাহিত্য গান, সংবাদপত্রধর্মী রচনা সবরকম রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' (১৯৪৪) তাঁকে দেয় সাহিত্যখ্যাতি। একই সঙ্গে নির্মম সমাজ-বিশ্লেষক ও রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেমী।

মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু

স্যার,

আমার এই খাতা শেষ পর্যন্ত আপনি পড়বেন কি না জানি না। কারণ, আপনি দেখেছেন যে আমি একটি প্রশ্নেরও উত্তর লিখি নি, আগাগোড়া এই চিঠিটাই লিখেছি আপনাকে। আপনি হয়তো লাইন কয়েক পড়েই ভ্রূকুটি করবেন, একটা জিরো বসিয়ে দেবেন, তারপর নন্‌সেন্স রাইটিঙের জন্য আমার নামে ইউনিভার্সিটিতে একটা রিপোর্ট পাঠাবেন। জিরো দিন, রিপোর্ট করুন, সেজন্যে ভাবছি না। হয়তো বা ধৈর্য ধরে লেখাটা আপনি পড়েও ফেলতে পারেন, এই আশাতেই আপনার কাছে এই নিবেদন পেশ করছি।

দু-একটা প্রশ্নের জবাব হয়তো দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে পাশ মার্ক পাওয়া দূরে থাক, কুড়ির ঘরেও পৌঁছুত না। তাই ও চেষ্টা আর করব না। তা ছাড়া আজ সন্ধ্যার পরেই তো আমি পাশ-ফেলের বাইরে চলে যাব। কলকাতার আশপাশ দিয়ে যে অসংখ্য ট্রেন আসে যায়, তাদেরই কারো চাকার তলায় শেষ হিসেব মিটিয়ে দেব আমার। এই খাতা যখন আপনি দেখবেন, তখন ট্রেনে কাটা-পড়া অপরিচিত যুবকের মৃত্যুর ছোট্ট আর পুরোনো সংবাদটুকু আপনার স্মৃতি থেকেও মুছে গেছে।

আপনার অধ্যাপক-বিবেক এইখানে এসে একবার থমকে দাঁড়াবে। বলবেন ছিঃ—ছিঃ, পরীক্ষায় পাশ না করতে পেরে আত্মহত্যা! এর চাইতে অধম কাপুরুষতা কি কল্পনাও করা চলে? দেশের তরুণদের যদি এইটুকুও নৈতিক বল না থাকে—তা হলে বাঙালী কোথায় দাঁড়াবে—জাতির ভবিষ্যৎ কী!

বিশ্বাস করুন স্যার, এ সব কথাই আমি জানি। আরো বিশ্বাস করুন, আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমারই হাতের ছোঁয়ায় সাঁওতাল পরগণায় বান-ডাকানো খ্যাপা পাহাড়ী নদী বিশাল ক্যাচ্‌মেণ্ট এরিয়ার মধ্যে থমকে দাঁড়াবে, আমি সুইচ্‌ টিপলে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের হাজার হাজার আলোয় ঝলমল করে উঠবে বিহার-পশ্চিম বাংলার সেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট—ব্লাস্ট ফার্নেসের রক্তিম আভায় আমিই

গলিত ইস্পাতে আগামী ভারতবর্ষের ভিত্তি রচনা করে দেব! স্যার, আত্মহত্যা আমি করতে চাই নি।

আমার চারদিকে ছেলেরা দ্রুত বেগে পরীক্ষার খাতা লিখে চলেছে তাদের অনেকেই আমার মতো এখনো স্বপ্ন দেখছে এবং কিছুদিন পরে ক্রশ-লিস্টে অনেকেরই সে স্বপ্ন খান-খান হয়ে যাবে। তবু ওদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো জীবনে কৃতী হবে—ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আশার মশাল জ্বালিয়ে নেবে হাতে। ওরা ভাগ্যবান—এগিয়ে চলুক। আমার মতো যে অসংখ্যেরা এম্নি করে হরিয়ে যাবে, কিংবা বেঁচেও বেঁচে থাকবে না, তাদের কথা কোনো পঞ্চবার্ষিকী সাফল্যের খতিয়ানে লেখা থাকবে না। আমি আপনাকে চিনি না, কখনো দেখি নি কোনোদিন দেখব না, কিন্তু এটুকু জানি, আপনি অধ্যাপক। ছাত্রদের কাছাকাছি আপনাকে থাকতে হয়, তাদের জীবনের ঢেউ আপনাকে ছোঁয়, হয়তো তাদের আপনি ভালোও বাসেন। তাই শেষ পর্যন্ত আপনি পড়ুন বা না-ই পড়ুন, আমাদের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব!

স্যার, স্বপ্ন যখন দেখেছিলাম তখন এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামের চাষীর ছেলে। কিন্তু আমার বাবা চাষী হলেও দিল্লি-আলো-করা নেতাদের কারুর চাইতে তাঁর দেশপ্রেম এতটুকুও কম ছিল না। আমার জন্ম হয়েছিল উনিশশো বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরের মাঝ রাতে এক জঙ্গলের ভেতর। কারণ, তখন মিলিটারীরা আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছিল আর জাতীয় পতাকা আঁকড়ে ধরে বুলেটবেঁধা বুক নিয়ে আমার বাবা লুটিয়ে পড়েছিলেন এক ধানক্ষেতের ভেতর।

বাবার ইচ্ছে ছিল, ছেলে হলে তার নাম রাখবেন স্বাধীনকুমার। সেই আগুনজ্বলা প্রলয়ের রাতে বাবার রক্তের আশীর্বাদ নিয়ে স্বাধীন আকাশের তলাতেই আমি জন্মেছিলাম। কারণ, মিলিটারীর সমস্ত তাণ্ডব সত্ত্বেও দেশের একটি মানুষের মনও সেদিন পরাধীন ছিল না।

কিন্তু এ-সব ইতিহাস থাক স্যার। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তাহলে এবার আপনার নিশ্চয়ই ধৈর্যচ্যুতি হবে—আমার বংশপরিচয় শোনবার কী মাথাব্যথা আছে আপনার। তা ছাড়া এমনিতেও আমি তো তিন ঘণ্টার বেশি সময় পাব না—এতে খাতা কেড়ে নেবে। তাই সংক্ষেপেই বলতে চেষ্টা করি।

চাষীর ছেলে, চাষবাস করে কোন মতে বাঁচতে পারতাম, কিংবা অকাল এলে অনেকে যেমন না খেয়ে বা অখাদ্য খেয়ে মরে, তেমনি করে মরে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার বরাত খারাপ কাকা আমাকে গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্তি করে দিলেন আর—আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি একটা স্কলারশিপও পেয়ে গেলাম।

স্যার, সেই স্কলারশিপই আমার কাল হল। আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। মা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন। বাবার জন্যে মা-কে কাঁদতে দেখলাম এই প্রথমবার। তারপর দু-চোখ ভরা আলো নিয়ে কাকার সঙ্গে রওনা হলাম

আট মাইল দূরের বড়গঞ্জের হাই স্কুলে ভর্তি হতে।

হোস্টেলে থাকবার পয়সা ছিল না। জায়গা পেলাম ধান-চালের আড়তদার সামন্তদের বাড়িতে। সামন্তরা দূর সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় হত—কিন্তু গরীব চাষীর সঙ্গে সে আত্মীয়তা তারা স্বীকার করত না। আসল সম্পর্ক ছিল জোতদার আর প্রজার, মহাজন আর খাতকের। কাকাই হাতে পায়ে ধরে ওদের ওখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। হাই স্কুলে ভর্তি হলাম, ফ্রীও পেলাম।

স্যার, সামন্তদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা। দুটো লরী, তিনটে মোকাম। কিন্তু ব্যবসা যারা করে, তারা কোনোদিন পাই পয়সাও বাজে খরচ হতে দেয় না। পাঁচশো টাকা দান করে পঁচিশ হাজার টাকার আখের গুছিয়ে নেয়। আমাকেও খেতে থাকতে দিত বটে, কিন্তু তার দামও আদায় করে নিত।

এই খাতা দেখেই বুঝতে পারছেন আমার হাতের লেখা খারাপ নয়; তার ওপরে অঙ্কে আমার মাথা ছিল, মাইনর পরীক্ষায় অঙ্কে একশোর ভেতরে একশো পেয়েছিলাম। ওরাও সুযোগ ছাড়ল না। প্রথম-প্রথম আমাকে দিয়ে চিঠিপত্র লেখাত, তারপর খাতা লেখাত, তারও পরে হিসেব কষাত। সকালে দু ঘণ্টা এ আমার বাঁধা কাজ দাঁড়িয়ে গেল।

পড়বার সময় পেতাম রাত আটটার পরে।

তা-ও কি ভালো করে পড়ার যো ছিল?

আড়তের লাগাও একখানা ছোট ঘরে আমি থাকতাম আর থাকত ওদের এক মুহুরী। মুহুরীর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। শুকনো চাম্‌চিকের মতো চেহারা—দুটো অদ্ভুত বড়ো-বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ। আমি পড়তে বসলেই সে হুঁকো ধরিয়ে আরম্ভ করত।

আমার তখন বয়স কত আর? বারোর বেশি নয়। তামাক টানতে টানতে, জ্বলজ্বলে চোখদুটোকে আরো জ্বালিয়ে তুলে বিশ্রী ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় যে-সব গল্প শোনাত, সে-সবের মানে তখন আমি ভালো করে বুঝি নি, পরে বুঝেছিলাম। অকথ্য, অশ্লীল সমস্ত ব্যাপার। কত ভাবে, কত মেয়ের সর্বনাশ সে করেছে তারই বিবরণ।

আমার ভালোমন্দ কিছুই বোধগম্য হত না। ভারী বিরক্তি লাগত।

—চুপ করুন, আমায় একটু পড়তে দিন।

—আরে থাম্‌ বাপু, থাম্‌! চাষার ছেলে বিদ্যাসাগর হবে—হেঁঃ! তার চেয়ে হুঁকোটা ধর্‌—তামাক খাওয়াটা শিখে নে।

মুহুরী যদি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তো দপ করে লণ্ঠনটা গেল নিবে। সামন্তদের বাড়ি থেকে যেটুকু কেরোসিন তেল বরাদ্দ হত রাত ন'টার পরে আর আলো জ্বলবার কথা নয়। স্কলারশিপের যে সামান্য ক'টা টাকা পেতাম, তাতে নানা টুকটাক খরচ চালিয়ে আর তেল কেনবার পয়সা জুটত না।

তবু এর মধ্যেও ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়ে ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছিলাম। তারপরেই দেখা দিল বইয়ের সমস্যা। দেখলাম স্কুলফাইন্যালের বই কেনা প্রায় সত্তর-আশী টাকার ধাক্কা। কাকা খোরাকীর ধান বেচে ক'টা টাকা পাঠালেন, সামন্তেরা দশ টাকা সাহায্য করল, হেডমাস্টার দয়া করে তিনখানা স্কুল কপি দিলেন। তবু অর্ধেক বইও হল না।

আর সামন্তদের দশ টাকার ঋণ শুধতে হল খাতার পর খাতা লিখে।

স্যার, মাইনরে স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমি তুচ্ছ সাধারণ ছাত্রদের দলে নই, আমার মধ্যে শক্তি আছে, তারই জোরে—আমি স্বাধীনকুমার—স্বাধীন গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াব। যে ভারতবর্ষের জন্যে আমার বাবা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, সেই ভরতবর্ষে আমি আমার সত্যিকারের কাজের জায়গা খুঁজে পাব। কিন্তু না পারলাম ঠিকমতো পড়াশুনো করতে, না হল ভালোভাবে পরীক্ষা দেওয়া। রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল, থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছি।

হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই একবাক্যে ছি—ছি করতে লাগলেন। সামন্তদের যে ছেলেটা তিনবার বি-এ ফেল করে এখন হলদী নদীর ধারে ধারে বন্দুক কাঁধে কাদা-খোঁচা শিকার করে বেড়ায়, সে বললে, পাশ করেছে এই ওর ভাগ্যি! কত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে স্কুল-ফাইন্যালে মার খেয়ে যায়।

দুদিন ঘরে মুখ লুকিয়ে পড়ে রইলাম। উঠলাম না, খেলাম না। আর তারই ভেতর মা-র চোখের জল টপটপ করে পড়তে লাগল আমার কপালে।

—ওঠ্ বাবা ওঠ্। আবার মন দিয়ে লেখাপড়া কর তুই জীবনে ঠিকই বড় হতে পারবি। তোর মতো কত দুঃখী ছেলে একেবারেই পাশ করতে পারে নি—তাদের কথাও ভেবে দেখিস।

স্যার, আবার বুক বাঁধলাম। এবার চলে এলাম কলকাতায়। কী করব, ওই সামন্তদের কাছ থেকেই চিঠি নিয়ে এলাম। সরকারেরা সামন্তদের কুটুম—বড়বাজারে তারা তামাকের ব্যবসা করে। সেই খানেই জায়গা হল।

ওই এক কাজ। দোকানের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, দরকার হলে তাগাদায় বেরুতে হবে। তবু মনে হল, কলকাতা—কলকাতা। কত বড় জীবন এখানে—কত সুযোগ। বড়-বড় কলেজ, নামজাদা সব দিকপাল অধ্যাপক সেই সব কলেজে একবার পা দিলে, নামকরা প্রোফেসারদের জ্ঞানের একটুখানি ছোঁয়া পেলেই আমার মনের ভেতর হাজার আলো ঝলমল করে উঠবে। সারা পৃথিবীর প্রাণের ঢেউ এই কলকাতায় এসে ভেঙে পড়েছে—তার সঙ্গে একবার প্রাণ মেলাতে পারলে আমি রাতারাতি খোলা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াব—প্রথম বর্ষার জল পেয়ে মরা চারাগাছ যেমন নতুন পাতা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

গেলাম কলেজে—সঙ্গে আবার ক'টা খোরাকির ধান বেচা টাকা। জানি, এরজন্য

সংসারের সবাইকে হয়তো বেশ কদিন আধপেটা খেতে হবে, হয়তো উপোস দিতে হবে। কিন্তু যদি ভালো করতে পারি পরীক্ষায়, যদি মানুষ হতে পারি, যদি—

বিরাট বাড়ি কলেজের তাতে রথের মেলার ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে যদি বা অফিসে পৌঁছুতে পারলাম, শুনলাম, থার্ড ডিভিশন? আই, এস-সিতে সীট? হবে না।

একটা-দুটো নয় স্যার, ছটা কলেজ থেকে ফেরৎ দিলে। শেষে ওরই মধ্যে একটু অকুলীন একটা কলেজে জায়গা হল। ভাইস-প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যদি কিছু কন্‌সেশন পাই।

—কন্‌সেশন? ভাইস-প্রিন্সিপালের চোখ আকাশে উঠল; থার্ড ডিভিশন?

—স্যার—

—অই এস-সিতে এমনিই আমরা কন্‌সেশন দিই না, তার ওপরে থার্ড ডিভিশন!

—স্যার, গরিবের ছেলে—

—সব বাঙালীর ছেলেই গরিব। সে ভাবে দেখতে গেলে কলেজ শুদ্ধ ছাত্রকেই ফ্রী স্টুডেণ্টশিপ দিতে হয়।

—স্যার, একেবারে চাষীর ঘরের ছেলে আমি—

ভাইস-প্রিন্সিপাল দারুণ বিরক্ত হলেন : তা হলে কলেজে পড়তে এলে কেন? চাষবাস দেখলেই পারতে। হায়ার এডুকেশন তোমাদের জন্যে নয়। গো—গো—ডোণ্ট ডিস্টার্ব মী—

কন্‌সেশন হল না। পথে ফিরে আসতে আসতে সামন্তদের সেই মুহুরীর কথা মনে পড়তে লাগল : চাষার ছেলে বিদ্যাসাগর হবে—হেঁঃ।

স্যার, তখনি হয়তো আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। এক মাঠ রোদের ভেতর আগুনি পোড়া দিচ্ছে, তাঁর কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পড়ছে—সেইখানে নিজের জায়গায় গেলেই আমার ভালো হত, শহরের এই অপমানের চাবুক এমন করে আমার গায়ে পড়ত না। কিন্তু স্যার, আশা আমি ছাড়তে পারলাম না। কেমন জেদ চেপে গেল, মনে হল, এর শেষ দেখে ছাড়ব!

সরকারদের তামাকের দোকানের এক ধারে থাকি। সামন্তদের সঙ্গে কত তফাৎ। সেখানে ছোট একটা আটচালার ঘরে থাকতে হত বটে, কিন্তু বাইরে আকাশ ছিল আলো ছিল, স্নানের জন্যে মস্ত একটা দীঘির কালো গহীন জল ছিল—বাতাসে ধুতরো-ভাঁটি-চাঁপা-বকুলের গন্ধ ছিল। কিন্তু এখানে বড়বাজারের গলি। বেলা বারোটায় সারি সারি দোকানে ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলছে তিনহাত রাস্তার দুধার দিয়ে আকাশছোঁয়া স্যাতালাগা বাড়ি—বাতাস নেই, গায়ে গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাজারো লোকের রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত আসা-যাওয়া, গুমোট গরম, লাইন বাঁধা দোকান থেকে তামাক আর গুড়ের গন্ধ—আর কান-ফাটানো কোলাহল।

এরই মধ্যে এক কোণায় একটা তক্তোপোশে থাকি। সারারাত ইঁদুর চরে, দিনে-

দুপুরে আরশোলার উৎপাত। সরকারেরা কলেজের মাইনেটা চালাত—আর দিত পাঁচ টাকা হাত খরচ। তার বদলে সকালে-বিকালে কাজে বেরুতে হত—তাগাদায় যেতে হত। জোগাড়-যন্তর করে একটা টিউশন জুটিয়ে নেব তারও জো ছিল না! বই? আই এস-সির সব বই কিনতে কত টাকা লাগে সে আমি আজও জানি না। স্যার, আপনিও বোধহয় জানেন না। আপনাদের সময় যে বই আপনারা পাঁচটাকায় পেতেন এখন তা বারো টাকার নিচে নয়। দু-একখানা পুরোনো এডিশন ফুটপাথ থেকে কিনেছিলাম—তাতে সিলেবাসের অর্ধেকও পাওয়া যেত না।

পড়াশুনো? খেতে যেতে হত সরকারদের বৌবাজারের বাড়িতে। সেখান থেকে খেয়ে ফিরতে দশটার আগে নয়। তারপর একটা হল্‌দে ঘোলাটে বাল্ব জ্বেলে যখন পড়তে বসতাম, তখন দু-চোখ যেন ছিঁড়ে পড়ত, খাতার নোটগুলিকে একরাশ দুর্বোধ্য হিজিবিজি বলে মনে হত। কখন ঘুমিয়ে পড়তাম জানি না সারারাত গায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুর আর আরশোলারা দৌড়ে বেড়াত।

আর কলেজে? ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়। এক-একটা বেঞ্চে সাত-আটজনকে ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়, যেখানে পাঁচজনের বসবার জায়গা হওয়া উচিত। নোট নিতে হলে খাতা রাখবার জায়গা মেলে না, ল্যাবোরেটরির অবস্থা আরো চমৎকার। পনেরো জনের মতো ছেলে যেখানে কাজ করতে পারে—সেখানে পঞ্চাশ জনকে কাজ করতে দেওয়া হয়।

ভাবী বৈজ্ঞানিক! স্বাধীন ভারতের ইতিহাস যারা পড়বে—এই তাদের লেখাপড়া শেখানোর চেহারা!

তবু স্যার, চেষ্টার ত্রুটি করি নি। দু-চার জনের কথা বলছি না—আমাদের মতো তুচ্ছ সাধারণ ছাত্র কলেজে লেখাপড়া শিখতেই এসেছিল। কেন তারা পারে না, কেন যে তারা ফেল করে—

একটা ঘটনা বলি, স্যার! আজ এ অবস্থাতেই আমার হাসি পায় কথাটা ভাবলে।

কলেজের ফাউণ্ডেশন ডে। ঘটা করে সভা, পতাকা উত্তোলন, বক্তৃতা। সব চেয়ে ভালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভাইস-প্রিন্সিপাল। বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

—আমরা একটা স্টাটিস্‌টিক্স নিয়ে দেখেছি—কলেজের টেন পার্সেণ্ট ছেলে মোটামুটি সব বই কিনতে পারে, টুয়েণ্টি পার্সেণ্ট কিছু-কিছু কিনতে পারে, বাকী সেভেণ্টি পার্সেণ্ট একখানা বইও কিনতে পারে না! এ অবস্থায় কী শিক্ষা আমরা দেব—কাদের বা দেব! এর যদি প্রতিকার না করা যায়, তা হলে শেষ পর্যন্ত দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

প্রতিকার অবশ্য ভাইস-প্রিন্সিপাল ভেবেই রেখেছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, কলেজ এডুকেশন গরিব ছাত্রদের জন্যে নয়!

স্যার, সেকেণ্ড আওয়ারের বেল পড়ল। আর বেশিক্ষণ আমি লিখতে পারব না। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তা হলে আপনার উদারতার উপরও আর উৎপাত করা চলে না। সংক্ষেপেই আমার কথাগুলো এবার শেষ করি।

আমার মা লেখাপড়া জানেন না। আঁকাবাঁকা হরফে তাঁর জবানিতে কাকা চিঠি লিখতেন।

'তুমি বড়ো হও বাবা—দেশের দশের একজন হও। তোমার বাবা যে নাম রেখে গেছেন সে নামের সম্মান রেখো তুমি। স্বাধীন ভারতের কর্মী হতে হবে তোমায়—সে কথা তুমি ভুলো না।'

ভুলি নি—একদিনের জন্যেও না। কিন্তু স্বাধীন ভারত তো আমার দয়িত্ব তুলে নিলে না,—আমার শিক্ষার পথ খুলে দিলে না। সেই তামাকের দোকানে চাকরি করে—ক্লাসের নামে সেই অর্থহীন হট্টগোলের ভেতরে, ভাপ্সা গরম আর কোলাহলে ভরা বড়বাজারের গলির সেই ঘরটিতে, হলদে ইলেকট্রিকের আলোয় আমার চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে যেত—মাথার মধ্যে এক-একটা রক্তের ঢেউ ফেটে পড়ত থেকে থেকে। মনে হত এখান থেকে ছুটে পালাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি কোনো পুরোনো দীঘির গহীন কালো জলের ভেতর, বুক ভরে টেনে নিই চাঁপা-ভাঁটিফুল-নাগকেশরের গন্ধ, কোনো বর্ষার কাজলা মেঘকে হাত বাড়িয়ে ডাকি আর বলি : আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে—

কিন্তু কলকাতায় দীঘির সেই কালো ঠাণ্ডা জল কোথাও নেই, নেই নাগকেশর সোঁদাল ফুলের গন্ধ, আমাদের দেশের বাড়িতে ভরপেট খোরাকির ধান নেই, মানুষের আগুনজ্বালা বুকের ভেতর কোনোখানে এক পশলা বৃষ্টি নেই!

কোথা যাব। কোথায় পালাব!

আশা ছাড়ব না! আমি বাঁচব, আমি বড় হবো। আমি নইলে নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসে আগুন জ্বলবে না, হাইড্রো-ইলেক্ট্রিকের বিদ্যুৎ ছুটবে না—এ্যাটোমিক রিসার্চের কাজ বাকী পড়ে থাকবে, রিফাইনারির পেট্রোলিয়াম পেট্রাল কেরোসিন—ব্লুঅয়েল—প্যারাফিনে নব নব রূপ লাভ করবে না! সেই ময়দানবের মন্ত্র আমায় জোর করে কেড়ে নিতেই হবে! আমি যে স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিক।

স্যার, সবই স্বপ্ন! বাঙলাদেশের কলেজে-কলেজে আমার মতো অসংখ্য ছাত্র স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছে—স্বপ্নের ঘোরেই চলে বেড়াচ্ছে। তারপর একদিন স্বপ্ন ভাঙে, দেখতে পায়—স্যার, পড়াশুনো কিছুই হল না। কখন পড়ব, কোথায় বই পাব? সামান্য বই কিংবা নোট জোগাড় করতে পারি, হলদে বাল্বটার ঘোলাটে আলোয় তাদের কোনো অর্থই থাকে না, এক সার পোকার মতো তারা চোখের সামনে কিলবিল করে নড়তে থাকে। তারপর কখন স্নায়ুগুলো ভেঙে পড়ে—সব চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তামাক, চিটে গুড় আর ইঁদুর—আরশোলা—ড্যাম্পের গন্ধভরা

ঘরে ভোরের আলোয় যখন জেগে উঠি, তখন যেন মাথায় বিশ মন ভার চেপে আছে। তারপর আটটা না বাজতেই হিসেবের খাতা!

অ্যানুয়ালের খাতা দেখা হয় না মাইনে দেওয়া থাকলেই ঝাঁক ধরে প্রমোশন। প্রিটেস্ট দিলাম না, কী পড়ে দেব? তারপর এগিয়ে এল টেস্ট।

স্যার, এইখানে নিজের অপরাধের কথা কবুল করি। টেস্ট যখন কাছিয়ে এল, তখন মনের মধ্যে সারাক্ষণ সবটা অনিভন্ত চিতা যেন জ্বলতে লাগল আমার। বই—মাত্র কয়েকটা বই যদি আমার থাকত তাহলে ফার্স্ট ডিভিশন না পাই—অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশন আমি পেতামই, আর ম্যাথামেটিক্সে একটা লেটার!

রাগ করবেন না স্যার, আমার মনের অবস্থা বুঝে দেখুন। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম! তারপর—

তারপর—আমি কলেজ থেকে ক্লাসমেটদের বই চুরি করতে আরম্ভ করলাম।

আপনি কী ভাবছেন আমার সম্বন্ধে? ভাবুন। আমিই কি একথা বিশ্বাস করতে পারি যে শেষ পর্যন্ত আমি চোর হয়ে গেলাম? আমার বাবা রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন, তাঁর ছেলে হয়ে শেষকালে চুরি করলাম আমি?

স্যার, যদি পারেন—বিচার করবার আগে একবার ভেবে দেখবেন কেন ছেলেরা বই চুরি করে, কেন পরীক্ষার খাতায় নকল করে, কেন প্রশ্ন কঠিন মনে হলে অমন হিংস্র অশোভন ভাবে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসে? এগুলো অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়। এ জিনিস কখনো হওয়া উচিত নয়—কেউ এসব সমর্থনও করবে না। তবু কেন হয়। কেন ছেলেরা এমন ভুলের বিকৃত পথে পা বাড়ায়? একটা পাশ-ফেলের ওপর তাদের কতখানি আসে যায়, কখনো কি তা চিন্তা করেছেন?

চুরি করা বই নিয়ে কোনো মতে হিঁচড়ে টেস্টে তরে গেলাম। মাইনে দেওয়া ছিল, টেস্ট না দিলেও অ্যালাউ করে দিত কিন্তু তারপর? ফী দিতে হবে পরীক্ষার। এবং অনেক টাকা।

দেশের অবস্থা খারাপ—কাকার চিঠিতে জানলাম, এর মধ্যেই পেটভাতের ভাবনা দেখা দিয়েছে—নতুন ধান উঠতে না উঠতেই! মা-র লক্ষ্মীর ঝাঁপির সিঁদুরমাখা শেষ টাকাটা পর্যন্ত গেছে—হয়তো গরু বিক্রী করে সামান্য কিছু পাঠানো যাবে।

লিখে দিলাম, গরু বেচতে হবে না, আমিই যেমন করে পারি জোগাড় করব।

কিন্তু কোথায় যোগাড় করব? স্টুডেণ্টস্ এইড ফাণ্ড থেকে পনেরো টাকা সাহায্য দিলে। তারপর?

সরকার-কর্তা আমায় ডেকে পাঠালো। বললে, পরীক্ষার ফীয়ের জন্যে ভাবনা কি—আমিই পঞ্চাশ টাকা দেব তোমায়।

এত দয়া!

স্যার, এতদিনে বুঝেছি, দয়া শুধু দয়াই নয়; ওর পেছনে আর একটা ভয়ঙ্কর দাবি

থাকে। পৃথিবীতে দয়ার দাম দিতে হয় সাংঘাতিক ভাবে।

ফী দেওয়া হয়ে গেল। তারপর—তারপর এই দু-মাস ধরে দয়ার ঋণ শোধ করেছি।

বিশ্বাস করবেন স্যার? অঙ্ক ফিজিক্স—কেমেস্ট্রী—বাংলা—ইংরেজি কিছু পড়তে পারি নি। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে রাত জেগে জেগে, ছিঁড়েপড়া চোখ আর মাথায় বিশ মন পাথরের ভার নিয়ে আমি সরকার-কর্তার খাতা তৈরি করেছি।

কিসের খাতা? ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার খাতা। গোপন খাতা। পঞ্চাশ টাকার দায় প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে, প্রতিবিন্দু রক্ত দিয়ে আমায় মেটাতে হয়েছে। এর পরেও পড়ব? আমি তো অতি-মানুষ নই!

তবু পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। তবু আশা ছাড়ি নি। ভেবেছিলাম একটা মিরাক্‌ল ঘটে যাবে; এই চুরি করে হাত পাকিয়েছি, নকল করবার জন্যে বাইরের পাতাও ছিঁড়ে এনেছিলাম, কিন্তু মিরাক্‌ল তো ঘটলো না! জামার তলা থেকে কিছুতেই এক টুকরো কাগজ আমি বার করতে পারলাম না ফার্স্ট পেপার, সেকেণ্ড পেপার, থার্ড পেপার—আমার চোখের সামনে সব নেচে বেড়াতে লাগল। শুধু সরকার কোম্পানির জাল হিসেবের খাতা ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার ভেতরে. প্রত্যেক ছত্রে আর ইন্‌ভিজিলেটারের মুখ এক-একটা জমা-খরচের পাতার মতো দেখালো।

এই বাংলার খাতা আমার শেষ খাতা।

স্যার ওর্য়ানিং পড়ল। আর পাঁচ মিনিট পরেই খাতা কেড়ে নেবে। আমার কথাও শেষ হয়ে এল। আজ সন্ধ্যের পরেই যে-কোনো একটা ট্রেনের চাকার তলায় আমার সব মনের ভার নামিয়ে দেব।

আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম স্যার—আমি স্বাধীনকুমার, স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্যে বাঁচতে চেয়েছিলাম; কেন আমি বাঁচতে পারলাম না, আমার মতো হাজার-হাজার ছাত্রের পক্ষ থেকে সেই প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গেলাম। জবাবটা আপনি ভেবে দেখবেন।

কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করছি? না স্যার—না। এ আমার পরাজয় নয়—আমার প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে এক প্রলয়ের রাত্রে আমার বাবা দেশের মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার রক্তও দেশের লক্ষ-লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্যে তেমনি একটা ইতিহাসের সূচনা রেখে যাবে। সে ইতিহাস কবে গড়ে উঠবে আমি জানি না। আপনি জানেন স্যার, আপনি বলতে পারেন? প্রণাম।

একজিবিশন, ১৯৬৮

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)
জন্ম ফরিদপুরে। একান্তভাবে নাগরিক জীবনের রূপকার। কখনই গ্রামজীবন নিয়ে লেখেন নি। গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। নিপুণ ভাষাশিল্পী। উপস্থাপনরীতিকে মূল্যবান মনে করেন। তীক্ষ্ণ মার্জিত ঈষৎ ব্যঙ্গদিগ্ধ ভাষায় হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভবকে ব্যক্ত করার বিরল নৈপুণ্য তাঁর করায়ত্ত। জীবনপ্রেমী। সময় ও শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই সচেতন লেখক।

ছোট কথা

সে আমার পিঠের উপর নুয়ে পড়েছিল। তার নিশ্বাস আমার কানে লাগছে। আমার হাতের আঙুলগুলো কেমন অসাড় হয়ে গেল। তাকে বলতে শুনলুম, 'মিছিমিছি পুরোনো কাগজ ঘাঁটছ, ধুলো ওড়াচ্ছ। সরসিজ, সেই গল্পটা তুমি কিছুতেই খুঁজে পাবে না।'

তার মুখ আমার কানে। অস্বাভাবিক গলা, ফাঁস-ফ্যাঁস, ভুতুড়ে। নালীতে ছেঁদা থাকলে এ রকম স্বর বেরোয়।

বললুম, তা হোক লেখাটা আমার চাই।

—চাই—ই? সে যেন ঠাট্টা করে উঠল। চাই কেন?

—মিলিয়ে দেখতুম। খাঁটি সেইটে, না বিজুমামীর যে গল্প তোমাকে বললুম, সেইটে।

—সে গল্পে কি আছে?

—সব মনে নেই ঝড়জলের রাত, শোঁ-শোঁ হাওয়া, আমাদের বাড়ির রকে বসে ভিখিরি মেয়েটা উপুড় হয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে দিল। বাচ্চাটা তবু কাঁদছিল, নীল হয়ে যাচ্ছিল। শেষে এদিক-ওদিক চেয়ে মেয়েটা তার পরনের কাপড় খুলে তিন-চার ভাঁজ করে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে নিল। এই ছবিটা শুধু মনে আছে।

শুনে শুনে সে জোরে জোরে হাসছিল। কালো আলখাল্লাটা ভাঁজে ভাঁজে ফুলে উঠে উঠে ঢেউ হয়ে রাত্তিরের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

তার চোখে-চোখে তাকানোর সাহস নেই, ক্ষুব্ধ গলায় বললুম, এ-গল্প কি হাসির?

সে বলল, হাস্যকর? তা তুমিও জান। কত দিন আগে লেখা বল ত?

—বছর গুনে বলতে পারব না। যখন এক পয়সার চিনেবাদাম নিয়ে এক ঘণ্টা কাটানো যেত। চায়ের দোকানে দু পয়সার পেয়ালা নিয়ে দু-ঘণ্টা। দু-আনায় দুপুরবেলা ধর্মতলা থেকে আলিপুর ঘুরে বালিগঞ্জ অব্দি যাওয়া যেত। তখন—

হাত তুলে সে বলল, থাক, আর দরকার নেই। সরসিজ, ওই গল্পটাও তুমি আর খুঁজো না।

—পাব না কেন?

—নেই বলে।

সে একটু কাশল, সেই অতি প্রাকৃত ঢঙে। মুচকি হাসল।—গল্পটা আসলে আমার কাছে আছে। এই দেখ।

বলে সে তার কালো ঝোলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল—ভাঁজের পার ভাঁজ, ঢেউ উঠল, রাত্রির শরীর মিলিয়ে গেল। কী একটা জিনিস বের করে সে আমার চোখের সামনে নাড়াতে থাকল। মিটমিটে আলোয় ধরতে পারছিলুম না। মনে হল, একটা বেড়ালছানা, শুকনো, চিমসে চোখ দুটো ঠিকরে বাইরে এসেছে, মণি দুটো মরা-মরা।

হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়েও আমি হাত টেনে নিলুম। সে হাসছিল।—দেখলে তো, তুমিও আর ওকে চাও না। যাকে ছুঁতে ভয়, তাকে বাঁচাবে কী করে?

সে আবার কিম্ভুত জীবটাকে ঢুকয়ে দিল তার আঙরাখার তলায়।—ও আমার কাছেই থাকুক।

পিট-পিট করে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললুম, তুমি কে?

জবাব না দিয়ে একটু-একটু করে পিছিয়ে গেল। ওর আলখাল্লাটা কাঁপল। কাঁপতে কাঁপতে কেঁপে উঠতে উঠতে রাত্রির মধ্যে মিলে গিয়ে স্থির হল। চেয়ে দেখি সে-ও নেই। তখন তাকে চিনলুম। ও সময়। সে-ই সময় যখন—

এক পয়সার চিনেবাদামে, ইত্যাদি। যখন গ্যাসের খুঁটির বিজ্ঞাপনে ঘর খালি থেকে চাকরি খালি, পাত্র-পাত্রী থেকে ছাত্রছাত্রীর হদিশ পাওয়া যেত। যখন মমতাময়ী মা সেই ভিখারিণী মেয়ে—

সময়ে আমাকে এখনকার আলোয় দেখাল বলেই ঘটনাকে মরা রোঁয়া-ওঠা বেড়ালছানার মতো ঠেকল। আমাকে ও ওর আঙরাখার মধ্যে উঁকি দিতে যদি দিত, যদি তখনকার চোখ আর বয়স ফিরিয়ে দিত, আর মন আর আলো, আর তখনকার গন্ধ মোহ সবকিছু, তবে এই সুন্দর নির্লজ্জ ভিখিরি মেয়েটাকে আবার জীবন্ত দেখতে পেতুম। ওই আলখাল্লার ভিতরে সব জ্যান্ত, বাইরে টেনে আনলেই মড়া।

—তারপর কি হল, সরসিজ?

—তারপর বিজুমামী খুব ঠাণ্ডা গলায় আমাকে বললেন, এস। ট্যাক্সির মিটার মিটিয়ে আমি নেমে এলুম। কাঁচা নর্দমা, মানানসই মাপের একটা লাফ দিতে হল। শার্কস্কিনে তবু একটু কাদার ছিটে লেগেছিল।

এ-গলি যেন ট্যাক্সিটার মাপে-মাপে তৈরি। দেশলাইয়ের খোল আর বাক্সের মতো মাপসই। ঢুকেই মনে হয়েছিল আমি চিনি। অন্তত এই গন্ধটা। আগে একদিন থেকেছি। হঠাৎ পুরোনো প্রণয়িনীর ঘরে ঢুকলে যেমন লাগে। বাধো-বাধো ঠেকে, আড়ষ্ট, আবার যেন চেনা-চেনা। শরীরের ভাঁজ, হাই-তোলা চুলের গন্ধ। ঠিক আগে

যে ব্যবহার করেছি এখন তা করতে পারব না, অস্বস্তি হবে, মুখোমুখি হব তবু মুখের কাছে মুখ নেব না, একটু আড়াল থেকেই যাবে।

বাধা কোন্‌টা—আমার বয়স? হাওয়াই শার্টের পকেটে কড়কড়ে যে নোটগুলো উঁচু হয়ে আছে সেগুলো? জুতো জোড়া আর একটু কম মশমশ করলেও পারত।

বিজুমামী একটা লণ্ঠন নিয়ে এলেন। বললুম, দরকার ছিল না। আমি ঠিক যেতে পারব।—পরিমল কেমন আছে মামীমা?

বলতে বলতে যে-ঘরের ভিতরে গিয়ে দঁড়ালুম গায়ে জ্বর থাকলে কুলকুল করে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যেত। দরজা একটা নিশ্চয়ই ছিল নইলে ঢুকলুম কী করে; জানালা বলা চলে এমন কিছু চোখে পড়ল না।—পরিমল কেমন আছে?

বিজুমামীর থমথমে মুখ দেখেই বোঝা উচিত ছিল প্রশ্নটা নিরর্থক।

মামী আঙুল দিয়ে ভিতরের ঘর দেখিয়ে দিলেন। একটা টুল ছিল বসলুম, যদিও আমার পেটের চর্বিতে চাপ পড়ছিল, বুকের বোতামগুলো আলগা করে দেব কিনা ভাবছিলুম, এবং জুতো পায়ে ঢোকা ঠিক হয়েছে কি না সেটা স্থির করবার জন্যে ঘরের মধ্যে অন্য কারুর জুতো তা সে ছেঁড়া পুরোনো যেমনই হোক, খুঁজছিলুম।

—চা আনি?

সম্বিৎ ফিরল। দেখি বিজুমামী জিজ্ঞাসা করছেন। বললুম, আনুন। ঘরের কোণে একটা কাপের গা পিঁপড়ে চাটছিল। গোটা দুই আরশোলা ভিতর থেকে শুঁড় তুলে উঁকি দিচ্ছিল। কাপটা কুড়িয়ে নিয়ে বিজুমামীকে বেরিয়ে যেতে দেখলুম।

(সরসিজ তারপর? কিছু লুকিও না।)

—না, লুকোব না। দেখ, তুমি কে জানি না। হয়ত আমার আত্মা, হয়ত বিবেক, কিংবা ফাদার কনফেসর। সব বলব বলেই ত তোমাকে ডেকেছি। তোমার কাছে কবুল করছি, চা আমি খেতে পারি নি। কী হয়েছিল জান? কাপটা হাত বাড়িয়ে নিতে যাব, হঠাৎ ফসকে সবটুকু পড়ে গেল মেঝেয়। আমার ধবধবে শার্কস্কিনে আরও কয়েকটা ছিটে লাগল। লজ্জিত বিজুমামী বললেন, আহা! তাড়াতাড়ি ন্যাতা আনতে ছুটলেন। আমি বললুম, ইস্।

হাসছ? তুমি কী বলবে জানি। ইচ্ছে করে কাপটা ফেলে দিয়েছি। কিংবা আমার প্রবৃত্তি দিয়েছে। একটু আগেই ওই পোয়ালাটায় আরশোলা দেখেছিলাম। তা-ছাড়া থিকথিকে মেঝে, চোঁয়াগন্ধ, এই ঘর—ওখানে বসে আমার গলা দিয়ে কিছু গল্‌ত না।

এ নিয়ে পরে আমার মনে অনুতাপ ছিল না এমন নয়। কাজটা রুচিকর হয় নি। বিশ্রী—ছোটলোকের মতো হয়েছিল। বিজুমামীর চোখে ধরা পড়েছিল কিনা জানি না। কী করবো, আমরা সবাই ত প্রবৃত্তির দাস। যদি গা-বমি-ভার এসে থাকে, সে কি আমার দোষ? আমরা কি ঢেকুর ওটা ঠেকাতে পারি, কিংবা হাঁচি থামাতে?

(তোমার মনে পড়ল না যে বেশি নয়, মাত্র দশ-বারো বছর আগে তুমি নিজে

এর চেয়ে নিচের ধাপে ছিলে? এ-রকম গলি, এই ঘরে, তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সহজ ছিল।)

—ছিল, এখন নেই। দেখ, আমরা এক অভ্যাস থেকে অন্য অভ্যাসে উত্তীর্ণ হই। জন্মান্তরণের মতো। একদিন ওই অন্ধ-কূপের সঙ্গে এক হয়ে মিশেছিলুম, এ-ও যেমন ঠিক, তার থেকে বেরিয়ে এসেছি এ-ও ঠিক তেমনি। বাস্তব অবস্থা অকপটে স্বীকার করা চলে। দশ বছরের কামিজ বিশ বছর বয়সে যদি গায়ে না ঢোকে সে-দোষ কার? যার শরীর তার নিশ্চয়ই নয়—সময়ের।

পাশের ঘর থেকে ঘর্ঘর শব্দ আসছিল। সেদিকে কান রেখে বিজুমামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুললুম।

—পরিমল। বুকে কফ জমেছে, শ্বাসকষ্ট তাই সব সময় ওই রকম শব্দ হয়। এখন তো ঘুমোচ্ছে, তবুও।

থিকথিকে মেঝে মনে হয়, না জানি কতকালের জন্মানো শ্যাওলার তৈরি, ঘরের লেবেল রাস্তার চেয়ে বিঘত কয়েক নিচু, যেন একটা শুকনো চৌবাচ্চা—

(সরসিজ, আর বলো না। এরপর কী কী বলবে জানি। কড়িকাঠে উই, ছেঁড়া তোষক, দরজার কোণে ঝুল এইসব ত? না ভুল হবে না, কিন্তু বর্ণনা প্রাণও পাবে না। যে জীবনের তুমি এখন আর কেউ নও, তার ছবি আঁকতে যেও না।)

নিবুনিবু লণ্ঠনটা ঠকঠক করছিল. সেদিকে চোখ রেখে বললুম, পরিমলের অসুখ কতদিন থেকে মামীমা।

—আজ বাইস দিন।

—ডাক্তার কী বলছে?

—ঠিকমতো ডাক্তার দেখাতে পারছি কোথায় যে বলবে? হতভাগীর হাতে যে কিছু নেই। গলাখালি হাতখালি—ওর দিকে তাকানো যায় না সরসিজ। বিয়ের যা দু-চার ভরি সোনা দিয়েছিলুম, এই ক'বছরে সব ভেঙেছে।

—আপনি কবে এলেন মামীমা?

—বুধে বুধে আজ আট দিন। পেটের মেয়ে ত—খবর পেয়ে আর থাকতে পারলুম না। সরসিজ, তুমি ত জান, খুকু আমার কতখানি।

—মামীমা, জানি।

—হাতে যা ছিল, তাই কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে এলাম। এখানকার হালও ত তুমি জান! টুকু এবার পরীক্ষা দেবে—ফী জমা দেওয়া হয় নি।

—বুঝেছি মামীমা।

চোখে আঁচল চেপে বিজুমামী আমাকে আঁচলের ছেঁড়া দিকটা দেখালেন।

—সরসিজ, মেয়েদের ফ্রক সব ছিঁড়ে এসেছে। দুমাসের ঘরভাড়া বাকী—ছাব্বিশ দুগুণে বাহান্ন টাকা। এবেলা ভাত, ওবেলা রুটি, তাও মাসের সব রেশন তুলতে পারি

না। তবু, বিজুমামী বললেন, তবু খবর পেয়ে যা ছিল সব নিয়ে আসতেও হল। পরিমলের প্রাণ ত আগে। পরে আর সব কিছু।

আঁচলের খুঁট খুলে বিজুমামী একটা নোট বের করেছিলেন—দোমড়ানো পুরোনো। এক পা করে বিজুমামী এগিয়ে এসেছিলেন। স্থির দৃষ্টি, আমি পিছিয়ে যাচ্ছিলুম। টের পেয়েছিলুম কেন। বিজুমামী টাকাটা আমার হাতে গুঁজে দেবেন। দিলেনও। ওঁর হাত কাঁপছিল। ওঁর গলাও।

আমার হাতে আর কিছু নেই সরসিজ। দেখ যদি পরিমলের ইঞ্জেকসনটা এই নিয়ে এনে দিতে পার। ফিরে যাবার গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকাটাই অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

টাকাটা আমি নিই নি, নিতে পারিনি, চলে এসেছিলাম। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। আমার সেই গল্পটার কথা মনে পড়ল। 'ক্রোড়পত্র'।—ভিখিরি মেয়েটি কাপড় খুলে কোলের বাচ্চাটাকে জড়িয়ে দিয়েছিল।

(খুকু, মানে ঊষার সঙ্গে তোমার সেদিন দেখা হয় নি সরসিজ?)

—হয়েছিল লণ্ঠন ধরিয়ে ঊষাই পিছে পিছে এসেছিল। গলির মুখ পর্যন্ত।

সেখানে পৌঁছে আমি ফিরে দাঁড়ালুম। লণ্ঠনের আলো আর কালি ওর শরীরটাকে টুকরো-টুকরো করে ভাগ করে নিয়েছিল।—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার ঊষা? ঊষা হাসল। মুখ ফিরিয়ে নিল।—অসুখে ভুগে উঠলাম যে। তাছাড়া ওর এই অসুখ! রোজই এক রকম রাত জাগতে হয়।

মাথার ঘোমটা ছিল না ঊষার চুল উড়ছিল। লণ্ঠনের ফিতে কেঁপে কেঁপে ওর শরীরে, মুখে কাঁধে, গালে চোখে আলোছায়া আঁকছিল। আবার হাসল ঊষা। কী দেখছ, পেত্নীকে? এই ক'বছরে আমি একেবারে পেত্নী হয়ে গিয়েছি না?

বলা উচিত ছিল না, তুমি তেমনি আছ, কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম।

ঊষা হঠাৎ একবার মুখ টিপে হাসল।—তোমারা কিন্তু চেহারা ফিরেছে।

'তুমি আরও মোটা হয়েছ' ঊষা এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলল কিনা সেটা সাব্যস্ত করতে না পেয়ে আমি রুমালে মুখ মুছলাম। আমার শার্কস্কিন, আমার হাওয়াই শার্ট তখন আমার গায়ে ফুটছিল।

ঊষাকে বলতে শুনলুম, আমাদের এই গলিতে কিন্তু ট্যাক্সি মেলে না বুঝেছ। সারারাত দাঁড়িয়ে থাকলেও লাভ নেই।

অপ্রতিভ আমি ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়লুম। আবার আসব কি কাল আসব অথবা ওই রকমই একটা কিছু অস্পষ্ট গলায় বলে থাকব।

সে বলল, খাবার ঢাকা পড়ে রইল সরসিজ, কিছু একবার ছুঁলেও না?

বললুম, না। এই বারান্দায় বসে আমাকে সিগারেটটা শেষ করতে দাও।

সে হাসল। খুব বিশ্রী ভঙ্গিতে আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। অন্ধকার রঙের হাত আমার গলায়।—টিপে ধরবে নাকি!

তাকে, যার মুখ আমি তখন দেখছি না, কিন্তু সে আছে, আমাকে জড়িয়ে আছে, বলতে শোনা গেল, কী হবে শেষ করে। খানিকটা ছাই হয়ে থাকবে, খানিক ধোঁয়া হয়ে উড়বে। তাছাড়া এই দু-ঘণ্টায় সিগারেট কটা শেষ করলে বল দেখি? তার চেয়ে খাবারের ঢাকনা খোল, পেটে কিছু দাও।

—বলছি ত, আমার খিদে নেই।

—নেই কেন?

—কেন, তা তুমি জান। আমার মন খারাপ। ঊষাকে আজ যে দেখে এলাম। সে-ঘরে ঢুকলে হাল দেখে কেঁদে ফেলতে। জান, ঊষার স্বামী পরিমলের খুব অসুখ—বাঁচবার আশা নেই। ঊষার হাতে টাকা নেই; হাতে একগাছা রুলিও নেই। সে বলল, জানলুম। সরসিজ, তাই তোমার মন খারাপ?

তার বলার ঢঙ কেমন বাঁকা-বাঁকা।

বললুম, বলতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, ঊষা আমার কে তুমি জান না তাই এভাবে কথা বলছ। কী হতে পারত। একটা ভুলের কত বড় দাম তাকে আজ দিতে হচ্ছে।

হো-হো করে সে হেসে উঠল। সেই হাসি ভাঙা গ্লাসের অজস্র কাচের কুচির মতো আমাকে বিঁধল। হাসি থামিয়ে বলল সে—বুকে হাত দিয়ে বলত সরসিজ, সত্যিই তোমার মন খারাপ কিনা। তোমাকে ঠেলে পরিমলকে যে ঊষা বিয়ে করেছিল, সে যে সুখী হয় নি, আজ অন্ধকার ঘরে ধুঁকছে, এতে তুমি কি একটু খুশিও হও নি?

কোনো উত্তর দিলুম না। দিয়ে লাভ নেই। ও ইতর। ও অবিশ্বাসী। ঊষাকে ও বোঝে নি। বিজুমামীর কথা যদি ওকে বলি তাহলেই কি বুঝবে?

মেয়ের উপর বিজুমামীর টান, শেষ দশ টাকার নোটটাও আঁচলের খুঁট খুলে দেওয়া—একথা শুনেও হয়ত হো-হো করে হেসে উঠত।

(—সরসিজ, পরদিন সকালেই তো তুমি আবার ওখানে গিয়েছিলে?)

—গিয়েছিলুম। ট্যাক্সিটা সেদিন আর গলির ভিতরে নিলুম না, হাতে ওষুধ, পকেটে ফল, ধুতির কোঁচা সব সামলে ঊষাদের ঘরের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। চারধারের বাড়িগুলো তখন কাঁচা কয়লায় আগুন দিয়েছে।

দরজা খুলে আজও দাঁড়ালেন বিজুমামী।

—পরিমল কেমন আছে মামীমা?

—একই রকম। এস।

দিনের যতটুকু আলো ভিতরে ঢোকার পারমিট পেয়েছিল তাতেই ঘরের দরিদ্র চেহারা অত্যন্ত প্রকট; বর্ণনা দিতে চাইনে। পুরোনো গামছা, ছেঁড়া লুঙ্গি, দেয়ালের

দাগ, নোংরা তোষক, মাছি, এসব ত ছিলই, থাকবেই। আগের দিনের মোড়াটাকে খুঁজে পেয়েছিলুম। পরণে ধুতি-পাঞ্জাবী; তাই আজ বসতে অসুবিধে হয় নি।

ওষুধটা বিজুমামীর হাতে তুলে দিলুম। ফলের ঠোঙাটাও। বিজুমামীর মুখ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সেটা তিনি লুকোতেও চেষ্টা করলেন না।

পাশের ঘর থেকে ঘর্ঘর শব্দ উঠছিল। আমার কান কোন দিকে আন্দাজে সেটা ধরে নিয়ে বিজুমামী বললেন—কাল সারারাত ওই রকম কেটেছে। মা মেয়েতে মিলে পালা করে রাত জেগেছি। মেয়েটাকে সরিয়ে একবার আমি বসেছি আর ভগবানকে ডেকেছি—এই রাতটুকু কোনরকমে পার করে দাও। এ-ঘরে মেয়েটা তখন মাথা ঠুকে ঠুকে কপালের রক্ত বের করছে, ও-ঘরে রুগীর গোঙানি—সে কি বিভীষিকা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না বাবা।

বিজুমামী একবার থামলেন।

—মাঝে মাঝে খুকু ছুটে এ-ঘরে আসছিল। ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ দুটো যেন জ্বলে, কাল ত দেখেছ। কপাল রক্তে মাখামাখি করে ফেলেছে। আমি বুকে হাত বুলিয়ে দিয়েছি পরিমলের, বেডপ্যান দিয়েছি, তবু খুকুকে রুগীর পাশে বেশি থাকতে দিই নি। দেখেছ ত ওর শরীরের হাল—খান কয়েক হাড় ছাড়া কিছু নেই। কপালে যা আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তবু চোখের সামনে যতক্ষণ আছি, আগলে রাখি। সরসিজ, হাজার হলেও আমি ত মা!

আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। মামীর চোখের কোলে কালি। চুলগুলো খড়িগোলা জলে ধোওয়া। বলে উঠলুম, আপনারও ত শরীর ভালো নয় মামীমা! এভাবে রাত জাগলে যে আপনিও পড়বেন!

বিজুমামী হাসলেন। হাসিকান্না মেশানো একটা জলছবির ছাপ ছড়িয়ে গেল ওর মুখে।—আমাকে বাদ দাও। আমি ত হিসেবের বাইরে গেছি। ডাক আজও আসতে পারে কালও পারে। না হয় আজই এল। তবু জেনে যাব, আর ভয় নেই, হতভাগীকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

(সরসিজ, ওই একটা কথায় বিজুমামীকে তুমি নতুন আলোয় দেখতে পেলে?)

—পেলাম। সেই মুহূর্তে বিজুমামীকে আর গরীব মনে হয় নি। ভাগ্যের ফেরে, অভাবের টানা-পোড়েনে সব খুইয়েছেন বিজুমামীরা—তবু বাঁচিয়ে যেটুকু রাখতে পেরেছেন, তার দামও কম নয়। এই আর একটা জীবন—এখানে একজন আর একজনের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়াতে পায়, দুটি হালকা তাস যেমন পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে খাড়া থাকে। রোগীর জন্যে ভাড়াকরা নার্স রাখার উপায় এদের নেই বটে, কিন্তু থাকলেও রাখতো না। এই জীবন একদিন আমি চিনতাম। আবার চিনলাম।

চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মামীমা, ঊষা এখন কোথায়?

বিজুমামী বললেন, ঘুমুচ্ছে। সারারাত এঘর-ওঘর ছুটফট করার পর এই খানিক

আগে চোখের দুপাতা এক করতে পেরেছে। ওকে আর তুলে দিই নি। ঘুমোক। সব ঘুমই তো জন্মের মতো ঘুচতে বসেছে।

বাইরে, বোধহয় গলির মুখে একটা কুকুর অনেকক্ষণ ধরে সুর করে কাঁদছিল। আঙুল দিয়ে সেদিকে ইশারা করে বিজুমামী ফিসফিস করে বললেন, ওই শোনো। রোজ ডাকে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, মাঝ-রাত্তিরেও। কখন একেবারে দরজার বাইরে উঠে আসে। এ-ডাক ভারি অলক্ষুণে! পরিমল বোধহয় আর বাঁচবে না বাবা!

কী হলো, ওই একটা কথা আমাকে নিজের কাছে খুব অপদার্থ, অসহায় করে দিল। কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে গলায় সব জোর ঢেলে বললুম—বাঁচবে মামীমা। আমরা বাঁচাবো।

কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে বিজুমামী আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বললাম—বাঁচাবো মামীমা। আমাদের যতটুকু সাধ্য ততটুকু করবো। মামীমা,—একবার কেশে গলা থেকে সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বললাম,—মামীমা, কিছু মনে করবেন না। হাতে আমারও বিশেষ কিছু নেই, জানেনই তো আজকাল লক্ষ্ণৌ থাকি, এ কদিনে হোটেলে অনেক খরচা হয়ে গেছে। তবু সামান্য কিছু ওর জন্য ওষুধ, ফল, চিকিৎসা বাবদ দিয়ে যেতে চাই।

পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলুম। বিজুমামী হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করলেন। স্পষ্টতই উনি অভিভূত। ওঁর চোখ ছলছল করছিল। হাত তুলে বললেন,—বাবা দাঁড়াও। না—না আমাকে নয়। খুকুকে ডেকে আনি। যা দেবার তুমি নিজের হাতে ওকেই দাও। তবু খুকু জানবে, ও একেবারে একা নয়, ওর পাশে দাঁড়াবার বন্ধু আছে।

বিজুমামী একরকম ছুটে ভিতরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। মুখে কয়েকটি রেখা ফুটলো। একবার ফিরে আমার চোখের দিকে চাইলেন। সেই ছবিটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কী যেন বলবেন মামীমা, কী একটা কথা যেন ঠোঁটের কোণে এসে শুকিয়ে যাচ্ছে।

বিজুমামী ফিরে আমার কাছে এসেছেন, যতটা আসা যায়। সরসিজ (মামীমাকে খুব নিচু গলায় বলতে শুনলাম), সরসিজ, কত?

প্রথমে মানে বুঝি নি, পরে আরও একবার বিজুমামী যখন আবার একই গলায় বললেন, কত? তখন সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হল। সেই কুকুরটা তখনও ডাকছিল। ফিনফিনে পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে একটা নোট বের করলাম। একশো টাকা। বলতে গেলাম, মামীমা আপাতত—

কথাটা শেষ করা হলো না।

—এ—ক—শো! পলকে বিজুমামীকে বদলে যেতে দেখলাম, গলার স্বরও তাঁর বলে চেনা কঠিন।

—এ—ক—শো টাকা! বিজুমামী ফেঁসে যাওয়া গলায় বলছিলেন, সবটাই ওকে

দেবে বাবা! তারে চেয়ে ভাঙিয়ে এনে দাও—আমি—আমি—আমাকেও কিছু দেবে না?

আগুনের মুখে ধরা কাগজের মতো বিজুমামী একটু-একটু করে লোভে কুঁকড়ে যেতে থাকলেন। একশো টাকা—এই একটা শব্দ যেন স্টিমারের মতো নদীর বুক চিরে সিঁথি তৈরি করে দিয়ে চলে গেল। একদিকে উষা, তার অপরিচ্ছন্ন ছোট ঘর, মরণাপন্ন স্বামীর অভাব, আসন্ন বৈধব্য; অন্যদিকে বিজুমামীর নিজের সংসার—বাকি বাড়িভাড়া, মেয়েদের ফ্রকের কাপড়, রেশন—যে সংসারকে বিজুমামী স্নেহে অন্ধ হয়ে ভুলে ছিলেন। দুটো স্পষ্ট দুভাগ হয়ে গেল।

(—'ক্রোড়পত্র' গল্পটা, সেই ভিখারিণী মেয়ের কাহিনীটা খুঁজে পেলে তুমি কী করতে?)

—ছিঁড়ে ফেলতাম।

সে বলল, হুঁ। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। ওর মুখের রহস্যময় হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছিল। শেষে আস্তে আস্তে বলল, সরসিজ, তুমি শুধু বিজুমামীকেই দেখলে, ঘরটার দিকে তাকালে না? আসল চাবিকাঠি তো ওই ঘরেই! একটা খাটিয়া ফেললে যে ঘর জুড়ে যায়, সেই ঘরে কতবড় মাপের মন ধরে?—এ—হিসাব জানা যদি না থাকে সরসিজ, তবে এ-গল্প তুমি লিখতে যেও না।

ছায়াহরিণ, ১৯৬১

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩)
যুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের নিপুণ রূপকার। মননধর্মী এই লেখক হৃদয়বৃত্তির বিশ্লেষণে নিজস্ব পথ অনুসরণ করেন। তাঁর ভাষারীতিও নিজস্ব। মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের রূপায়ণে নিপুণ। তাঁর গল্প-উপন্যাসে কেবল সমকালীন সমাজের ভুল-ত্রুটিই মুখ্য নয়, মানবজীবনে প্রকৃতির প্রবল ভূমিকাও স্বীকৃত।

গাছ

একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ। গাছটা সুন্দর কি অসুন্দর কেউ প্রশ্ন তোলে নি।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রয়োজন আছে কি নেই তা কেউ মাথা ঘামায় না।

যেমন মানুষ মাথার ওপর আকাশ দেখে মেঘ দেখে, পায়ের নিচে ধুলো দেখে ঘাস দেখে, তেমনি তারা চোখের সামনে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখছে। সন্ধ্যায় দেখছে, দুপুরে দেখছে, সকালে দেখছে। কেবল চোখ দিয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভূতি দিয়ে দেখা নয়, বোঝা নয়।

বা এমন করে একটা গাছকে বুঝতে হবে কেউ কোনদিন চিন্তাও করে না।

দিনের পর দিন যায়, ঋতুর পরে ঋতু কাটে, বছরের পর বছর যায় আসে—গাছের জায়গায় গাছ দাঁড়িয়ে।

বর্ষায় পাতাগুলি বড় হয়, পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই সবুজ-কালো গভীর রং ধুসর হয়ে ওঠে। তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নীরক্ত প্রসূতির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। গাছ বিরক্ত হয়।

তখনও গাছ গাছ থাকে।

গাছের চেহারা তখন শুধু কাঠের চেহারা হয়।

ছোট কাঠ বড় কাঠ চিলতে কাঠ সরাকাঠ পাতলা চিকন মানুষের আঙুলের মতো টুকরো-টুকরো অজস্র কাঠ—কাঠির একটা জবরজং কাঠামো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু তা বলে কি মানুষ তখন তার ওপর রাগ করে? করে না। কারণ মেঘমেদুর আকাশের নিচে অরণ্যের চেহারা ধরে গাছ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তাকে যে চোখে দেখে শীতের শুকনো আকাশের নিচ সরু মোটা কতগুলি কাঠ-কাঠির বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও মানুষ তাকে সেই চোখে দেখে। তাই বলছিলাম ওপর-ওপর দেখা। মন দিয়ে দেখা নয় বোঝা নয়। তাহলে ফাল্গুনে লালে সবুজে মেশানো নতুন পাতার সমারোহ দেখে মানুষ নাচত অথবা বৈশাখ পড়তে অজস্র মঞ্জরী মাথায়

নিয়ে গাছটা আশ্চর্য গোলাপী আভায় আকাশ আলো করে তুলেছে দেখে আনন্দে চিৎকার করতো। তা কেউ করে না, এ পর্যন্ত করে নি।

দু-তিনটে বাড়ির মাঝখানে এক ফালি পড়ো জমির ওপর একটা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাদের একটু সুবিধা হয়, এই শুধু তারা জানে। এ-বাড়ির মানুষ জানে ও-বাড়ির মানুষ জানে, আশেপাশের আরো গোটা দু-তিন বাড়ির মানুষগুলিও একটু-আধটু সুবিধা আদায় করতে গাছের কাছে আসে বৈ-কি, যেমন সকাল হতে খবর-কাগজ হাতে করে দু-চারজন প্রৌঢ় বুড়ো গাছতলায় একত্র হয়ে রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি আলোচনা করে, যেমন দুপুরের দিকে এ বাড়ির বুড়ি ও-বাড়ির বুড়ি, এ বাড়ির বৌ ও-বাড়ির মেয়েকে গাছের নিচে সরু গালিচার মতন ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে রান্নার কথা সেলাইয়ের কথা ছেলে-হওয়ার কথা ছেলে না হওয়ার কথা বলে সময় কাটায়, আর বিকেল পড়তে ছুটে আসে ছেলে-ছোকরার দল। গাছটাকে ঘিরে হৈ-হল্লা ছুটোছুটি, গাছে উঠে ডাল ভাঙা পাতা ছেঁড়া, বা কোনোদিন গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া।

বা শীতের দুপুরে গাছের ছায়ায় মাথা রেখে শরীরটা রৌদ্রে ছড়িয়ে দিয়ে কারো-কারো গল্পের বই পড়া। আবার গ্রীষ্মের রাত্রে ঠিক এই গাছের তলায় শীতল পাটি বিছিয়ে হ্যারিকেন জ্বেলে পাড়ার পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে তাস খেলছে এই দৃশ্যও চোখে পড়ে।

যখন মানুষ থাকে না তখন গাছতলায় ছাগলটাকে গরুটাকে মাথা গুঁজে মনের আনন্দে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখা গেছে।

আর ওপরে নানাজাতের পাখির কিচিরমিচির কলরব, ডানা ঝাপটানো, ঠোঁটে ঠোঁট ঘসার শব্দ।

আর মাঝে মাঝে হাওয়ায় পাতা নড়ে, ডাল দুলে ওঠে।

বা এমনও এক-একটা সময় আসে যখন পাখি থাকে না, বাতাস নেই। গাছ স্থির স্তব্ধ। পড়ো জমিতে নিবিড় ছায়াটুকু পেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যেন যুগ-যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বা মনে হয় কোনো দার্শনিক। নীরব থেকে অবিচল থেকে জগৎটাকে দেখছে। সংসারের উত্থান-পতন লক্ষ্য করছে। পাপের জয় পুণ্যের পরাজয় দেখে বিমূঢ় বিস্মিত হয়ে আছে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয়। চিন্তাশীল মানুষ চুপ করে থাকে। সত্যি গাছটাকে সময় সময় এমন একটি মানুষ বলে কল্পনা করা যায়। তখন তার ধারে কাছে অন্য মানুষ পশুপাখি হাওয়ার চাপল্য কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

হয়তো এমন করে কেউ গাছটাকে দেখছিল গাছটাকে নিয়ে ভাবছিল। এতদিন জানা যায় নি, এতদিন বোঝা যাচ্ছিল না। কে জানে হয়তো গাছটার সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল, গাছ বুঝতে পারছিল পূবদিকের একটা বাড়ির সবুজ জানালায় বসে একজন

তাকে গভীরভাবে দেখছে লক্ষ্য করে। না, আগে হয়তো সে আর দশটি মানুষের মতো সাদা চোখে গাছের পাতা ঝরা দেখত, নতুন পাতা গজানো দেখত। এখন আর তার চোখ সাদা নেই। কাজল পরে গভীর কালো হয়েছে। এখন আর হাল্কা বেণী ঝুলিয়ে ফ্রক উড়িয়ে সে ছটফট করছে না যে, বাড়ির সামনে পড়ো জমিতে একটা গাছ আছে কি বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে ওপর-ওপর দেখে শেষ করবে। এখন সে শান্ত গম্ভীর মাথায় দৃঢ়বদ্ধ সংযত কঠিন খোঁপার মতো তার মনও বুঝি সতর্ক সুসংবদ্ধ স্থির ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। আর সেই নিবিড় মন সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ সে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছটাকে নিয়ে ভাবছে। যেন ভাবতে ভাবতে একদিন তার দৃষ্টি কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চোখের কালো পালকগুলি আর নড়ছে না, কালো মণি দুটি পাথরের মতো স্থির কঠিন হয়ে আছে। গাছ বুঝতে পারল একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে, ওই কালো পালক-ঘেরা চোখ দুটোর তাকানোর মধ্যে কেবল ভয় না, বিদ্বেষও যেন মিশে আছে। গাছ ভয় পেল, দেখল, কেবল দিনের আলোয় না রাত্রির গভীর অন্ধকারেও দুটি চোখ জানালায় জেগে আছে। নিরাকার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হয়ে রাত্রির গাঢ় তমসায় লুকিয়ে থেকেও যেন গাছ ওই দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। আতঙ্কের সঙ্গে পুঞ্জ ঘৃণা ছুঁড়ে দিচ্ছে একজন তার দিকে।

তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। বুঝি সবুজ জানালার ওই মানুষটি সকলকে জানিয়ে দিল।

এই গাছ দুষ্ট। এই গাছ শয়তান। একে এখান থেকে সরিয়ে দাও।

পড়ো জমির আশে পাশের মানুষগুলি সজাগ হয়ে উঠল।

মানুষের মতো শয়তান হয়ে একটা গাছ মানুষের মধ্যে মিশে থাকতে পারে তারা এই প্রথম শুনল, জানল।

তাই তো, সকলে ভাবতে আরম্ভ করল, বুড়োর দল গাছের নিচে বসে পলিটিক্স আলোচনা করে, বুড়িরা যুবতীদের সঙ্গে বসে ছেলে হওয়া না হওয়ার গল্প করে, ছেলে-ছোকরার দল গাছের কাছে এসে খেলা করে; এমন গাছটা যদি ভালো না হয় যদি তার মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে তবে তো—

কেটে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে দিতে হবে, মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেললে সবচেয়ে ভালো হয়। সাদা ফুলের মালা জড়ানো স্ফীত শক্ত খোঁপা নেড়ে জানালার মানুষটি বলল, তা না হলে এই গাছ কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না।

সবাই শুনল, সবাই জানল।

শিশুরা খেলা করে। এই গাছের একটা বড় ডাল তাদের মাথায় ভেঙে পড়তে কতক্ষণ! বজ্রপাত হতে পারে এই গাছের মাথায়। আর নিচে তখন যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে তার অবধারিত মৃত্যু। অর্থাৎ গাছই বজ্রকে ডেকে আনে।

শয়তান কী না পারে। শুনে মানুষগুলির চোখ বড় হয়ে গেল।

কিন্তু সেই সবুজ জানালার মানুষটি চুপ করে থাকল না। গাছ সম্বন্ধে এতকাল যারা উদাসীন ছিল তারা আরও ভয়ঙ্কর কথা শুনল।

কেবল বজ্র কেন, শয়তান মধ্যরাত্রে যে কোনো একটি মানুষকে ডেকে নিজের কাছে আনতে পারে।

হুঁ, সকালে উঠে সবাই দেখবে সেই মানুষ ওই গাছের কোন না কোন একটা ডালে ঝুলছে।

গলায় দড়ি দেবার পথে গাছের ডাল যে একটি চমৎকার অবলম্বন, কথাটা নতুন করে সকলের মনে পড়ে গেল।

ওই গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, সম্ভব হলে মূলশুদ্ধ।

হয়তো গাছের জানা ছিল না, পড়ো জমির পশ্চিম দিকের আর একটা বাড়ির লাল রঙের জানালায় বসে আর একজন তাকে গভীর ভাবে দেখছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে গাছ চমকে উঠল। এবং খুশি হল। লাল রঙের জনালার মানুষটির চোখ দুটি বড় সুন্দর। সেই চোখে ভয় আতঙ্ক ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই নেই। আছে স্নেহ প্রেম মমতা সহানুভূতি। দেখে গাছ বিস্মিত হল। কেননা কদিন আগেও মানুষটির দৃষ্টি অশান্ত ছিল, চলায় বলায় চাপল্য ছিল। হাফ প্যান্ট পরে সময়ে অসময়ে তার কাছে ছুটে এসেছে, ঢিল ছুঁড়েছে ডাল-পাতা লক্ষ্য করে, পাতার আড়ালে পাখির বাসা খুঁজে বার করে ভেঙে দিয়েছে, আর যখন তখন দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছে। আজ সে মার্জিত ভদ্র স্নিগ্ধ সুন্দর। আদ্দির পাঞ্জাবির হাত দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে দুহাতের তেলোয় চিবুক রেখে জানালার ধারের টেবিলের কাছে বসে গাছের দিকে গাঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ নাকের কাছে তুলে গন্ধ শোঁকে, যেন গাছটাকে যত দেখছে যত ভাবছে তত সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, আনন্দিত হচ্ছে। যেন গাছকে নিয়ে ভাবনার সঙ্গে গোলাপের গন্ধের একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। বুঝি গাছ তার কাছে গোলাপের মতো সুন্দর।

গাছ নিশ্চিন্ত হল, আশ্বস্ত হল। লাল জানালার মানুষটার মুখে সবাই অন্য কথা শুনল।

এই গাছ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গাছের নিচে সকালে বিকালে মানুষগুলি একত্র হয়। একটি মানুষকে আর একটি মানুষের মনের কাছে টেনে আনছে গাছটা। তার অর্থ আমাদের সামাজিক হতে শেখাচ্ছে। গাছটা আছে বলে ছেলেরা খেলাধূলা করতে পারে। মায়ের মতো শিশুদের স্নেহ ও আনন্দ বিতরণ করছে মাঠের ওই বনস্পতি।

সত্যি সে সুন্দর।

তার ছায়া সুন্দর, ডাল সুন্দর। তাই না নিরীহ সুন্দর পাখিগুলি তাকে আশ্রয় করে

সারাক্ষণ কূজনগুঞ্জন করছে। প্রজাপতি ছুটে আসছে।

পাড়ার মানুষগুলি নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল।

পশ্চিমের লাল জানালার সুন্দর মানুষটি সেই খানেই চুপ করে থাকল না।

ইঁট, লোহা, সিমেণ্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাই নি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।

তবে কি লাল জানালার মানুষটি কবি? গাছ ভাবল। রাত্রে জানালার ধারে টেবিলে বসে মানুষটি কাগজ-কলম নিয়ে কি যেন লেখে, যখন লেখে না চুপ করে বাইরে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মন্দ কথা শুনে মানুষ যেমন বিচলিত হয় তেমনি ভালো কথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হয়, খুশি হয়।

তাই একজন গাছটাকে মন্দ বলাতে মানুষগুলি যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, আবার আর একজন গাছ তাদের অনেক উপকার করছে শুনে শান্ত হল।

তাই তারা গাছ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু পূবের জানালার মানুষটি চুপ করে থাকলো না। গাছ শুনল, দাঁতে দাঁত ঘসে সে প্রতিজ্ঞা করছে, যদি আর কেউ তাকে সাহায্য না করে তো সে নিজেই কুড়ুল চালিয়ে গাছটাকে শেষ করে দেবে। এই গাছ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। শয়তানকে চোখের সামনে থেকে যেভাবে হোক দূর করবে।

গাছ শুনে দুঃখ পেল, আবার মনে মনে হাসল। যেন পূবের জানালার মানুষটিকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে হল, তোমার খোঁপায় ফুলের মালা শোভা পায়, তোমার চোখের কাজল, কপালের কুমকুমটি চমৎকার, তোমার হাতের আঙুলগুলি চাঁপার কলির মতো সুন্দর! সুন্দর ও নরম, এই হাতে কুড়ুল ধরতে পারবে কি?

যেন পশ্চিমের জানালার মানুষটির কানেও কথাটা গেল। তার সুন্দর আঙুলগুলি কঠিন হয়ে উঠল। গাছের বেশ জানা আছে ওই হাত, হাতের আঙুল দরকার হলে ইস্পাতের মতো দৃঢ় দৃপ্ত হতে জানে। আজ ওই দিয়ে সে কবিতা লিখছে বটে, গোলাপফুলকে আদর করছে—একদিন এ হাতে ঢিল ছুঁড়ে সে অনেক পাখির বাসা তছনছ করে দিয়েছে, গাছের ডাল ভেঙেছে, পাতা ছিঁড়েছে আর রুদ্রের মতো হাতের দুটো মুঠো কঠিন করে দোলনার দড়ি আঁকড়ে ধরে দানবশিশুর মতো দোল খেয়েছে। তাই বুঝি আজ বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে সে প্রতিজ্ঞা করলো, এই গাছেকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে। যদি কেউ এই গাছ নষ্ট করতে আসে তাকে ক্ষমা করবে না। জীবন থেকে কবিতাকে নির্বাসন দেওয়া চলে না। যদি কেউ গাছের গায়ে হাত তুলতে

আসে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে তাঁকে প্রতিহত করবে। গাছের গায়ে আঁচড়টি পড়তে দেবে না।

গাছ নতুন করে ভয় পেল! তাকে কেন্দ্র করে পূব ও পশ্চিমের জানালার দুটি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে না তো!

সেদিন দুপুর গড়িয়ে গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে একটা ছাগল নিচের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খেল। বিকেল পড়তে শিশুর দল হুটোপুটি করলো। অগুন্তি পাখির কিচির-মিচির করে উঠে তারপর এক সময় চুপ হয়ে গেল। রাত্রি নামল। নির্মেঘ কালো আকাশ অসংখ্য তারা ফুটল। হাওয়া ছিল। গাছের পাতায় সর-সর শব্দ হচ্ছিল। রোজ যেমন হয়। পড়ো মাঠের চারপাশের বাড়িগুলিতে নানা রকম শব্দ হচ্ছিল, আলো জ্বলছিল। ক্রমে রাত যত বাড়তে লাগল এক একটি বাড়ি চুপ হয়ে যেতে লাগল, আলো নিভল। তারপর চারদিক নিঃসীম অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার আর অমেয় স্তব্ধতা। মাথার ওপর কোটি-কোটি নক্ষত্র নিয়ে গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় হাওয়াটাও মরে গেল। গাছের একটি পাতাও আর নড়ছিল না।

এমন সময়।

নিরন্ধ্র অন্ধকার দিনের আলোর মতো গাছ সব কিছু দেখতে পায়। গাছ দেখল পূবদিক থেকে সে আসছে। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে বেঁধেছে। মালাটা খোঁপা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে। যেন যুদ্ধ করতে আসছে। এখন আর ফুলের মালা নয়। হাতে ধারালো কুঠার। গাছ শিউরে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে মানুষের পায়ের শব্দ হল। গাছ সেদিকে চোখ ফেরাল। এবার গাছ নিশ্চিন্ত হলো। সে এসে গেছে। পশ্চিমের জানালার সেই মানুষ এসে গেছে। তার হাতে এখন কলম নেই। একটা লাঠি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি নেই। হাতকাটা গেঞ্জি। তার চোয়াল শক্ত। দৃষ্টি নির্মম। যেন এখনি সে বজ্রের হুংকার ছাড়বে।

গাছ কান পেতে রইল।

বিষণ্ণ স্তব্ধতা। অনিশ্চিত মুহূর্ত।

গাছের মাথায় একটা পাখির ছানা কিচমিচ শব্দ করে উঠল। যেন কোনদিক থেকে একটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভেসে এল। আকাশের এক প্রান্তের একটা তারার কাছে ছুটে গেল। একটু হাওয়া উঠল বৈ কি। নরম শাখাগুলি দুলতে লাগল।

যেন ভিতরে ভিতরে গাছ এমনটা আশা করেছিল। তাই খুব একটা অবাক হল না।

শাড়ি-জড়ানো মানুষটির অধরে হাসি ফুটেছে।

পশ্চিমের জানালার মানুষের শক্ত চোয়াল নরম হয়েছে। বজ্রনির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে না।

একজন আর-একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মাঝখানের ব্যবধান এত কম যে গাঢ় অন্ধকারেও তারা পরস্পরের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। যেন একজন আর একজনের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনছিল।

'হাতে কুড়ুল কেন?

'গাছটাকে কাটব।'

'লাভ কি?'

'গাছটা শয়তান।'

'গাছটা দেবতা।'

'শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্খ।'

'দেবতাকে যে শয়তানের মতো দেখে সে পাপী। তার মনে পাপ তার হৃদয়ে হিংসা। তাই সাদাকে কালো দেখে—আলো থাকলেও তার চোখে সবকিছু অন্ধকার।'

'তবে কি পৃথিবীতে অন্ধকার বলতে কিছু নেই? কালো বলতে কিছু নেই?'

'নেই।'

'এ কেমন করে সম্ভব ' হাত থেকে কুড়ুলটা খসে পড়ল ওর। ভাবতে লাগল। গাছ খুশি হল। গাছ দেখল একজন কুড়ুল ফেলে দিল, আর একজন হাতের লাঠি ফেলে দিল। 'এ কেমন করে হয়!' ভাবতে ভাবতে পূবের জনালার মানুষটি মুখ তুলে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তারার ঝিকিমিকি দেখতে লাগালো। তারপর এক সময় বিড়বিড় করে বললো, 'সব আলো সব সুন্দর—কিছু কালো নেই, কোথাও অন্ধকার নেই,—এমন কখনো হয়?'

'নিজের ভিতরে যখন আলো জাগে।'

'সেই আলো কী?'

'প্রেম।'

মেয়েটির চোখের পাতা কেঁপে উঠল। গাঢ় নিশ্বাস ফেললো তার গলার স্বর করুণ হয়ে গেল।

'আমার মধ্যে কি প্রেম জাগবে না?'

'অভ্যাস করতে হবে, চর্চা করতে হবে।' ছেলেটি সুন্দর করে হাসল। ভালোবাসতে শিখতে হবে।'

'তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

গাছ চোখ বুজলো। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারে নি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।

অমৃত, নববর্ষ সংখ্যা, মে ১৯৭০

সমরেশ বসু (১৯২১-১৯৮৮)
জন্ম ঢাকায়। মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও সহানুভূতি অপরিমেয়। কেবল মানুষ নয়, প্রকৃতিও তাঁর উপজীব্য। ভ্রমণধর্মী কাহিনী লেখেন 'কালকূট' ছদ্মনামে। গান রচনা করতেন, গাইতে পারতেন। মানিক ও তারাশংকরের যুগ্ম প্রভাবে লালিত সমরেশ বসু নিজস্ব পথের শিল্পী। তিনি জীবনকে জেনেছেন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

প্রাণ-পিপাসা

এক কৃষ্ণপক্ষের দুর্যোগময়ী রাতের কথা বলছি।

দুর্যোগটা হঠাৎ মেঘ করে হাঁক-ডাক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে মুসলধারে দু-এক পসলা হয়ে যাওয়ার মতো নয়। একঘেয়ে রুগ্ন গলার কান্নার মতো কয়েকদিন ধরে অবিরাম ঝরছেই বৃষ্টি, তার সঙ্গে পূব হাওয়ার একটানা ঝড়। শহরতলির বড় সড়কটি ছাড়া আর সব কাঁচা গলিপথগুলো সুদীর্ঘ পাঁক-ভরা নর্দমা হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধ আর আবর্জনার ছাওয়া! অসংখ্য বাড়ির ভিড়, ঠাসা, চাপাচাপি।

পথ চলছিলাম রেল-লাইনের ধারে মাঠের পথ দিয়ে। কিন্তু ভিজে ভিজে শরীরের উত্তাপটুকু আর বাঁচে না। হাওয়াটা মাঠের উপর দিয়ে সরাসরি এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল শরীরটা। রীতিমতো দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। বে-গতিক দেখে বাঁয়ে মোড় নিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। অন্তত হাওয়ার ঝাপটাটা কম লাগবে তো'

একটা নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে-পড়া ভাব চটকল শহরটার। যেন কাজ এবং চাঞ্চল্য সবটুকু এই অবিরাম বৃষ্টিটি ভিজিয়ে ন্যাতা করে দিয়েছে। কুকুরগুলো অন্যদিন হলে বোধহয় তেড়ে এসে ঘেউ-ঘেউ করতো। আজ দায়সারা গোছের এক-আধবার গরর-গরর করে গায়ের থেকে জল ঝাড়তে লাগলো। গেরস্তদের তো কোনো পাত্তাই নেই। কোনো জানালা-দরজায় একটি আলোও চোখে পড়ে না। রাস্তার আলোগুলো যেন কানা জানোয়ারের মতো স্তিমিত এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে, কিন্তু অন্ধকার তাতে কমে নি একটুও।

রাস্তাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, তবে উত্তর দিকেই চলেছি তা বুঝতে পারছি। একটা ধার ঘেঁসে চলেছি রাস্তার। নিচু রাস্তা, জল জমেছে। কোনও বারান্দায় যে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেব তার কোনো উপায় নেই। কারণ বারান্দা বলতে যা বোঝায়, এখানে সে-রকম কিছু ঠিক চোখেও পড়ছে না আর বস্তিগুলোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভেতরে ঘরগুলোও বোধহয় শুকনো নেই। তা ছাড়া, অবস্থাটা তো নতুন নয়। জানা আছে, সেখানে শুয়ে পড়লে লোকজনও নানান কথা বলতে পারে।

পুলিসের বেয়াদপি তো আছেই তার উপর।

যেতে হবে নৈহাটি রেল-কলোনীর এক বন্ধুর কাছে। অন্তত কয়েকটা দিনের খোরাক, শুকনো কাপড় একখানি আর এমন বিদঘুটে প্যাঁচপেচে ঠাণ্ডা রাতটির জন্য একটু আশ্রয় তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখছি আড্ডা ছেড়ে না বেরুনোই ভালো ছিল। তবে উপায় ছিল না বিশেষ করে, কয়েকদিন আগে আমাদের আড্ডার হা-ভাতে বন্ধুদের মধ্যে একজন মরে গেল, তখন থেকেই একটু নিশ্বাস নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়বো ভাবছিলাম। বন্ধুটির মরা হয়তো ভালোই হয়েছে। তাছাড়া আর কী হতে পারত, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। বাঁচার জন্য যা দরকার তার কিছুই তো ছিল না, তবু বুকটার মধ্যে...যায়। ওটা কোনো কথা নয়। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়ে গেছে, ছোট্ট জিনিস অথচ মনে হয় পর্বতপ্রমাণ তার ভার আর কষ্টকর। বোঝাটা হলো...

আরে বাপরে, হাওয়াটা যেন শিরদাঁড়াটার ভিত ধরে নাড়া দিয়ে গেল। জলটাও বেড়ে গেল। হঠাৎ। এতক্ষণ পরে মেঘের গড়গড়ানিও শোনা যাচ্ছে। এবার আর দাঁত নয়, রীতিমতো হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। গাছের মরা ডালের মতো ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গেছি। এসে পড়লাম একটা চৌরাস্তার মোড়ে, চটকলের মাল-চালানোর রেল সাইডিংয়ের পাশে। জায়গাটা একটু ফাঁকা। একটা মোষের খাটাল দেখে ঢুকব কি না ভাবতে ভাবতে আর একটু এগোতেই হঠাৎ একটা ডাক শুনতে পেলাম, এই যে, এদিকে।

না, অশরীরী কিছু বিশ্বাস না করলেও ভয়ানক চমকে উঠলাম। আমাকে নাকি? জলের ধারা ভেদ করে গলার স্বরের মালিককে খুঁজতে লাগলাম। ডানদিকে একটা মিটমিটে আলোর রেশ চোখে পড়লো আর আধ-ভেজানো দরজায় একটা মূর্তি। হ্যাঁ, মেয়েমানুষ। তাহলে আমাকে নয়। এগুচ্ছি। আবার : কই গো, এসই না।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে? জবাব এলো, তা ছাড়া আর কে আছে পথে?

কথার রকমটা শুনে চমকে উঠলাম। ও! এতক্ষণে ঠাওর হলো পথটা খারাপ। ঠিক বেশ্যাপল্লী নয়, তবে একরকম তাই, মজুরবস্তিও আছে আশেপাশে ধার ঘেঁষে।

আমি মনে মনে হাসলাম। খুব ভালো খদ্দেরকে ডেকেছে মেয়েটা! তাই ভেবেছে নাকি ও? কিন্তু সত্যি, এ সময়টা একটু যদি দাঁড়ানোও যেত ওর দরজাটায়। তবু আমাকে যেতে না দেখে মেয়েটা বলে উঠলো, কী রে বাবা, লোকটা কানা নাকি?

মনে মনে হেসে ভাবলাম, যাওয়াই যাক না। ব্যাপার দেখে নিজেই সরে পড়তে বলবে। আর কোনরকমে বৃষ্টির বেগটা কমে না আসা পর্যন্ত যদি মাথার উপরে একটু ঢাকনা পাওয়া যায়, মন্দ কী! এমনিতেও নৈহাটি দূরের কথা, মোষের খাটালের বেশি কিছুতেই এগোনো চলবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম—প্রবাদে যারা বিশ্বাস করে না তারা এরকম অবস্থায় কখনোও পড়ে নি।

উঠে এলাম মেয়েটার দরজায়। একটা গতানুগতিক সঙ্কোচ যে না ছিল তা নয়, বললাম, কেন ডাকছ?

কোন্ দেশী মিন্‌সে রে বাবা!—হাসির সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বলল সে, ভিতরে এস না।

আমি ভিতরে ঢুকতেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির শব্দটা চাপা পড়ে গেল একটু। হাওয়া আসবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু দেখলাম, এ ঘরের মেঝেও টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ভিজে গেছে। তক্তপোশের বিছানাটা ভেজে নি। ঘরের মধ্যে আছে দু-চারটে সামান্য জিনিস, থালা গ্লাস কলসি।

কোথায় মরতে যাওয়া হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে? এমনভাবে বলল সে, যেন আমি তার কতকালের কত পরিচিত।

বললাম, অনেক দূরে, কিন্তু—

বুঝেছি।—মুখ টিপে হাসলো সে : ঘরটা তুমি একেবারে কাদা করে দিলে। এগুলো ছেড়ে ফেলো জলদি।

ঠাণ্ডার আর আচমকা ফ্যাসাদে রীতিমতো জমে যাওয়ার যোগাড় হলো আমার। বললাম, কিন্তু এদিকে—

সে বলে উঠলো, কী যে ছাই পরতে দিই! ভেজা জামাটা খুলে ফেলো না।

ফেলতে পারলে তো ভালোই হয়। কিন্তু...গলায় একটু জোর টেনে বলেই ফেললাম, মিছে ডেকেছ, এদিকে পকেট কানা।

এবার মেয়েটা থমকে গেল। যা ভেবেছি তাই। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জিজ্ঞেস করলো, কিছু নেই?

তার সমস্ত আশা যেন ফুৎকারে নিবে গেছে, এমন মুখের ভাবখানা।

বললাম, তা হলে আর দুর্যোগ মাথায় করে পথে পথে ফিরি?

মেয়েটা অসহায়ের মতো চুপ করে রইলো। এ তো আমি আগেই জানতাম। কিন্তু মেয়েটা এখানে ব্যবসা করতে বসেছে, না, ভিক্ষে করতে বসেছে! আমি দরজাটা খুলতে গেলাম।

পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে এখন?

বললাম, ওই মোষের খাটালটায়। দরজাটা খুলে ফেললাম। ইস্। হাওয়াটা যেন আমাকে হাঁ করে খেতে এল। পা বাড়িয়ে দিলাম বাইরে।

মেয়েটা হঠাৎ ডাকলো পেছন থেকে, কই হে, শোনো। রাত্তিরটা থেকেই যাও ডেকেছি যখন। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কপালটাই খারাপ আমার।

বললাম, কেন, কপালটা ভালোই থাকুক তোমার, আমি খাটালেই যাই।

যা তোমার ইচ্ছে। হতাশভাবে বসে পড়লো সে তক্তপোশে : আজ তো আর

কোন আশাই নেই।

ভাবলাম, মন্দ কী? এই দুর্যোগে এমন আশ্রয়টা যখন পাওয়াই যাচ্ছে, কেন আর ছাড়ি। কিন্তু মেয়ে মানুষের সঙ্গে রাত কাটানোটা ভারি বিশ্রী মনে হল। কেননা, এটা একেবারে নতুন আমার কাছে। অবশ্য মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল তোমাদের আর-দশজনের চেয়ে হয়তো একটু বেশিই আছে। তা বলে এখানে? ছি ছি! সে আমি পারব না।...তবে ওর সঙ্গে না শুয়েও রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। ঢুকে দরাজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

লম্বা ছাড়ালো গড়ন মেয়েটার। মাজা-মাজা রঙ। গাল দুটো বসা, বড়-বড় চোখ দুটো অবিরল কচিঘাস-সন্ধানী গরুর চোখের মতো, ওই চোখে মুখে আবার রঙ কাজল মাখা হয়েছে। মোটা ঠোঁট দুটোর উপরে নাকের ডগাটা যেন আকাশমুখো।

খুঁজে খুঁজে সে আমাকে একটা পুরোনো সায়া দিল পরতে, বলল, এইটা ছাড়া কিছু নেই।

সায়া! হাসি পেল আমার? যাক, কেউ তো দেখতে আসছে না, কিন্তু—

ধক করে উঠল আমার বুকটার মধ্যে। তাড়াতাড়ি পকেটে চাপ দিলাম আমি। মরবার সময় আমার বন্ধু যে ছোট্ট জিনিসটা পর্বতের বোঝার মতো চাপিয়ে দিয়ে গেছে সেটা দেখে নিলাম। জিনিস নয়, একটা রক্তের ডেলা, হ্যাঁ, রক্তের ডেলাই। ভীষণ সংশয় হল আমার মনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সে তখন পিছন ফিরে জামার ভিতরের বডিস খুলছে। বললাম, কিছু কিন্তু নেই আমার কাছে, হ্যাঁ।

কবার শোনাবে বাপু আর ওই কথাটা?—সে হতাশভাবে বলল।

হ্যাঁ বাবা।—বললাম, বলে রাখা ভালো। তবে আমার কোন ইচ্ছে নেই কিছু। খালি মুসাফিরের মতো রাতটা কাটিয়ে দেওয়া।

মেয়েটা ওর গরুর মতো চোখ তুলে এক দৃষ্টি দেখল আমাকে। বলল, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে?

তা বটে। আমি সায়াটা পরে নিলাম। কিন্তু খালি গয়ে কাঁপুনিটা বেড়ে উঠল। বাইরে জল আর হাওয়ার শব্দ দরজাতে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলে দিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে একপ্রস্থ হেসে নিয়ে একটা পুরোনো শাড়ি দিলে ছুঁড়ে। নাও, গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

বলে আমার জামা-কাপড় দড়িতে দিল। বলল, একটু শুকিয়ে যাবে'খন।

আরাম জিনিসটা বড় মারাত্মক, বিশেষ এ-রকম একটা দুরবস্থার মধ্যে আমি প্রায় ভুলেই গেলাম যে, আমি একটা বাজারের মেয়েমানুষের ঘরে আছি। বললাম, পেটটা একেবারে ফাঁকা দুদিন ধরে, তাই এত কাবু করে ফেলেছে জলে।

সে কোন জবাব দিল না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইল। বললাম, তা হলে শোয়া যাক।

সে মুখ তুলল। মুখটা যন্ত্রণাকাতর, তার সুস্পষ্ট বুকের হাড়গুলো নিশ্বাসে ওঠানামা করছে। বলল, খাবে? ভাত-চচ্চড়ি আছে।

ভাত-চচ্চড়ি? সত্যি, এটা একেবারে আশাতীত। ভাতের গন্ধেই যার অর্ধেক পেট ভরে, তার সামনে ভাত! জিভটাতে জল কাটতে লাগল আর পেটটা যেন আলাদা একটা জীব। ভাত কথাটা শুনেই ভেতরটা নড়ে চড়ে উঠল কিন্তু—

সে ততক্ষণ এনামেলের থালায় ভাত বাড়তে শুরু করেছে। দেখে আমার মনের সংশয়টা আবার বেড়ে উঠল। আমি দড়ির উপর থেকে জামাটা তুলে নিলাম তাড়াতাড়ি। গতিক তো ভালো মনে হচ্ছে না। সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, ভাতের পয়সা-টয়সা কিন্তু নেই আমার কাছে।

গরুর মতো চোখ দুটোতে এবার বিরক্তি দেখা গেল। বলল, মোষের খাটালই তোমার জায়গা দেখছি। কবার শোনাবে কথাটা!

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। হতভাগা মরবার সময় এমন জিনিসই দিয়ে গেল, এখন সেই বোঝা নিয়ে আমার চলাই দায়। রাখাও বিষ, ছাড়াও বিষ। বাইরে পড়ে থাকলে এ বোঝাটার কথা হয়তো মনে থাকত না। সে আবার বলল, মানুষের সঙ্গে বাস কর নি তুমি কখনও?

শোন কথা! তাও আবার জিজ্ঞেসা করছে কারখানা বাজারের মেয়েমানুষ! বললাম, করেছি, তবে তোমাদের মতো মানুষের সঙ্গে নয়।

সে নিশ্চুপে তাকিয়ে রইল আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর বলল, রয়েছে যখন খেয়ে নাও, নইলে নষ্ট হবে। ভেবে দেখলাম তাতে আর আপত্তি কী? বিনা পয়সার ভাত। আর দেখছেই বা কে! জামাটা হাত গুটিয়ে নিয়ে গপ্‌গপ্ করে ভাত খেয়ে নিলাম, তারপর এক ঘটি জল। এ-রকম বাড়া ভাত খেয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে চূড়ান্ত বাবুগিরি বলে মনে হল আর সেই জন্যই সংশয়টা বাঁধা রইল মনের আষ্টেপৃষ্ঠে।

তারপর শোয়া। সে এক ফ্যাসাদ। আমি শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি শোবে কোথায়? সে নিরুত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে খসা-ঘোমটাটা টেনে দিল।—আমি বসলাম।

সে পাশতলার দিকে বসে বলল, তুমিই শোও, আমি তো রোজই শুই। একটা রাত তো। ঢুকেছি যখন...

বলতে বলতে আমার হাতের মুঠির মধ্যে জামাটা দেখে সে দড়ির দিকে দেখল। তারপর আমার দিকে। আমিও তাকিয়েছিলাম। বলল, জামাটা ভেজা যে!

হোক তাতে তোমার কী?

চুপ করে গেল সে। শরীরটা আরাম পেয়ে আমার মনে হলো সিটনো তন্ত্রীগুলো স্বাভাবিক সতেজ ও গরম হয়ে উঠেছে। বাইরের যে জল-হাওয়া আমাকে এতক্ষণ

ফেলতে চেয়েছিল, তারই চাপা শব্দ আমার কাছে ঘুমপাড়ানি গানের মতো মিষ্টি মনে হলো। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো বেশ।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তেমনি বসে আছে। চোখের দৃষ্টিটা ঠিক কোন দিকে বোঝা যাচ্ছে না। অত্যন্ত ক্লান্ত আর একটা চাপা যন্ত্রণার আভাস তার চোখে। কী জানি! এদের নাকি আবার ঢঙের অভাব হয় না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়বো তখন—নাঃ, হতভাগার এ জিনিসটার একটা ব্যবস্থা আমি কালকেই করে ফেলবো। কী দরকার ছিল মরবার সময় আমাকে এটা দিয়ে যাওয়ার? একটা রক্তের ডেলা! রক্তের ডেলাই তো! ঘামের গন্ধে ভরা ছোট্ট নেকড়ার পুঁটলিটা। একটা রাক্ষুসে খিদে-খিদে গন্ধও আছে। ছোঁড়া মরতে মরতে মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল, এটা তুই রাখ।

এমনভাবে বলেছিল কথাটা যে, আজও মনে করলে বুকটার মধ্যে—যাক সে কথা।

মেয়েটা তখনও ওইভাবে বসে আছে দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম, তুমিও শুয়ে পড় খানিকটা তফাৎ রেখে।

সে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। বলল, ছিষ্টিছাড়া মানুষ বাবা!

তারপর শুয়ে পড়লো।

আমার শরীরটা তখন আরামে রীতিমতো ঢিলে হয়ে এসেছে। আর মেয়েমানুষের গা যে এত গরম তা মেয়েটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে থেকেও আমি বুঝতে পারলাম। কী অদ্ভুত রাত আর বিচিত্র পরিবেশ! লোকে দেখলে কী বলত! ছি—ছি! কিন্তু এতখানি আরাম, আমার দুঃস্থ ক্লান্ত শরীরে এতখানি সুখবোধ আর কখনও পেয়েছি কি না মনে নেই। ঘুমে ঢুলে আসেছে চোখ কিন্তু—

নাঃ, তা হবে না। সেই বন্ধুটির কথা বলছি। হতচ্ছাড়া মরবার সময় বলে গেল পুঁটলিটা দিয়ে, আমার রক্ত।

বললাম, রক্ত কিসের?

চোখের জল আর কষের রক্ত মুছে বলল, আমার বুকের। না খেয়ে রোজ—

বলতে বলতে রক্তশূন্য অস্থির আঙুলগুলো দিয়ে হাতড়াতে লাগলাম পুঁটলিটা।

আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, কিসের জন্য র‍্যা?

বলল, ঘর বাঁধার আশায়।

এমনভাবে বলেছিল কথাটা ফের গালাগালি দিতে গিয়ে আমার গলাটার মধ্যে... যাক সে কথা।

মেয়েটা একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

সে তাকালো। চোখ দুটো যেন যন্ত্রণায় লাল আর কান্নার আভাস তাতে। বলল, কিছু না।

তার গরম নিশ্বাসে এত আরাম লাগল আমার গায়ে। ঠাণ্ডা জমে যাওয়া গায়ে যেন কেউ তাপ বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে হলো হঠাৎ, খুব খারাপ নয় দেখতে। ঠোঁট আর নাকটা যা একটু খারাপ। বোজা চোখের পাতা, বুকে জড়ানো হাত দুটো আর তার নমিত বুক বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করলো। সে জিজ্ঞেস করল আমাকে, ঘুম আসছে না তোমার?

আমি ঘুমব না।—বললাম। মনে মনে ভাবলাম, তা হলে তোমার বড় সুবিধে হয়, না, সেটি হচ্ছে না বাবা। কথা বললেই তো সংশয়টা বাড়ে আমার মনে। তার চেয়ে চুপ করে থাকুক না।

বাইরের তাণ্ডব তখনও পুরো দমেই চলেছে। টালি-চোয়ানো জলের ফোঁটার শব্দ আসছে মেঝে থেকে, সঙ্গে ছুঁচোর কেত্তন।

সে আবার কঁকিয়ে উঠল।

কী হয়েছে?

একটু চুপ করে থেকে বলল, রোগ।

রোগ! কিসের রোগ।

সে নীরব।

বল না বাপু।

তবুও নীরব।

আমি হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলাম, বল না কেন রোগটা! যক্ষ্মা কলেরা-টলেরা হলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। রোগের সঙ্গে পিরীত নেই বাবা!

সেই হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল : কার সঙ্গে আসে তোমার পিরীত শুনি?

তা বটে, পিরীতের কথাই তো ওঠে না এখানে। বললাম, তা বলই না কেন রোগটা।

যা এ লাইনে থাকলে—সে বললে।

লাইনে থাকলে? সর্বনাশ! ভীষণ সিটিয়ে গেলাম। ভয়ে ঘৃণায় জিজ্ঞেস করলাম, এর উপরও সন্ধ্যারাত্রে—

নিশ্চয়ই। পাঁচজন—সে বলল।

ইস্ কী সাংঘাতিক। বললাম, চিকিচ্ছে করাও না কেন?

পয়সা পাব কোথায়?

কেন, নিজের রোজগার?

সে তো মনিবের পয়সা।

মনিব? এটা কি চাকরি নাকি?

নয় তো কী। মনিবের ব্যবসা, ঘর দোর জায়গা জিনিস। আমরা আসি খাটতে।

ভয়ানক দমে গেলাম কথাগুলো শুনে। এরা বেশ মজায় থাকে না তাহলে? এও চাকরি! বললাম, মনিব শালাই বা কেমন, চিকিচ্ছে করায় না কেন?

যখন মর্জি হয়। কলের মানুষ রাতদিন কত মরছে, কলের মালিকেরা তাদের চিকিচ্ছে করায়?

ঠিক। তার বেদনার্ত শান্ত চোখের দৃষ্টি এবার আমাকে সত্যিই দিশেহারা করে তুলল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক প্রাণ দেয়, কিন্তু জীবনের এ কী প্রতিরোধেই লড়াই! বললাম, তাহলে...

সে বলল, তাহলে আর কী। মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে যেটা রোজগার হয়, তাতে চিকিচ্ছে করাই।

বাঁচতে?—হাসতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল আমার।

সকলেই বাঁচতে চায়।—সে বলল যন্ত্রণায় ঠোঁট টিপে।

ঠিকই। ডাঙায় বাঘ আছে জেনেও মানুষ এ ডাঙাতেই তার বাদ ও জনপদ গড়ে তুলছে। বন্যা, ঝড়, ক্ষুধা, কী নাই! তবু। আর সেই হতচ্ছাড়া চেয়েছিল ঘর বাঁধতে। হ্যাঁ, তবু পুঁটলির প্রতিটি পয়সা রক্তের ফোঁটা। রক্তের ডেলা একটা—এই পুঁটলিটা।

সে বলল, ঘুমুবে না?

না ঘুম নেই চোখে। ওর নিশ্বাস লাগছে। যন্ত্রণার গরম নিশ্বাস। মিঠে তাপ, গনগনে আগুনের মতো মনে হল। শক্ত করে পুঁটলি সবশুদ্ধ জামাটা চেপে ধরে উঠে পড়লাম। বাইরে ঝড়-জলের দুর্যোগ তেমনই। রাত প্রায় কাবার। নিজের জামা-কাপড় পরে নিলাম।

সে উঠল। হাসতে চাইল ; চললে?

পকেটে হাত দিয়ে শক্ত করে পুঁটলিটা চেপে ধরে বললাম, হ্যাঁ।

হতভাগা মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল মরতে মরতে, এটা তুই রাখ! কেন? কেন?

মেয়েটা বলল, যন্ত্রণায় চাপা গলায়, আবার এসো।

মেয়েটার কী চোখ? সমস্ত মুখটি লাঞ্ছনায় দাগে ভরা, আকাশ-মুখো না, মোটা-ঠোঁট। কিন্তু এমন মুখ তো আর কখনও দেখি নি।

ভীষণ বেগে ওর দিকে ফিরে পুঁটলিটি ওর হাতে তুলে দিলাম। ওর নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে। মুহূর্তে চোখ নামিয়ে একটা অশান্ত ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপালাম পেছন থেকে। হাওয়ায় ভেসে গেল সে কথা। বললাম, পিছু ডেকো না।

বোঝামুক্ত আমি উত্তর দিকে চললাম। বানপ্রস্থ নয়, বন্ধুর বাড়িতে পুবে হাওয়া ঠেলে দিতে চাইল পশ্চিম গঙ্গার ঘাটের দিকে। পারল না।

তৃষ্ণা, ১৯৫৭

বিমল কর (১৯২১—)
মননধর্মী লেখক। ডাক্তারি পড়েছিলেন, শেষ করেন নি। গল্প-উপন্যাসে চিকিৎসকের নির্মম নিরাসক্ত দৃষ্টি কাজে লাগিয়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন রীতি-আন্দোলনের পথিকৃৎ। আবেগকে তিনি বর্জন করেন নি, কিন্তু কখনও আবেগের কাছে আত্মসমর্পণও করেন নি। তাঁর গল্প-উপন্যাসে জীবনচেতনা ও মৃত্যু-চেতনা একবৃন্তে ধৃত। বহু কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত।

বন্ধুর জন্য ভূমিকা

আমার বন্ধু স্বর্গত বসুধা মুখোপাধ্যায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত লেখক। প্রায় বিশ-বাইশ বছর আগে তার একটি বই আমরা তিন বন্ধু মিলে বের করেছিলাম। বসুধা তখন আমাদের মধ্যে ছিল। সেই বই যথারীতি গোয়াবাগানের এক ছাপাখানায় দীর্ঘদিন পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে। ফুটপাথে দু-পাঁচখানা বই আমরা দু-চার আনায় বেচতে পেরেছিলাম, সে-বই কেউ কিনেছেন বা পড়েছেন এমন আশা আমি করি না।

বসুধার সেই বই এতকাল পরে আবার নতুন করে ছাপা হচ্ছে। ছাপছে ভুবন, আমার এবং বসুধার বন্ধু। প্রথমবারের ছাপার সময়েও সে ছিল।

'নরক হইতে যাত্রা'—এই নামেই প্রথমবার বইটি বেরিয়েছিল, এবারেও সেই নামটি রাখা হলো; পুরোনো বইটাতে ছিল তিনটি গল্প, এবারে আরো দুটি যোগ হয়েছে। বসুধা মারা গিয়েছিল এমন এক হাসপাতালে, যেখানে যাওয়া বা তার শেষ কোনো লেখা (যদি সে লিখে থাকে) সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আমরা আমাদের জানা লেখা থেকেই তার বইটি প্রকাশ করছি।

পাঠকদের কাছে আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই মার্জনা ভিক্ষা করা উচিত। আমি লেখক নই, ভূমিকা কেমন করে লিখতে হয় জানি না। আমার ভাষাও ভূমিকার উপযোগী নয়। ভুবনই আমায় এই দায়িত্ব দিয়েছে। সে মনে করে, যৌবনে যখন বসুধার সঙ্গে আমিও লেখাটেখার চেষ্টা করেছি তখন কাজটা আমারই করা উচিত। ভুবন আরো মনে করে, বসুধার কথা আমি তার চেয়েও বেশি জানি। কথাটা হয়তো ঠিক না। কলম না ধরলেও ভুবন আমার চেয়ে বসুধার কম অনুরাগী, গুণমুগ্ধ ও ঘনিষ্ঠ ছিল না; তবু বসুধার বইয়ের ভূমিকা আমাকেই লিখতে হচ্ছে।

দীর্ঘ বিশ-বাইশ বছর পরে বসুধার মতন অখ্যাত অজ্ঞাত লেখকের অপঠিত বিস্মৃত একটি বই আবার কেন ছাপছি তার একটা কৈফিয়ত থাকা দরকার। বন্ধুত্ব ভিন্ন এর কোনো কৈফিয়ত থাকতে পারে না অবশ্য, মৃত বন্ধুর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কিছু সান্ত্বনা পাচ্ছি।...দ্বিতীয় কারণ কিছুটা অন্য রকম। মাস চার-পাঁচ আগে ভুবন একবার কাশী গিয়েছিল। কাশীতে বামাপুরায় এক ভদ্রলোকের

সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভদ্রলোক বৃদ্ধ। একদিন তাঁর বসার ঘরে বসে গল্প করছে ভুবন, এমন সময় একটি ছেলে এসে একটা বাঁধানো ছবি দিয়ে গেল। কয়েকদিন আগে ঘরের ঝুল ঝাড়বার সময় দেওয়াল থেকে পড়ে গিয়ে ছবিটির কাঁচ ভাঙে, আবার সেটি বাঁধিয়ে বাড়িতে এল। স্বভাবতই ছবিটি ভুবনের চোখে পড়েছিল। ধূসর বিবর্ণ ছবির মধ্যে ভুবন বসুধাকে দেখতে পেল। তিনটি মুখের একটি বসুধা, অন্য দুটির একজন বৃদ্ধ নিজে, অন্যজন তাঁর মেয়ে। ভুবন বলল, 'একে আমি চিনি, আমার বন্ধু বসুধা।' বলে সে বসুধার অন্য পরিচয় দিল, 'ও লেখক ছিল।' বৃদ্ধ বললেন, 'আমার মেয়েও বলত, ও নাকি লেখে। আমি কখনো দেখি নি লিখতে। তবে হরিদ্বারে গিয়ে সেবার ওকে এক ক্ষয়-রুগীর সেবা করতে দেখেছি। এই ছবিটা হরিদ্বারের। ছেলেটা যেন সন্ন্যাসীর মতন ছিল।...তুমি ওর খবর জান?'...ভুবন কি ভেবে যেন বসুধার মৃত্যু-সংবাদ দেয় নি, বলেছিল, 'না আমি জানি না।'

কাশী থেকে ফিরে এসে ভুবনের কেন যেন খেয়াল চাপল, বসুধার সেই বই ও ছাপবে। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি—কেন? ছাপব, ছাপা আমাদের উচিত। বসুধাকে আমি আগে কতবার বলতাম, আমার যদি পয়সা থাকত, তার বই আমি আগে ছাপতাম। আমার অবস্থা এখন ভালো, আমি তার বইয়ের জন্যে টাকা খরচা করতে রাজী।'

আমার মনে হয়, ভুবন আজ প্রায় ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছর বয়সেও তেমনি আবেগপ্রবণ উৎসাহী রয়েছে, আমি যা থাকতে পারি নি। আমার একমাত্র সান্ত্বনা, বসুধার জন্যে আমি এই ভূমিকাটুকু লিখতে পারছি। পাঠক নিজগুণে আমার অক্ষমতা মার্জনা করবেন।

বসুধার জন্ম বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে। প্রথম যুদ্ধ-থামার বছরে, উনিশ-শো আঠারোতে তার জন্ম; বোধহয় অগ্রহায়ণ মাসে। তার বাবা ছিলেন পোস্ট মাস্টার। বদলির চাকরি বলে বসুধারা হাজার ঘাটের জল খেয়েছে। বাংলা আর বিহারের মধ্যেই অবশ্য। বসুধার মা ছিলেন নম্রস্বভাব, শান্ত, ধর্মভীরু। ওর এক দিদি ছিল, বসুধা যখন কলেজে পড়ছে তখন তার দিদি স্বামিগৃহে মারা যান। বসুধার অন্যান্য কোনো আত্মীয়স্বজনের কথা আমরা জানি না।

কলকাতায় কলেজে পড়তে এল যখন বসুধা, তখন আমাদের সঙ্গে আলাপ। সে ভালো ছাত্র ছিল না, তার চেহারা ছিল না এমন কি তার গলার স্বরও ভাঙা ছিল। কিন্তু বন্ধু হিসেবে বসুধা ছিল দুর্লভ। সে যত না পড়ত তার দশগুণ আপনমনে নানা কথা ভাবত, যখন আমাদের কিছু বলত বা বোঝাত, তার ভাঙা-ভাঙা গলার স্বর আবেগে কেমন যেন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠত। বসুধার চোখ বলত, সে একটু বেশি রকম আবেগপ্রবণ। তার মুখের গড়ন ছিল লম্বা, থুতনি সরু, নাক বেশ পাতলা আর উঁচু; কিন্তু চোখ দুটি ছিল সামান্য যেন ছোট, খুব ঝকঝকে, মোটা-মোটা ভুরু। ওর রঙ

ছিল আধ-ফরসা, মাথার চুল কোঁকড়ানো। চেহারার মধ্যে তার এমন কিছু ছিল না যা অন্যকে আকর্ষণ করবে, সাধারণ বাঙালী ছেলের থেকে ওকে আলাদা করার কথাও নয়। কিন্তু আমরা, যারা বসুধার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তারাই শুধু জানতাম ওর স্বভাবের ছাঁচটা আমাদের মতন নয়, কোথায় যেন একটা আকর্ষণ রয়েছে।

বি.এ. কলেজে পড়ার সময় বসুধা লেখার চর্চা শুরু করে। তার আগেও হয়তো লিখত, কিন্তু আমরা তার খবর জানতাম না। বসুধার প্রথম লেখা গল্প আমাদের বন্ধুদের এক কাগজে বেরিয়েছিল। সেই কাগজ বা সেই গল্প হারিয়ে গেছে। তখন কলকাতায় বোমা পড়ার সময়, নানা দিকে ডামাডোল, মানুষ ভয়ে আতঙ্কে ছুটছে, পালাচ্ছে। ওই রকম অস্থিরতার সময় সবাই যা লিখেছিল, বসুধাও সেই রকম এক গল্প লিখেছিল। একেবারে মামুলি লেখা। তখন অবশ্য আমরা তার খুব প্রশংসা করেছি, কিন্তু বলতে কি, সেই গল্প এত মামুলি যে, আজ আমার কিছু মনে নেই গল্পটা সম্বন্ধে।

আমার বিশ্বাস, বসুধাও মনে করত তার ঠিক-ঠিক নিজের লেখা শুরু হয়েছিল তেতাল্লিশ সাল থেকে। তখন আমরা সবাই চাকুরে, বসুধা চাকরি করতো সিভিল সাপ্লাইয়ে; আমি আর ভুবন অন্যত্র। বউবাজারের এক মেসে থাকত বসুধা, বন্ধুবান্ধব বলতে আমরা দু'জন, মেসের ঘরে বিকেলের পর সন্ধ্যে থেকে আমাদের আড্ডা জমত, বসুধা তার লেখার কথা বলতো, কিছু যদি লিখে রাখত আমাদের পড়ে শোনাত। তার মন বড় অস্থির ছিল, কখনো পুরো করে কিছু লিখত না, একটা কিছু আজ লিখব বলল, কাল আর লিখল না; অনেক লেখা শুরু করেছে, সামান্য লিখে ছেড়ে দিয়েছে। মাসের পর মাস সে শুধু লেখার কথা বলছে, কিন্তু এক বর্ণও লেখে নি।

এই বইয়ের যেটি প্রথম গল্প, 'বিনোদিনীর দুঃখ',—তখনকার দিনের একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। গল্পটিতে বসুধার প্রথমে যেন নিজের কোনো বলার কথা ধরা গিয়েছে। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বিনোদিনীর, স্বামীর বয়স তখন আঠারো। লালপেড়ে মোটা শাড়ি গায়ে থাকত না বলে বিনোদিনী পুঁটুলির মতন করে অর্ধেকটা শাড়ি পিঠে করে বয়ে বেড়াত, তার স্বামী গঙ্গাপদ বউয়ের জন্যে স্টীমারঘাটের হাট থেকে মাটির পুতুল, কাঁচের চুড়ি, কাঁচপোকার টিপ, চিনে সিঁদুর, কাঁচা পেয়ারা, জাম কিনে আনতো লুকিয়ে লুকিয়ে, এনে বউকে দিত, রাত্রে তক্তপোশের তলা থেকে লুকোনো জিনিস বের করে বিনোদিনী খেলতে বসতো, কিংবা রাত্রেই কাঁচা পেয়ারাটা চিবিয়ে খেত। গঙ্গাপদ স্টীমারঘাটার চাকরি পেলে বিনোদিনীর জন্যে কিনে এনেছিল এক কাঁচের গৌরাঙ্গঠাকুর। বিনোদিনী তখন থেকে ঠাকুরভক্ত। এমনি করে বিনোদিনী যুবতী হলো, ছেলেমেয়ের মা হলো, গিন্নী বউ হলো, যৌবন ফুরালো, বুড়ো হয়-হয়, তারপর তার স্বামী গঙ্গাপদ মারা গেল। স্বামী মারা যাবার পর বিনোদিনী এই সংসারে

কোথাও আর নিজেকে মানাতে পারলো না। পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি স্বামী সঙ্গে তার নিজের জীবন এমন করে জড়ানো, যেন সে এবং তার স্বামী, তাদের সংসার তাদের সম্পর্ক এক ধরনের জীবন—নকশা তৈরি করেছিল (ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি প্যার্টান, তাই), স্বামীর মৃত্যুতে সে-নকশা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। বিনোদিনীর জীবন এখন শূন্য, অর্থহীন, অকারণ। যেন যেতে যেতে একটি নদী হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছে, তার আর প্রবাহ থাকলো না। বিনোদিনীর মনের অবস্থার একটি বর্ণনা এই রকম : যে রেখা এবং রঙ দিয়া বিধাতা তাহার জন্য এই সংসারের একটি অতি ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়াছিলেন, সেই রেখাগুলির অর্ধেক মুছিয়া গিয়াছে, অনেক রঙ ধুইয়া গিয়াছে। এখন আর বিনোদিনী চিত্র নয়, আর কখনও তাহার চিত্র হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিনোদিনীর তার এই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্যে ছেলের কথা ভেবেছে মন তেমন করে সাড়া দেয় নি; ঠাকুর দেবতা নিয়ে ভুলতে পারে নি। বিনোদিনীর বড় আদরের ছিল তার সেই কাঁচের শ্রীগৌরাঙ্গ, পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে গৌরাঙ্গকে সে নিত্য সেবা করেছে, গঙ্গাপদর অবর্তমানে গৌরাঙ্গও শুধুমাত্র কাঁচ হয়ে থাকলো। শেষে বিনোদিনী একদিন হঠাৎ অনুভব করলো : প্রতিমার বিসর্জন হয়, তাহার সাজ-শোভা, মাটি সবই গলিয়া যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। মানুষের জীবনেও এই বিসর্জনগুলি অতি সত্য, গঙ্গাপদ ও বিনোদিনীকে কাহারা যেন বিসর্জনের বাজনা বাজাইয়া নদীর ঘাটে আনিয়া রাখিয়াছে। স্বামী গিয়াছেন, বিনোদিনীর জন্য নদীর জল অপেক্ষা করিতেছে একই নদীর জলে উভয় মূর্তি ডুবিয়া গলিয়া একাকার হইয়া থাকিবে, বিনোদিনী ইহা ভাবিয়া ঈশ্বরকে আজ প্রণাম করিল।

'বিনোদিনীর দুঃখ' বসুধা তার মা'র কথা ভেবে লিখেছিল। তার মা আর বিনোদিনীতে তফাৎ নেই, ধর্মভীরু হওয়া সত্ত্বেও তার মা স্বামীর মৃত্যুর পর না বসুধা, না বা ধর্মকে আশ্রয় করে সত্যকার সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। বসুধা বলতো : মা পরকালও বিশ্বাস করে না। একমাত্র মৃত্যুকেই বিশ্বাস করে। আমি কিছু বুঝতে পারি না।

বসুধার মা মারা যাবার পর, বেশ কিছুদিন পর, সে আরো একটা গল্প লেখে। গল্পটির নাম 'দুঃখমোচন'। এই বইয়ের সেটি দ্বিতীয় গল্প। একটি অপ্রচলিত পত্রিকায় গল্পটি ছাপা হয়েছিল। 'বিনোদিনীর দুঃখ' লেখা হয়েছিল সাধু ভাষার ঢঙে। বসুধা প্রথম দিকে তাই লিখত। 'দুঃখমোচন' সে চলতি ভাষায় লিখেছে।

'বিনোদিনীর দুঃখ' গল্পে বিনোদিনীর শেষ সান্ত্বনা ছিল মৃত্যু। মৃত্যুকে বিনোদিনী দুঃখমোচনের পরিণতি হিসেবে দেখেছিল। কথাটা বোধহয় ঠিক মতন বলা হলো না, বলা উচিত ছিল, বিনোদিনী মৃত্যুর মধ্যে এক ধরনের আত্মিক পুনর্মিলন আশা করেছিল। 'দুঃখমোচন'-এ এই মৃত্যুকে যেন আরো বেশি করে যাচাই করবার চেষ্টা করেছে বসুধা।

আগেই বলেছি, গল্পটা বসুধা তার মা মারা যাবার বেশ কিছু পরে লিখেছে। ওর মা যখন মারা যায় তখন বসুধার সঙ্গে একটি মেয়ের পরিচয় গড়ে উঠেছিল। তার নাম এখানে গোপন রাখলাম, সুবিধের জন্যে আমরা তাকে নিরু বা নিরুপমা বলে উল্লেখ করব। বসুধা তার মা'র অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে চলে গিয়েছিল, তার মা'র মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধকর্ম পর্যন্ত দেশেই ছিল। আমরা—আমি আর ভুবন বসুধার মা'র শ্রাদ্ধের দিন তার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বসুধা তখন আমাদের এক অদ্ভুত কথা বলল; বলল যে, শ্মশানে যখন নদীর পাড়ে মা'র চিতা দাউ-দাউ করে জ্বলছিল তখন এক জামগাছের তলায় বসে সে প্রায় সারাক্ষণ নিরুর কথা ভেবেছে। তারপর এই যেক'দিন—শোক আর অশৌচের পর্ব—এই ক'দিনও সে মা'র কথা অল্পই ভেবেছে, নিরুর কথাই ভেবেছে বেশি। কেন?

বসুধার সব ব্যাপারেই 'কেন'-র বাতিক ছিল। মা'র জন্যে তার যেমন শোক পাওয়া উচিত ছিল, বেদনা বোধ করা কর্তব্য ছিল—তেমন শোক বা বেদনা সে পেল না, উপরন্তু নিরুপমার কথা ভাবল শুধু—এই গ্লানিতে তার মন অনেক দিন বিমর্ষ থাকল। যেন সে কত বড় অপরাধী কী গুরুতর অন্যায় না করেছে! আমরা তাকে বোঝাতে পারি নি, অকারণে সে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে।

কিছুদিন ওইভাবে, বিমর্ষতা ও গ্লানির মধ্যে কাটল বসুধার। নিরুকেও সে অসুখী অপ্রসন্ন করে রাখল; তারপর নিজের মনের মত এক উত্তর খুঁজে পেয়ে বসুধা 'দুঃখমোচন' গল্পটি লিখল।

'বিনোদিনীর দুঃখ' গল্পে বিনোদিনী মৃত্যুর মধ্যে তার দুঃখের নিবৃত্তি অনুভব করেছে, 'দুঃখমোচন'-এ সুখেন্দু অনুভব করেছে মৃত্যু নিষ্ক্রিয়, জড়তুল্য; জীবন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, মৃত্যু কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। সরল করে বললে কথাটা এই দাঁড়ায়, বিনোদিনী মৃত্যুকে গ্রহণ করে শান্তি পেতে চেয়েছিল, সুখেন্দু জীবিত থাকতে এবং সজীবতা থেকে শান্তি পেতে চাইল।

সুখেন্দু 'দুঃখমোচন' গল্পের নায়ক। তার বয়স কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গল্পের মুখ্য বিষয় আপাতত মনে হবে প্রেম; কিন্তু আমি মনে করি, মৃত ও জীবিত, বা মৃত্যু ও জীবনের দ্বন্দ্ব। গল্পটির শুরু থেকেই আমরা দেখি, সুখেন্দু একটি অদ্ভুত দ্বিধার মধ্যে অত্যন্ত দুঃখীর মতন বেঁচে আছে। সে রেণু বলে একটি মেয়েকে ভালোবাসে, অথচ তার মা'র সর্বগ্রাসী এক স্মৃতি তাকে রেণুর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে দিচ্ছে না। তার মনে সর্বদাই একটি অন্যায়ের ভয়, বিবেকের গ্লানি। সুখেন্দুর মনে হয় সে যেন তার মা'র নিত্য অভিশাপ কুড়িয়ে বেঁচে আছে। এ-রকম কেন হয় সে বোঝে না, এইমাত্র বুঝতে পারে, মা'র প্রতি যথোচিত কর্তব্যগুলি সে পালন করে নি।

মনের এই দ্বন্দ্ব থেকে সুখেন্দুকে আমরা উদ্ধার পেতে দেখব বলে যখন আর

আশা করি না—তখন একটি ঘটনা থেকে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটছে। গল্পের শেষের দিকে অলৌকিক ঘটনাটির কথাই আমি বলছি। শীতের শুরু তখন, রেণুদের বাড়ির ছাদে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রেণু আর সুখেন্দু বসে গল্প করছিল। কলকাতার গলি ধোঁয়া-কুয়াশা আর গ্যাসের আলো ও ঈষৎ জ্যোৎস্নায় কেমন ঝাপসা হয়ে আছে। গল্প করতে করতে রেণু হঠাৎ উঠে গিয়েছিল, সুখেন্দু বসে ছিল। সহসা তার মনে হলো, কে যেন তার পাশে এসে বসে আছে। ঝাপসা জ্যোৎস্না ও ধোঁয়া-কুয়াশার মধ্যে নির্বাক সেই মূর্তিকে সে প্রথমে চিনতে পারল না, সাদা ছায়ার মতো লাগছিল যেন মূর্তিটিকে। সামান্য লক্ষ্য করার পর সুখেন্দু চিনতে পারল, তার মা। প্রথমে অবাক হলেও পরে সুখেন্দু যে বুঝতে পারল, মা কেন এসেছে। মৃত মা'র প্রতি তার করুণা ও মমতা হচ্ছিল, মা'র জন্যে দুঃখ হচ্ছিল। অদ্ভুত একটি উদাসীনতা চিন্তানুভূতি এসে তাকে গ্রাস করছিল যেন। মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল সুখেন্দু—সহসা সে পেল কেমন এক গন্ধ? কার গন্ধ? অন্যমনস্কভাবে মুখ নিচু করতে বুকপকেটের মধ্যে থেকে ফুলের গন্ধ এল! মনে পড়ল, রেণু সামান্য আগে তার মাথার খোঁপা থেকে একটি মাত্র গোলাপ খুলে সুখেন্দুর বুকপকেটে রেখেছিল। সেই ফুলের গন্ধ কত জীবন্ত, মনোরম, স্পর্শযোগ্য। রেণুর শরীর মন ভালোবাসা, সব যেন সেই মুহূর্তে বিশাল এক ঢেউয়ের মতন এসে তাকে ভাসিয়ে নিল। সুখেন্দু সেই অবস্থায় কোনো রকমে তার মাকে বলল : তুমি আর এসো না।

বসুধা নিজের বেলায় যে গ্লানি অনুভব করেছে, সুখেন্দুর মধ্যে দিয়ে সেই গ্লানি কাটিয়ে উঠেছে। মৃত মা'র জন্যে তার ভীষণ কোনো শোক অথবা বেদনা হয় নি, অথচ নিরুর চিন্তাতে তন্ময় হয়েছিল—এই গ্লানিবোধের জন্যে তার যে দুঃখ জন্মেছিল, সেই দুঃখ তার মোচন হলো এতদিনে। নিরু জীবিত বলেই তার আকর্ষণ বেশি, নিরু জীবিত বলেই সে প্রয়োজনীয়। জীবনই প্রেম।

'দুঃখমোচন' ঠিক প্রেমের গল্প নয়, প্রেম এই গল্পে উপজীব্য বিষয় নয়। মানুষ মাত্রেই জীবনের প্রতি আসক্ত এবং এই আসক্তি ভিন্ন কোনো জীব হতে পারে না, বসুধা যেন সেই কথাই বলতে চেয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, বসুধার এই গল্পটি তার নিজের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল। সুখেন্দু নিমিত্তমাত্র।

এই বইয়ের তৃতীয় গল্প 'নরক হইতে যাত্রা'। আমি আগে বলেছি, আরো একবার স্মরণ করিয়ে দি, এই গল্পটির নামেই প্রথমবার তার বই আমরা ছেপেছিলাম। এবারেও ওই নাম রাখা হয়েছে।

'দুঃখমোচন' গল্পটি লেখার প্রায় বছরখানেক পরে বসুধা এই গল্পটি লিখেছিল। গল্পটিকে প্রেমের গল্প বলা যায়। অবশ্য প্রেমের গল্পের 'নরক হইতে যাত্রা'—এ যেন খুবই অদ্ভুত শোনায়।

'নরক হইতে যাত্রা'-য় একটি যুবকের প্রেম-পিপাসা, প্রেম এবং পরে তার ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। গল্পের নায়ক বসুধা নিজে, যদিও লেখায় নায়কের নাম পরিমল। এখানে নায়িকার নাম কিন্তু সত্যিই নিরুপমা। কলকাতার সদানন্দ চৌধুরী লেনের যে বাড়িতে নিরুপমা থাকত, তার নিচের তলায় পরিমলের এক বন্ধু থাকত। মাঝে মাঝে পরিমল বন্ধুর কাছে যেত। সেই সূত্রে নিরুপমার সঙ্গে পরিচয়।...পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে কিছুটা সময় নিশ্চয় লেগেছিল, কিন্তু এ-কথা বেশ বোঝা যায়, প্রথম থেকেই পরিমল নিরুপমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পরিমল ছিল সেই ধরনের ছেলে—ভালোবাসাকে যারা অনেকটা দৈবশক্তির মত মনে করে, এখনো বিশ্বাস করে ভালোবাসায় মানুষের হৃদয় উজ্জীবিত হয়। মুখচোরা, লাজুক এবং ভাবুক গোছের এই ছেলেটিকে খুব সাধারণ মেয়ে নিরুপমার ভালো না লাগার যথেষ্ট কারণ ছিল। নিরুপমা ছিল স্বভাবে খুবই সাধারণ।

গল্পের প্রথমাংশে পরিমল এবং নিরুপমার ক্রম-ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার কাহিনী আছে! দ্বিতীয়াংশে তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক। এই ভালোবাসাকে পরিমলের তরফ থেকে গভীর ও আন্তরিক বলতে কোথাও বাধা দেখি না। পরিমল ভাবত, এই প্রেম তার অস্তিত্বকে সার্থক করেছে, তার জীবনকে মূল্যবান করেছে; নিরুপমা অত ভাবত না, ভাবার কারণ দেখত না। হয়তো সে ভাবতে জানতো না। তবু যুবতী যে কোনো মেয়ের মতন তার কিছু রোমাঞ্চ ছিল এই প্রেমে।

এই ভালোবাসা একদিন ভেঙে গেল। কেন ভাঙল বোঝা যায়। তবু, কখনো মনে হবে নিরুপমাদের বাড়ির নিচের তলার ভাড়াটে পরিমলের বন্ধু মন্মথর ইতরতা ও চতুরতার জন্যে এই প্রেম নষ্ট হয়েছিল; কখনো মনে হবে দোষটা পরিমলেরই; আবার এক-এক সময় নিরুপমাকেই দায়ী করতে ইচ্ছে হয়। মন্মথকে যদি কারণ বলে ধরি, তবে দেখব, পরিমলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নিরুপমাকে লাভ করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সে অতিরক্ত চতুর বলে সরাসরি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি; গোপনে করেছিল, সাদামাটা সাংসারিক পথে, ধূর্ত ভাবে। সে নিরুপমার মাকে বশ করতে পেরেছিল, এমন কি নিরুপমাকেও। নিরুপমার মা সংসার বুঝতেন, মেয়ের সুখশান্তি বুঝতেন, ভালোবাসাবাসি তেমন বুঝতেন না। পরিমলকে তিনি যোগ্য পাত্র বলে মনে করলেন না। নিরুপমাও কেমন ভুল করেছিল। মন্মথর চাতুর্য এবং শক্ত-সামর্থ্য দাবি তার কাছে অনেক আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তা ছাড়া মায়ের দিক থেকে পরিমলকে গ্রহণ করায় বাধা ছিল প্রবল। নিরুপমার ছেলেবেলা থেকেই সবরকম অসুস্থতার ওপর ভয় ছিল, ঘৃণা ছিল। পরিমলকে তার কেমন অসুস্থ বলে মনে হতো। পরিমলকে সে অনেক দিন প্রেমিক হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভেবে পায় নি, এই প্রেম যখন ব্যবহার্য বিষয় হয়ে উঠবে সংসারে, তখন—তখন হবে : শান্তি বা সুখ কি পাবে নিরুপমা? তার মনে হয় নি পরিমল তাকে গার্হস্থ্য সুখশান্তি দিতে পারবে।

পরিমলের দোষের কথা যদি ভাবি তবে দেখব, পরিমল অনেকখানি পথ যেন অক্লেশে পেরিয়ে এসে হঠাৎ কেমন থমকে দাঁড়াল। কেন দাঁড়াল তা বলা উচিত। খুব সম্ভব পরিমল ভালোবাসার মধ্যে যেটুকু পাবার পেয়ে গিয়েছিল এবং ভালোবাসার বিষাদ ও অসম্পূর্ণতার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। এক জায়গায় পরিমল ভালোবাসার তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির কথা ভাবতে বসে দেখছে, প্রেমের কোনো দায়িত্ব নেই, আজ যেমন আছে চিরকাল তেমন থাকবে না। ভালোবাসার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা ও বিষাদ এই কারণে যে, অন্য সকল অজড় সৌন্দর্যের মতন তার ক্ষয় আছে, পরিবর্তন আছে।... পরিমল বোধহয় অক্ষয় প্রেম, অপরিবর্তনীয় প্রেম কামনা করছিল, যা এ-সংসারে অসম্ভব।

নিরুপমার দোষ এই, সে সাধারণ মেয়ে। নিতান্ত সাধারণ চোখে সে প্রেম এবং ঘর-সংসার সুখ দেখতে চেয়েছে। পরিমলকে গ্রহণ করতে সে দ্বিধা করেছিল। এই দ্বিধার অনেকটা মন্মথ মারফৎ এসেছে, বাকিটা নিরুপমার সাধারণ ইচ্ছার জন্যে এসেছে।

'নরক হইতে যাত্রা' বসুধার নিজের গল্প। নিরুর প্রেম শেষাবধি তাকে শান্তি দেয় নি। এমনকি নিরুকে সত্যিই তার কোনো এক বন্ধু বিয়ে করে নিয়েছিল। প্রেমের এই ব্যর্থতা আমরা যে ভাবে গ্রহণ করতাম, বসুধা সেভাবে গ্রহণ করে নি। সে বলতো, আমাদের প্রেমের ধারণা খুব ছোট, শুধু একটিমাত্র মানুষকে অবলম্বন করে; সে ছেড়ে গেলে দুঃখে মরে যাই, ছটফট করি, কাতর হই। কেন এমন হবে? কেন?

'কেন'-র ভুত কোনোদিন ওর ঘাড় থেকে নামে নি। বলতে নেই, বসুধা আমাদের ছোটাখাটো ভালোবাসাকেই পছন্দ করে নি। এই ভালোবাসাকে সে শেষ পর্যন্ত বাতিল করেছে। সে দেখেছে, আমাদের এই সংসারের শত রকম গ্লানি, তুচ্ছতা, ধূর্ততা, প্রাপ্তির ইচ্ছা আমাদের আত্মিক দীনতাকে ক্রমশই দীন করে তুলেছে। তার ধারণা— আমরা নিজেদের দীনতার জন্য নরকবাসী জীব হয়ে আছি। এই নরক থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টাই তার 'নরক হইতে যাত্রা'। ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রাপ্তিও থেকে সম্ভবত সে কোথাও চলে যাবার চেষ্টা করেছিল।

কলকাতা ছেড়ে বসুধা যে বছর গেল, সে বছর আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী বসুধার লেখার খুব অনুরাগী ছিল কিনা, জানি না, তবে তাকে চিনত। বসুধাকে আমি বিয়ের সময় থাকতে বলেছিলাম, সে থাকে নি। তার মাস কয় মাত্র আগে আমরা তার বই ছেপেছিলাম।

বসুধার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগাযোগ আর ঘটে নি! বছরে এক-আধবার তার চিঠি পেয়েছি। ভুবনও আমার মতো কদাচিৎ একটা-দুটো চিঠি পেত। আমরা বসুধার চিঠি থেকে বুঝতে পারতাম সে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। তারপর দেখলাম সে খুব

ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আর একেবারে শেষে জানলাম, সে ঈশ্বর বিসর্জন দিয়ে সেবাব্রতী হয়ে উঠেছে।

বসুধার শেষ দুটি লেখা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য নেই। আমি নরকবাসী জীব। নরক থেকে যাত্রা শুরু করে বসুধা যে সব পথে যাবার চেষ্টা করেছে তার খোঁজ আমি রাখি না। হয়তো তার চতুর্থ গল্প 'ঈশ্বর' এবং পঞ্চম গল্প 'আশ্রয়' তার জীবনের শেষ কয়েক বছরের ইতিবৃত্ত জানাতে পারবে। এই দুটি লেখাই ভুবন কাশী থেকে ফেরার সময় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মেয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল. লেখা দুটির পাণ্ডুলিপি থেকে বেশ বোঝা যায়, দুটি লেখাই অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত; পড়ার পর পাঠকও তা অনুভব করতে পারবেন।

'ঈশ্বর' গল্পটি স্বাভাবিক ধাঁচে লেখা নয়। আমরা এটিকে প্রতীকী গল্প বলতে পারি। পড়তে বসলে অসাধারণ এক সারল্যের সংবাদ পাব। শেষাবধি অবশ্য কিসের যেন অভাব বোধ করি। গল্পের শুরুতেই অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যাবে। একটি পথযাত্রী কোনো এক দুর্যোগের সময় অন্ধকারেই এক মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্ধকারেই সাক্ষাৎ ঘটল। কথাবার্তার মধ্যে এক সময় সন্ন্যাসী বললেন, তাঁর ঝুলিতে একটা প্রদীপ, তাকে যে কোনো সময় যে কোন দুর্যোগে—জ্বালিয়ে নিয়ে পথ চলা যায়। যাত্রী বলল, 'তবে আপনি কেন সে প্রদীপ না জ্বালিয়ে এই অন্ধকারে বসে আছেন?' সন্ন্যাসী বললেন, 'আমার কাছে তিনটি প্রদীপ, তার একটি আসল, দুটি নকল। আমি আসল-নকল ভেদাভেদ করতে পারছি না অন্ধকারে।'

শুনে যাত্রীর আকাঙ্খা হলো, আহা, যদি তার হাতে প্রদীপগুলি থাকত, বড় ভালো হতো, সন্ন্যাসী যেন এই আকাঙ্খা বুঝতে পারলেন তার। বললেন, 'তুমি যদি পার, আসলটি খুঁজে নাও।'...যাত্রী প্রদীপগুলি তার হাতে দিতে বলল। সন্ন্যাসী দিলে। অন্ধকারে যাত্রীর কাছে তিনটি প্রদীপই একই রকম মনে হলো, সে ভেদাভেদ করতে পারল না...সন্ন্যাসী বললেন, 'পারলে না?' যাত্রী বলল, 'না।' সন্ন্যাসী তখন প্রদীপ তিনটি ফেরৎ নিয়ে বললেন, 'এর একটি নিশ্চয় জ্বলবে। যে জ্বালাতে জানে তার হাতে জ্বলবে। সে নিজের গুণে জ্বালিয়ে রাখতে পারবে।'

গল্পটি এখানে শেষ হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি দেখে বোঝা যায়, বসুধা আরো কিছু লিখতে চেষ্টা করেছিল অনেকবার, পারে নি। সম্ভবত সে এই হেঁয়ালির কোনা অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেছিল, বিফল হয়েছে।

শেষের গল্পটির নাম 'আশ্রয়'। কাশী শহর নিয়ে লেখা গল্প। গল্পের শুরু আছে শেষ নেই। বসুধা উত্তমপুরুষে গল্পটি শুরু করেছিল, শীতের দিকে কাশীর গ্রামাঞ্চলে মড়ক বাধে প্রতি বছর। সেবারে ভীষণ মড়ক বেধেছিল, লোকজন পালাচ্ছিল। সরকারী লোকজনও গ্রামে যাচ্ছিল না। গঙ্গার ঘাটে অবিরাম চিতা জ্বলছিল। গল্পের

নায়ক একদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি আসার পথে অনুভব করল, গ্রামান্তর থেকে কে যেন তাকে ডাকছে, সম্ভবত সেই গ্রাম্য বন্ধুটি, যে তাকে গ্রাম্য সুরে দোঁহা গেয়ে শোনাত।

...বসুধা যেন সেই দোঁহার সুর শুনতে পেল ' আমরা বড় দুঃখী, বড় চঞ্চল, গাছের যেমন শেকড় আছে আমাদের তেমন শেকড় নেই; আমরা একজায়গায় থাকতে পারি না।

বসুধা আর বাড়ি ফিরল না, গ্রামান্তরের দিকে—যে দিকে মড়ক—সে দিকে চলে গেল।

গল্পটি ওই পর্যন্ত লেখা : পরে আর লেখা হয় নি। ভুবন বলে, গল্পটি লেখার পরের দিন বসুধা চলে গিয়েছিল, সেই কাশীর বৃদ্ধ বা তার মেয়ে জানে না।

ছোটনাগপুরের এক অখ্যাত জায়গায় মিশনের এক হাসাপাতালে বসুধা মারা যায়। আমরা তার মৃত্যু-সংবাদ জেনেছি অনেকদিন পরে। হাসপাতালে সে কিছু লিখেছিল বলে মনে হয় না। তার লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

বসুধার সমস্ত লেখার বিচার আমি বন্ধু হিসেবে করেছি, হয়তো অন্যায় করেছি, কিন্তু আমার পক্ষে সেইটাই স্বাভাবিক। পাঠক আমায় মার্জনা করবেন।

এই বইয়ের গোড়ায় একটি উৎসর্গপত্র আছে। প্রথম বারেও ছিল। বলা বাহুল্য, সেই উৎসর্গপত্রে যে নিরুপমা রায়-এর নাম উল্লেখ আছে, তিনি স্ত্রী নন, তিনি বসুধার সেই নিরুপমা।

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন, জুলাই, ১৯৬৮

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২—)
জন্ম খড়গপুরে। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লিখতে শুরু করেন। নানা চাকরির শেষে দৈনিক পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক। অরণ্যের পটভূমিতে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। এখন শহর-জীবন নিয়েই গল্প-উপন্যাস লেখেন। তাঁর কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে। ভাষা মার্জিত, লাবণ্যমণ্ডিত। কেবল বিষয়-বৈচিত্রে অভিনবত্ব নয়, ট্রিটমেণ্টেও তিনি স্বকীয়।

ভারতবর্ষ

ফৌজী সংকেতে নাম ছিল বি এফ থ্রী-থার্টি-টু, BF 332, সেটা আদপে কোন স্টেশনই ছিল না, না প্ল্যাটফর্ম, না টিকিটঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটাতার দিয়ে রেল লাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বাস্, ঐটুকুই। সারাদিনে আপ-ডাউনের একটা ট্রেনও থামতো না। থামতো, শুধু একটি বিশেষ ট্রেন। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় এসে থামতো। কবে কখন সেটা থামবে, তা শুধু এক-আমরাই আগে থেকে জানতে পেতাম, বেহারী কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

স্টেশন ছিল না, ট্রেন থামতো না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিল। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আণ্ডাহল্ট'।

আণ্ডা মানে ডিম। আণ্ডাহল্টের কাছ ঘেঁষে দুটো বেঁটেখাটো পাহাড়ী টিলার পায়ের নিচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিল, গ্রামে-ঘরে মুর্গী চরে বেড়াতো। দূরে অনেক দূরে ভুরকুণ্ডার শনিচারী-হাটে-হাটে সেই মুর্গী কিংবা মুর্গীর ডিম বেচতেও যেতো মাহাতোরা। কখনো সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ লড়াই খেলতে যেত। কিন্তু সে জন্য বি এফ থ্রি-থার্টি-টুর নাম আণ্ডাহল্ট হয়ে যায় নি।

আসলে মাহাতোগাঁয়ের ডিমের ওপর আমাদের কোন লোভই ছিল না।

আমাদের ঠিকাদারের সঙ্গে রেলওয়ের ব্যবস্থা ছিল, একটা ঠেলা-ট্রলিও ছিল তার, লাল শালু উড়িয়ে সেটা রেলের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে এসে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে যেত। নামিয়ে দিয়ে যেত রাশি রাশি ডিম। বেহারী কুক ভগোতীলাল আগের রাত্রে সেগুলি সেদ্ধ করে রাখতো।

কিন্তু সেজন্যেও নাম আণ্ডাহল্ট হয় নি। হয়েছিল ফুলবয়েল্ড ডিমের খোসা কাঁটাতারের ওপারে ক্রমশ স্তূপীকৃত হয়ে জমছিল বলে। ডিমের খোসা দিনে দিনে পাহাড় হচ্ছিল বলে।

ফৌজী ভাষার বি এফ থ্রি-থার্টি-টুর প্রথমেই যে দুটো অ্যালফাবেট, আমাদের ধারণা ছিল তা সংকেত নয়, ব্রেকফার্স্ট কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ।

রামগড়ে তখন পি ও ডব্লু ক্যাম্প, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা সেখানে বেয়নেটে আর

কাঁটাতারে ঘেরা। তাদের মাঝে মাঝে একটা ট্রেনে বোঝাই করে এ-পথ দিয়ে কোথায় যেন চালান করে দিত। কেন এবং কোথায় আমরা কেউ জানতাম না।

শুধু আমরা খবর পেতাম ভোরবেলায় একটা ট্রেন এসে থামবে।

ঠিকাদারের চিঠি পড়ে আগের দিন ডিমের ঝুড়িগুলো দেখিয়ে কুক ভগোতীলালকে বলতাম, তিনশো তিশ ব্রেকফাস্ট।

ভগোতীলাল গুণে গুণে ছশো ষাট আর গোটা পঁচিশ ফাউ বের করে নিত। যদি পচা বের হয়, তারপর সেগুলো জলে ফুটিয়ে শক্ত ইঁট হয়ে গেলে তিনটে সার্ভার কুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোসা ছাড়াতো।

কাঁটাতারের ওপারে সেগুলোই দিনে স্তূপীকৃত হতো।

সক্কাল বেলায় ট্রেন এসে থামতো, আর সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে ট্রেনের দুপাশে ঝুপঝাপ নেমে পড়তো মিলিটারি গার্ড। সঙ্গীন উঁচুকরা রাইফেল নিয়ে তারা যুদ্ধবন্দীদের পাহারা দিত।

ডোরাকাটা পোশাকের বিদেশী বন্দীরা একে এক কামরা থেকে নেমে আসতো বড়সড়ো মগ আর এনামেলের থালা হাতে।

দুটো বড়-বড় ড্রাম উল্টে রেখে সে দুটোকেই টেবিল বানিয়ে সার্ভার কুলি তিনজন দাঁড়াতো। আর ওরা লাইন দিয়ে একে-একে এগিয়ে ব্রেকফাস্ট নিতো। একজন কফি ঢেলে দিত মগে, একজন দুপীস করে পাঁউরুটি দিত, আরেকজন দিত দুটো করে ডিম। ব্যস্, তারপর ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠতো। কাঁধে আই-ই, খাঁকি রুশ-সার্ট পরা গার্ড হুইস্‌ল্ দিত, ফ্ল্যাগ নাড়তো, ট্রেন চলে যেত।

মাহাতোরা কেউ কাছে আসতো না, দূরে দূরে ক্ষেতিতে জনারের বীজ রুইতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে দেখতো।

ট্রেন চলে যাওয়ার পরে ভগোতীলালের জিম্মায় টেণ্ট রেখে আমরা কোন-কোন দিন মাহাতোদের গ্রামের দিকে চলে যেতাম সব্জীর খোঁজে। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে ওরা সর্ষে বুনতো, বেগুন আর ঝিঙেও।

আগুাহল্ট একদিন হল্ট-স্টেশন হয়ে গেল রাতারাতি। মোরম ফেলে লাইনের ধারে কাঁটাতারে ঘেরা জায়গাটুকু উঁচু করা হল প্ল্যাটফর্মের মতো।

তখন আর শুধু পি-ও-ডব্লু নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারি স্পেশালও এসে দাঁড়াত। গ্যাবার্ডিনের প্যাণ্ট-পরা হিপ-পকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান সৈনিক স্পেশাল। মিলিটারি পুলিশ ট্রেন থেকে নেমে পায়চারী করতো, দু-একটা ঠাট্টাও ছুঁড়তো, আর সৈনিকের দল তেমনি সারি দিয়ে মগ আর থালা হাতে একে একে এসে রুটি নিত, ডিম নিত, মগ ভর্তি কফি। তারপর যে-যার কামরায় গিয়ে আবার উঠতো, খাঁকি বুশ-শার্টের গার্ড হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ফ্ল্যাগ নাড়তো, আমি ছুটে গিয়ে সাপ্লাই ফর্মে মেজরকে দিয়ে ও-কে করাতাম।

ট্রেন চলে যেত, কোথায় কোনদিকে আমরা কেউ জানতে পারতাম না।

সেদিনও এমনি আমেরিকান সোলজারদের ট্রেন এসে দাঁড়াল। সার্ভার কুলি তিনটি, ডিম রুটি কফি সার্ভ করছিল। ভগোতীলাল নজর রাখছিল কেউ ডিম পচা কিংবা রুটি স্লাস-এণ্ড বলে ছুঁড়ে দেয় কিনা।

ঠিক সেই সময় আমার হঠাৎ চোখ গেল কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে।

কাঁটাতার থেকে আরো খানিক দূরে নেংটি-পরা মাহাতোদের একটা ছেলে চোখ বড়ো করে তাকিয়ে দেখছে। কোমরের ঘুন্‌সিতে লোহার টুকরো বাঁধা ছেলেটাকে একটা বাচ্চা মোষের পিঠে বসে যেতে দেখেছি একদিন।

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল ট্রেনটা। কিংবা রাঙামুখ আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল।

একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ 'হে-ই' বলে চিৎকার করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে নেংটি-পরা ছেলেটা পাঁই-পাঁই করে ছুটে পালালো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে। কয়েকটা আমেরিকান সৈনিক তখন হা-হা করে হাসছে।

ভেবেছিলাম ছেলেটা আর কোনোদিন আসবে না।

মাহাতোরা কেউ আসতো না, কেউ না। ক্ষেতিতে কাজ করতে করতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা শুধু অবাক চোখ মেলে দূর থেকে দেখতো।

কিন্তু তারপর আবার যেদিন ট্রেন এলো, ট্রেন থামলো, সেদিন আবার দেখি কোমরের ঘুন্‌সিতে লোহা-বাঁধা ছেলেটা কাঁটাতারের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আরেকটা ছেলে, তার চেয়ে আরেকটু বেশি বয়েস। গলায় লাল সুতোয় ঝুলানো দস্তার তাবিজ, ভূরকুণ্ডার হাটে একদিন গিয়েছিলাম, রাশি রাশি বিক্রী হয় মাটিতে ঢেলে, রাশি রাশি সিঁদুর, তাবিজ, তামার পিতলের দস্তার, বাঁশে ঝোলানো থাকে রঙিন সুতলি, পুঁতির মালা। একটা ফেরিওলাকে দেখেছি কখনো কখনো এক হাঁটু ধূলো নিয়ে, কাঁধে অগুন্‌তি পুঁতির ছড়, দূর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে যায়।

ছেলে দুটো অবাক-অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল। প্রথম দিনের বাচ্চাটার চোখে একটু ভয়, হাঁটু তৈরি, কেউ চোখে একটু ধমক মাখালেই সে চট করে হরিণ হয়ে যাবে।

আমি হাতে ফর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম। সুযোগ পেলে হেসে-হেসে মেজরকে তোয়াজ করছিলাম। একজন সৈনিক তার কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে ছেলে দুটোকে দেখে পাশের জি আইকে বললে, অফুল!

আমার এতদিন মনে হয় নি। ওরা তো দিব্যি ক্ষেতে খামারে কাজ করে, গুল্‌তি নয়তো তীর ধনুক নিয়ে খাটাস মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার

মতো কখনো টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। নেংটি-পরা সরু শরীর, কালো, রুক্ষ। কিন্তু ব্যাটা জি আই-এর 'অফুল' কথাটা যেন আমাকে খোঁচা দিল। ছেলে দুটোর ওপর আমার খুব রাগ হলো।

সৈনিকদের মধ্যে একজন গলা ছেড়ে এক কলি গান গাইলো, দু-একজন হা-হা করে হাসছিল, একজন চটপট কফির মগে চুমুক দিয়ে সার্ভার কুলিটাকে চোখ মেরে আবার ভর্তি করে দিতে বললে। গার্ড এগিয়ে দেখতে এলো আর কত দেরী। পাঞ্জাবী গার্ড কিন্তু দিব্যি চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বললে মেজরের সঙ্গে।

তারপর হুইস্‌ল্ বাজলো, ফ্লাগ নাড়লো, সবাই চটপট উঠে পড়লো ট্রেনে, হাতে চওড়া লাল ফিঁতে বাঁধা মিলিটারি পুলিসরাও।

ট্রেন চলে গেলে আবার সেই শূন্যতা, ধূ-ধূ বালির মধ্যে ফণিমনসার গাছের মতো শুধু সেই কাঁটাতারের বেড়া।

দিনকয়েক পরেই আবার একটা ট্রেন এলো। এবার পি-ও-ডব্লু গাড়ি, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা রামগড় থেকে আবার কোথাও চালান হচ্ছে। কোথায় আমরা জানতাম না, জানতে চাইতাম না।

ওদের পরনে স্ট্রাইপ দেওয়া অন্য পোশাক, মুখে হাসি নেই, রাইফেল উঁচিয়ে সারাক্ষণ ওদের ট্রেনটা চারদিক থেকে গার্ড দেওয়া হতো। আমাদেরও একটু ভয়-ভয় করতো। ভূরকুণ্ডায় গল্প শুনে এসেছিলাম, একজন নাকি ধুতি পাঞ্জাবী পরে পালাবার চেষ্টা করছিল, পারে নি। বাঙালী বলেই আমার আরো ভয়-ভয় করতো।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, কাঁটাতারের ওপারে শুধু সেই বাচ্চা ছেলে দুটো নয় খাটো কাপড়ের একটা বছর পনেরোর মেয়ে, দুটো পুরুষ ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো, হাসলো, কলকল করতে করতে ঝর্ণার জলের মতো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

একজন, দুজন, পাঁচজন—সেদিন দেখি জন দশেক মাহাতোগাঁয়ের লোক ট্রেন আসতে দেখেই মাঠ থেকে দৌড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের জানলায় খাকি রঙ দেখেই বোধহয় ওরা বুঝতে পারতো। দিনে দুখানা প্যাসেঞ্জার মেল-ট্রেনের মতো হুস করে বেরিয়ে যেত, দু-একখানা গুড্‌স্ ট্রেন ঠুং-ঠুং করতে করতে। তখন তো কই থামবে ভেবে মাহাতোগাঁয়ের লোক আসতো না ভিড় করে!

একদিন গিয়ে বলেছিলাম মাহাতোবুড়োকে, লোক পাঠিয়ে আমাদের আণ্ডাহল্টের তাঁবুতে বেচে আসতে সব্জী আর চিংড়ি, সরপুটি, মৌরলা।

বুড়ো হেসে বলেছিল—ক্ষেতির কাজ ছেড়ে যাবো নাই।

তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কালো-কালো নেংটি-পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ির মেয়েগুলোকে। শুধু খালি গা মাহাতোবুড়োর পায়ে একটা টাঙি জুতো,

গেঁয়ো মৃধার কাছে বানানো টাঙি জুতো, এসে সারি দিয়ে ওরা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে দাঁড়ালো।

ট্রেন ততক্ষণ এসে গেছে। ঝুপঝাপ নেমে পড়ে আমেরিকান সৈনিকের দল সারি দিয়ে চলেছে মগ আর থালি হাতে।

দু'শো আঠারো ব্রেকফাস্ট তখন রেডি বি এফ থ্রি-থার্টি-টুতে। বি এফ থ্রি-থার্টি-টু মানে আগুাহল্ট।

তখন একটু শীত-শীত পড়তে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ে কুয়াশার মাফলার জড়ানো। গাছগাছালি শিশির ধোয়া সবুজ।

একজন সৈনিক ইয়াঙ্কি গলায় মুগ্ধতা প্রকাশ করলো।

আরেকজন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটাতারের ওপারের রিক্ততার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কফির মগটা ট্রেনের পা-দানিতে রেখে সে হিপ-পকেটে হাত দিলো। ব্যাগ থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিলো মাহাতোদের দিকে।

ওরা অবাক হয়ে সৈনিকটার দিকে তাকালো, কাঁটাতারের ভিতরে মোরমের ওপর পড়ে থাকা চকচকে আধুলিটার দিকে তাকালো, নিজেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলো।

ট্রেনটা চলে যাবার পর ওরা নিঃশব্দে ফিরে চলে যাচ্ছিল দেখে আমি বললাম, সাহেব বখশিস্ দিয়েছে, বখশিস্, তুলে নে।

সবাই সকলের মুখের দিকে তাকালো, কেউ এগিয়ে এলো না।

আমি আধুলিটা তুলে মাহাতোবুড়োর হাতে দিলাম। সে বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

আমার এই ঠিকাদারের তাঁবেদারি একটুও ভালো লাগতো না। জনমনুষ্য নেই, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় না, তাঁবুতে ভগোতীলাল আর তিনটে কুলি। নির্জন নির্জন। মাটি রুক্ষ, দুপুরের আকাশ রুক্ষ, আমার মন।

মাহাতোগাঁয়ের লোকরাও কাছ ঘেঁষতো না। মাঝে মাঝে গিয়ে সব্জী কিংবা চুনো মাছ কিনে আনতাম। ওরা বেচতে আসতো না, কিন্তু ভূরকুণ্ডার হাটে যেত তিনক্রোশ পথ হেঁটে।

দিনকয়েক কোন ট্রেনের খবর ছিল না। চুপচাপ, চুপচাপ।

হঠাৎ সেই কোমরের ঘুন্সিতে লোহা-বাঁধা ছেলেটা একদিন এসে জিজ্ঞেস করলো, টিরেন আসবে না বাবু?

হেসে ফেলে বললাম, আসবে আসবে।

ছেলেটার আর দোষ কি, বেঁটে-বেঁটে পাহাড়, রুক্ষ জমি, একটা দেহাতী ভিড়ের বাস দেখতে হলেও দু ক্রোশ হেঁটে যেতে হয় খয়ের গাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে।

সকালে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন একটুও স্পীড না কমিয়ে হুস করে বেরিয়ে যেত, বিকেলের ডাউন ট্রেনটাও থামতো না, তবু কয়েক মুহূর্ত জানলায় ঝাপসা মুখ দেখার জন্যে আমরা তাঁবুর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতাম। মানুষ না দেখে, নতুন মুখ না দেখে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

তাই আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল ট্রেন আসছে শুনলে যেমন বিব্রত বোধ করতাম তেমনি আবার স্বস্তিও ছিল।

দিনকয়েক পরেই প্রথমে এলো খবর, তার পরদিন মিলিটারি স্পেশাল। ঝুপঝাপ করে জি আইরা নামলো, সারি দিয়ে ডিম রুটি মগ ভর্তি কফি নিলো।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে মাহাতোগাঁয়ের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বিশ হতে পারে, তিরিশ হতে পারে, হাঁটু সমান বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কত কে জানে। খাটো শাড়ির মেয়েগুলোও বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। ওদের দেখে কেমন ভয়-ভয় করলো। ভগোতীলাল কিংবা সার্ভার কুলি তিনটে মাহাতোগাঁয়ের দিকে যেতে চাইলে আমার বড় ভয়-ভয় করতো।

প্ল্যাটফর্ম তো ছিল না, শুধু উঠতে-নামতে সুবিধের জন্যে লাইনের ধারটুকু মোরম ফেলে উঁচু করা হয়েছিল। আমেরিকান সৈনিকরা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে পায়চারী করছিল। দু-একজন স্থির দৃষ্টিতে মাহতোগাঁয়ের কালো-কালো মানুষগুলোকে দেখছিল।

হঠাৎ একজন ভগোতীলালের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিপ-পকেট থেকে ব্যাগ বের করলো, ব্যাগ থেকে একখানা দু টাকার নোট, তারপর জিজ্ঞেস করলে, কয়েন্‌স আছে? নোট ভাঙানো খুচরো সৈনিকরা কেউ রাখতেই চাই তো না, পয়সা ফেরৎ না দিয়ে দোকানী কিংবা ফেরিওয়ালা কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাঁচিতে গিয়ে কয়েকবার দেখেছি।

এক আনি, দু আনি আর সিকি মিলিয়ে ভগোতীলাল ভাঙিয়ে দিচ্ছিলো, হঠাৎ দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে ভিড়ের ভিতর থেকে কোমরের ঘুন্‌সিতে লোহার টুকরো বাঁধা সেই ছেলেটা হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে কি চাইছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভগোতীলালের কাছ থেকে সেই খুচরো আনি-দুয়ানিগুলো মুঠোর মধ্যে দিয়ে সেই আমেরিকান সৈনিক মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমার তখন সাপ্‌লাই ফর্ম ও-কে করানো হয়ে গেছে, গার্ড হুইসল দিয়েছে।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, অমনি মাহাতোদের দিকে ফিরে তাকালাম।

ওরা তখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, তাকিয়ে ছিল। তারপর হঠাৎ, লাল মোরমের ওপর, ছড়ানো পয়সাগুলোর ওপর কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোমরের ঘুনসিতে লোহা-বাঁধা ছেলেটা, আর গলার সুতলিতে দস্তার তাবিজ-বাঁধা ছেলেটা।

সেই মুহূর্তে টাঙি-জুতো পরা মাহাতোবুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠলো খবর্দার!

এমন জোরে চিৎকার করলো যে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম।

কিন্তু বাচ্চা দুটো ওর কথা শুনলো না। তারা দুজনে তখন যে-যত পেরেছে আনি দু আনি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ খোসা ছাড়ানো কচি ভুট্টার মতো হাসছে। মেয়েপুরুষের সমস্ত ভিড় হাসছে।

টাঙি-জুতো পরা মাহাতোবুড়ো রেগে গিয়ে তাদের ভাষার অনর্গল কি সব বলে গেল। মেয়েপুরুষের ভিড় হাসলো।

মাহাতোবুড়ো রাগে গজগজ করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল একাই। মাহাতোগাঁয়ের লোকগুলোও চলে গেল কলকল কথা বলতে বলতে, খলখল হাসতে হাসতে।

ওরা চলে যেতেই আণ্ডাহল্টে আবার নির্জন নিস্তব্দ শূন্যতা। আমার এক-এক সময় ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেত। দূরে-দূরে পাহাড়, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ পার হয়ে একটা ছোট্ট জল চোঁয়ানো ঝর্ণা, মাহাতোগাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। চোখ জুড়িয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মধ্যে কালো-কালো নেংটি-পরা মানুষ।

এদিকে মাঝে মাঝেই আমেরিকান সোলজারদের ট্রেন আসে, থামে, ডিম রুটি মগভর্তি কফি খেয়ে চলে যায়। মাহাতোগাঁয়ের লোক ভিড় করে আসে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সারি দিয়ে দাঁড়ায়—

—সাব বখশিস, সাব বখশিস!

একসঙ্গে অনেকগুলো দেহাতী গলা চিৎকার করে উঠলো।

মেজরের কাছে ফর্ম ও-কে করাতে গিয়ে আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

দেখলাম, শুধু বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।

একদিন সব্জী কিনতে গিয়েছিলাম, ঐ মেয়েটা হেসে হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, টিরেন কবে আসবে।

এক-একদিন অকারণেই ওরা দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো, অপেক্ষা করে করে চলে যেত।

কাঁধে স্ট্রাইপ তিন-চারটে আমেরিকান ততক্ষণে হিপ-পকেট থেকে মুঠোমুঠো আনি দু আনি বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করে নি, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো পয়সাগুলোর ওপর। হুড়োহুড়িতে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হাত পা ছড়ে গেল কারো, করো বা নেংটির কাপড় ফেঁসে গেল।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভালো করে লক্ষ্য করলাম ওদের। মনে হল মাহাতোগাঁয়ের আধাখানাই এসে জড়ো হয়েছে। সবারই মুখে স্ফূর্তির হাসি, সবাই কিছু না কিছু পেয়েছে। কিন্তু তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও সেই টাঙি-জুতোর মাহাতোবুড়োকে দেখতে

পেলাম না। মাহাতোবুড়ো আসে নি। সেদিন ওর আপত্তি, ওর ধমক শুনেও পয়সাগুলো ফেলে দেয় নি ছেলে দুটো। তাই বোধহয় রেগে গিয়ে আর আসে নি।

আমার ভাবতে ভালো লাগলো বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা একা মাটি কোপাচ্ছে।

আমাদের দিন, কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমাদের পাঁচজনের দিন আণ্ডাহল্টের তাঁবুর মধ্যে কোন রকমে কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এক-একদিন সৈনিক বোঝাই ট্রেন আসছিল, থামছিল, চলে যাচ্ছিল। মাহাতোগাঁয়ের লোক ভিড় করে এসে কাঁটাতারের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াতো, হাত বাড়িয়ে সবাই 'সাব বখশিস সাব বখশিস' চ্যাচাতো।

হঠাৎ এক একদিন মাহাতোবুড়োকে দেখতে পেতাম। কোনদিন ক্ষেতের কাজ ফেলে দু হাতের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে হন-হন করে এগিয়ে আসতো, রেগে গিয়ে ধমক দিতো সকলকে। ওর কথা শুনছে না বলে কখনো বা অসহায় প্রতিবাদের চোখে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। সৈনিকরা হিপ-পকেটে হাত দিয়ে হা-হা করে হাসতে-হাসতে মুঠোভর্তি পয়সা ছুঁড়ে দিত। মাহাতোগাঁয়ের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়তো সেই পয়সাগুলোর ওপর, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধাতো। তা দেখে সৈনিকরা হা-হা করে হাসতো।

শেষে পর-পর কয়েক দিনই লক্ষ্য করলাম টাঙি-জুতো পরা মাহাতোবুড়ো আর আসে না। মাহাতোবুড়ো ওদের দেখে রেগে যেত বলে, মাহাতোবুড়ো আর আসতো না বলে আমার এক ধরনের গর্ব হত। কারণ এক-এক সময় ঐ লোকগুলোর ব্যবহারে আমরা—আমি আর ভগোতীলাল খুব বিরক্তি বোধ করতাম। ভিতরে ভিতরে লজ্জা পেতাম। ওদের কালাকুলো দীন-দরিদ্র বেশ দেখে সৈনিকের দল নিশ্চয় ওদের ভিখিরি ভাবতো। ভাবতো বলে আমার খুব খারাপ লাগতো।

সেদিন কাঁটাতারের ওপার থেকে ওরা 'বখশিস বখশিস' বলে চিৎকার করছে, কাঁধে আই-ই তাকি বুশ সার্টের গার্ড জানকীনাথের সঙ্গে আমি গল্প করছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন অফিসার মচমচ করে যেতে ওদের চিৎকার শুনে থুতু ফেলার মতো গলায় বলে উঠলো, ব্লাডি বেগার্স।

আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। শুধু অক্ষম রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম।

ব্লাডি বেগার্স, ব্লাডি বেগার্স।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মাহাতোদের ওপর। ট্রেন চলে যেতেই আমি ভগোতীলালকে সঙ্গে নিয়ে ওদের তাড়া করে গেলাম ওরা কুড়োনো পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে হাসতে হাসতে পালালো।

তবু ওদের জন্যে সমস্ত লজ্জা আমি একটা অহঙ্কারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে সেই অহঙ্কারটা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো মাহাতোবুড়োর চেহারা নিয়ে।

কিন্তু সেদিন আমরা বুকের মধ্যের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ভূরকুণ্ডায় ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই খবর পেয়েছিলাম।

সার্ভার দুজন কুলি তখন টেবিল বানানো ড্রাম দুটোকে পায়ে ঠেলে আণ্ডাহল্টের কাঁটাতারের ওপারে সরিয়ে দিচ্ছিল। তাঁবুর দড়ি খুলছিল আর একজন। ভগোতীলাল ড্রামটার গায়ে একটা জোর লাথি মেরে বললে, খেল খতম, খেল খতম।

হঠাৎ হই-হল্লা শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মাহাতোগাঁয়ের লোক ছুটতে ছুটতে আসছে।

আমরা অবাক হয়ে তাকালাম তাদের দিকে। ভগোতীলাল কি জানি কেন হেসে উঠলো।

ততক্ষণে কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হুইস্‌ল শুনতে পেলাম, ট্রেনের শব্দ কানে এলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটা বাঁক নিয়ে আণ্ডাহল্টের দিকেই আসছে, জানালায় জানালায় খাকি পোশাক।

আমরা বিব্রত বোধ করলাম, আমরা অবাক হলাম। তা হলে খবর পাঠাতেই ভুলে গেছে ভূরকুণ্ডার আপিস? না, যে খবর শুনে এসেছি সেটাই ভুল?

ট্রেনটা যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গম-গম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয় গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন, ট্রেন ভর্তি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো সেই মাহাতোবুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতোবুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিস, সাব বখশিস!

উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতোবুড়ো।

কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্যদিনের মতো এবারে আর আণ্ডাহল্টে এসে থামলো না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতোই আণ্ডাহল্টকে উপক্ষো করে হুস্ করে চলে গেল। আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না।

ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিখিরি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব—সব ভিখিরি হয়ে গেল।

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য গল্প, ১৯৬৯

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ (১৯৩০--)
জন্ম মুর্শিদাবাদের গ্রামে। জীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। মুর্শিদাবাদের ভ্রাম্যমাণ আলকাপ্ দলের 'মাস্টার' গীতিকার ছিলেন (১৯৫০-৫৮), সাংবাদিকতা করেন তারও আগে (১৯৪৯-৫০)। প্রথম গল্প 'ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন'। লেখাই তাঁর জীবিকা। বাংলার মাটির মানুষ তাঁর রচনায় যেমন জায়গা পেয়েছে, তেমনি শহরের মানুষরাও। তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন লেখক।

তাসের ঘরের মতো

১. দীপক মিত্র

যদ্দূর দৌড়েছি, দুপাশে কোন দরজা খোলা দেখি নি। কোন জানলাও না। কোন লোক না। থমথমে অন্ধকার। ভিজে রাস্তা। শহরে আচমকা ব্লাক আউট যেন। এবং এত স্তব্ধতাও ভারি অস্বাভাবিক। যদিও রাত দশটা বেজে গেছে, এবং পিছনের দিকে সাংঘাতিক কিছু সদ্য ঘটেছে, এই শহরটাকে ভয় পাইয়ে দিতে বা রুদ্ধবাক করতে তা মোটেও বেশি নয়। উত্তরোত্তর মানুষের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে, মাথার ঘিলু শক্ত করতে হচ্ছে এবং রামবাবু-শ্যামবাবু-যদুবাবুরা থলে হাতে পটলের দরাদরি করছেন—জুতোর নিচে টাটকা রক্ত। আর, রক্তের কোন ভাষা নেই।...

পিছনে দূরে—বেশ কিছুটা দূরে পায়ের শব্দ শুনে আরও জোরে দৌড়তে থাকলুম। জানি এখন চেঁচিয়ে মাথা ভাঙলেও কোন দরজা খোলা হবে না কিংবা কোন জানলা খুলে কেউ মুখ বাড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবে না। সবাই এ দুঃসময়ে কাছিমের মতো নিজের খোলের ভিতর ঢুকে পড়েছে এবং জীববিজ্ঞানে পড়েছি, কাছিমের কোন কণ্ঠস্বর নেই।

শহরের এদিকটা আমার পুরো অচেনা। দৌড়তে দৌড়তে একটা মজার ব্যাপার টের পেলুম। বড়াই করে বলা হয় যে, অধুনা পৃথিবীর স্থল-জল অন্তরীক্ষে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই, যেখানে মানুষ না গেছে! কিন্তু কী আশ্চর্য। এখনও এ পৃথিবী দূরের কথা এই শহরটায় অনেক জায়গা আছে যেখানে আজও আমার পা পড়ে নি—যা আজও আমার কাছে অনাবিষ্কৃত! মানুষ নিয়ে বড়াইয়ে কী আসে যায়! আমি সাতাশ বছরের দুর্দান্ত যুবক দীপক মিত্র, আমি যে এখনও কত জায়গা দেখি নি সেখানে যাই নি, এবং কত কিছু অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে আমার কাছে—এবং এই দুর্ধর্ষ উত্তেজনাময় জীবন, বিপদসঙ্কুল, যে-কোন মুহূর্তে আমি বুদবুদের মতো মিলিয়ে যেতে পারি—যার জন্যে ইস্পাতের ছোট্ট একটি টুকরাই যথেষ্ট, এবং হায় আমার ব্যর্থ সাতাশটি বছর! পৃথিবী ও জীবনের অনেকখানি উন্মোচিত হবার আগে আমাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে

কিংবা ফেলে দেওয়া হবে জলে, শকুন কুকুর কাকের খাদ্য হিসেবে নির্বাচিত—হায় সুন্দর স্বাদু ফলের কোয়ার মতো আমার শরীর, আমার যৌবন, আমার মন!...

সেইজন্যেই তো আমি পালাচ্ছিলুম। আমার সারা শরীর যৌবন এবং মন তাদের নিজ নিজ ভাষায় চিৎকার করছিল, পালিয়ে বেঁচে থাকো, পালিয়ে বেঁচে থাকো।

টের পাচ্ছিলুম, ওরা এখনও আমার আশা ছাড়ে নি। আমাকে খতম না করতে পারলে ওদের স্বস্তি নেই। ওরা সমানে আমাকে অনুসরণ করছে। এবং আজ এই বিপদের রাতে শহরটাও আশ্চর্য রকম বদলে গেছে—সভ্যতার সাজানো বাগান হয়ে পড়েছে প্রাক্-ইতিহাসের জমজমাট অরণ্য। সব স্কাইস্ক্র্যাপার তাদের আলখাল্লা ত্রস্তে খুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল গাছ। এবং সব রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবু হামাগুড়ি দিতে দিতে অন্ধকারে সেই আদিমতম স্বর্গীয় গাছটার গোড়া খুঁজছে—যার ফল খেয়ে মনুষ্যজাতির অশেষ দুর্গতি, ওদের হাতে আজ সেই প্যাকেটে মোড়া ছোট-ছোট তিনটি কুঠার—যার একটির বিজ্ঞাপিত দাম মাত্র পাঁচ পয়সা!

এইবার সামনে একটা তেরাস্তা পাওয়া গেল। ডাইনে না বাঁয়ে যাবো—কয়েক মুহূর্তের ইতস্তত করা—তারপর বিচ্ছিরি আওয়াজে গুলি ছুঁড়ছে। আশ্চর্য, স্প্লিন্টারের জোনাকি জ্বালা দেখবার জন্যে বারবার এদিক-ওদিক ঘাড় ঘোরাচ্ছিলুম! বিপদের সময়েও আমাদের নির্বোধ শিশুত্ব ঠিক কাজ করে যায়।

পরক্ষণেই একলাফে বাঁ দিকে চলে গেলুম। তারপর উঁচুতে একটু আলো চোখে পড়ল। একটা জানলা খুলে কোন দুঃসাহসী মুখ-আবদ্ধ একটা গরিলা যেন রডে নাক ঘষছে। বাড়িটা সুম্‌সাম। গেটের ওপর চাপবাঁধা লতাপাতার ছাউনি। কী ফুলের গন্ধ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মগজে ঢুকে যাচ্ছিল। বুকসমান উঁচু গেটের কপাট পেরিয়ে যখন ওপারে ভিতরে পৌঁছলুম কিছু নিরাপত্তার স্বস্তি এল। তারপর মনে হল, সচরাচর এসব বাড়িতে কুকুর থাকে। বাইরে লেখা থাকে, কুকুর আছে সাবধান। কিন্তু ভিতরে ঢুকেও যখন কোন ক্রুদ্ধ গর্জন শুনছিনে, তখন নিঃসন্দেহে এ বাড়িতে কোন কুকুর নেই। কিংবা থাকলেও এখন সেটা ঘরবন্দী।

কয়েকটা মিনিট একটু জিরিয়ে নিলুম। বাইরে আর কোন আওয়াজ নেই। ওরা সম্ভবত অন্য-অন্য গলিতে ছুটোছুটি করে আমাকে খুঁজছে। আপাতত আমি কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত। ওপরের খোলা জানলার আবছা আলোয় ভিতরটা দেখে নিলুম। এক চিলতে লন—দুপাশে কিছু গাছপালা—ফুলবাগিচা। আর অন্ধকার এই বিপজ্জনক এলাকায় দুঃসময়ে হাসনাহানার সাহস! দুঃসাহস! রাগে বিরক্তিতে মেজাজ খারাপ হল। এটা ঠিক নয়, এসব ঠিক নয়। ইচ্ছে করল, শহরের তাবৎ ফুলগাছকে থাপ্পড় মেরে বলি চুপ করো! পাখিদের ধমকাই, খবর্দার এসো না, প্রেমিকপ্রেমিকাদের শাসাই। স্বামী-স্ত্রীদের পাশাপাশি শুতে নিষেধ করি। এবং কারিগরগণ নিপাত যাও... এঞ্জিনিয়ারগণ হাত ওঠাও, বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্রাম করো।

সেই সময় দূরে কোথাও বুমবুম আওয়াজ হল ফের। ঘর বাড়ি কেঁপে উঠলো। গাড়ির ঘর্ঘর গর্জন শোনা গেল। প্রচণ্ড উজ্জ্বল আলোর ঝলক এসে ফের অন্ধকারে মিশে গেল বাইরে। পুলিশ নির্ঘাৎ! এতক্ষণে পুলিশ এসে গেছে!

এক লাফে সরে এলুম। সামনে চওড়া সিঁড়ি। বেড়ার গড়নের বড় দরজাটা খোলা। তার মানে এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। বেওয়ারিস সম্পত্তির মতো। সিঁড়ির মুখের দরজাটা, রামবাবু ভাবেন শ্যামবাবু দেবেন—শ্যামবাবু ভাবেন, যদুবাবু এবং দারোয়ান যদি বা থাকে সে নেশায় বুঁদ। সে আছে। সিঁড়ির ধাপের এক পাশে চোরকুঠুরি মতো—সেখানে খাটিয়ায় নির্ঘাৎ সেই স্তব্ধ লোকটাই বটে। কয়েক ধাপ চুপিচুপি উঠে দেখলুম, দোতালার সিঁড়ির মাথায় একটা বাল্ব জ্বলছে। বাল্বটা কালিঝুলি মাখা। প্রথমে গেট ফুলগাছ ইত্যাদি দেখে ভেবেছিলুম, বাড়িটা চমৎকার এবং পরিচ্ছন্ন হবে—কিন্তু ক্রমশ তার বার্ধক্য জীর্ণতা ও অবহেলার চিহ্নগুলি চোখে চোখে পড়তে লাগল। যত উপরে উঠছি তত মনে হচ্ছে কোন অস্বস্তিকর পোড়ো জায়গায় আমি ঢুকে পড়েছি। দোতলার চারটে দরজায় তালা ঝুলছিল। দল বেঁধে কোথায় চলে গেছে ওরা? তেতলায় তিন দিকে তিনটে দরজা। ওপরের বাতিটাও তেমনি অপরিষ্কার। এখানেও দুটো দরজায় তালা ঝুলছে—একটা বাদে। তাহলে এই ঘরের জানালাতে সেই গরিলাটা দেখেছিলুম। একা না সপরিবারে থাকে ও? আশ্চর্য কোনো ফ্ল্যাটে কোন নেমপ্লেট নেই। কোনো কলিং বেল নেই। দেয়ালে লাল ও কালোতে লেখা অজস্র কথা—সে কথা আমার এবং সবার সবিশেষ মুখস্থ। এবার গা ছমছম করে উঠল। হয়তো আমার পক্ষে নিরাপদ নয় জায়গাটা। হয়তো যেচে পড়ে স্বয়ং 'ওদের' কারো খপ্পরেই ঢুকতে যাচ্ছি।

মরীয়া হতে হল। উপায় নেই। পকেটে হাত ভরে 38 ক্যালিবারের রিভলভারটা চেপে ধরলুম। একটা মাত্র গুলি আছে আর সেই যথেষ্ট। অন্তত কয়েকটি ঘণ্টা আমাকে বেঁচে থাকতে হবে নিরাপদে—পরবর্তী আরও অনেক ঘণ্টা দিন মাস বছর বেঁচে থাকবার জন্যে। এবং সেটা আমার পক্ষে ভারি জরুরী। হায় আমার সাতাশটি ব্যর্থ বছর! সে বিমুগ্ধ বেড়ালছানার মতো আমার ভিতরে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

খুবই চাপা কড়া নাড়লুম। দুবার। তারপর আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলুম।...

২. হিরন্ময় দত্তরায়

...কী ব্যাপার? ফের আলো গেল? সারা বর্ষা এ উপদ্রব সমানে চলবে। মোমবাতি কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে গেলুম কর্পোরেশন...

সেই সময় বউমা দৌড়ে এল।...শুনছেন? আজ রাতে ফের শুর হল।

লাফিয়ে উঠলুম, কী কী শুরু হল বউমা?

রানু কি বিরক্ত হল আমার ওপর? আসলে আমার কান দুটোকে বয়স ক্রমশ ক্ষয় করে ফেলেছে—ঠিক চোখ দুটোর মতোই—ওর জানা উচিত। হয় তো জানে, তবু বিরক্ত হয়। আমি জানি, রানু দিনে দিনে ক্রমশ বেশি বিরক্ত হয়ে পড়ছে আমার প্রতি। আমার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা, ছটফটানি, জানলা খুলে দিয়ে—রাত্তিরে নিচের পথটা লক্ষ্য করা এবং আচমকা কে ডাকল বলে দরজার দিকে ছুটে যাওয়া—সবই ওর পক্ষে বিরক্তিকর ঠেকছে। আমি টের পাচ্ছি এগুলো। বিশেষ করে বসবার ঘরে সৌমেনের ছবিটা রাখা তার পছন্দ হচ্ছে না। সৌমেনের সাম্প্রতিক ছবি বলতে এই একটাই—বেশ বড় সাইজ এবং একলা। তাছাড়া আর যত ছবি আছে, তা অনেক আগের এবং কিছু-কিছু বউমার সঙ্গে তোলা ছবি। সেগুলো ফ্যামিলি অ্যালবামে রয়েছে। অ্যালবামটা কখনও নিজের ঘরে রাখি কখনও রানুকে দিই বা সেই নিজেই চেয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে বর্তমানের সৌমেনকে তো পাই না। ইদানীং তার কপালে ভাঁজ পড়ছিল। চোয়াল ঠেলে উঠছিল। তার লাবণ্যটা ক্ষয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। চোখ দুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল হচ্ছিল দিনে দিনে। এবং ওই নতুন ছবিতে তার সবটুকু ধরা পড়ছিল। সৌমেন, আমার একমাত্র সন্তান বড় আদরের ওই সৌমেন! ঈশ্বরকে বলছিলুম, ওর সবটুকু জ্বালা আর উত্তাপ আমাকে দাও! পৃথিবীর অনেক শত্রুশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এ বুড়ো মানুষটির আছে। অনেক দুর্দন্ত বিষয়সমূহ আমার দেখা আছে। অনেক ভয়ঙ্কর উত্তাপ, আলো ফেটে বেরিয়ে-পড়া বিধ্বংসী আগুন, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্যোগ, অভাবিত দৈত্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। কত দুঃসময় না গেছে! এবং আমি সব সয়ে বা জয় করে আজও টিকে রয়েছি। তাই যা কিছু জ্বালাযন্ত্রণা উত্তাপ আধিব্যাধি আমার সইতে কষ্ট হবে না। কিন্তু সৌমেন! ওর জীবনটা তরুণ, নবীন ওর প্রাণ—ওর আত্মায় বড় কোমালতা। পৃথিবীর প্রতি অনেক প্রত্যাশা, ওর। জীবনকে অনেক দুর্মর মায়ায় সে গভীরতর স্বপ্নের দিকে নিয়ে চলেছিল। আমি প্রার্থনা করতুম, ওর কষ্টটা আমাকে দাও—ওর যা কিছু সুখ তা ওরই থাক। অথচ... ·

ছবির কথা বলছিলুম। এই ছবিটা যে হঠাৎ কেন তুলেছিল, তখন টের পায়নি, পরে যেন পেয়ে গেলুম। এ ছিল ওর চলে যাওয়ার সময় সান্ত্বনা পেতে দিয়ে যাওয়া একটা তাজা স্মৃতি! যেন বলে গেল, ওই নিয়েই বেঁচে থাকো।

হ্যাঁ, আমি বাহাত্তরের বুড়োমানুষ—আমি পারি শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে। এখন তো আমার মতো সবাই শুধু স্মৃতি নিয়েই বাঁচে। কিন্তু বউমা রানু? সে পারে না। তার রক্তমাংসে মনের সব কাজ যে এখনও অসমাপ্ত! সে চায় সৌমেনের রক্তমাংস—সে চায় তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বটা, পরোক্ষ কিছু নয়। তাই রানুর কষ্টটা কী, তাও আমি জানি। জানি, সে অক্ষম রাগে ছটফট করে। সে তার স্বামীকে অভিশাপ

দ্যায়। মাথা কুটে গাল দ্যায়। সে হয়তো তাকে কাপুরুষ ভাবে। তবু রানুকে দোষ দিই নে। সত্যি তো, এমন করে সৌমেন? তার বউ তার নিজেরই পছন্দ এবং আমি কিছু জানতে পারি নি। পরে জেনে বরং খুশি হয়েছিলুম। বউমাকে সাদরে ঠাঁই দিয়েছিলুম।...আর, এরপর যদি রানু রাগের বশে কারো সঙ্গে...

সেটা অসম্ভব লাগে। আজকাল মেয়েদের মধ্যে রক্তমাংস-ইচ্ছার তীব্র হয়ে ওঠাটা আমি লক্ষ্য করেছি। ওই যে কী বলে. সেক্স—যৌনতা, জেনে বা না জেনে তারা তার শিকার হয়ে উঠছে—আধুনিকতা মানেই নাকি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা—সভ্যতা ক্রমশ তাদের শেখাচ্ছে নতুন নতুন নিয়মকানুন এবং যৌনতাকে মুক্ত করে দেবার সঙ্গেই নাকি মানুষের আত্মিক মুক্তির ব্যাপারটা জড়িয়ে রয়েছে...যা হোক, রানু বউমার মধ্যে এ ঝোঁকটা সংক্রামিত নয় সম্ভবত। তাছাড়া তার বংশ, শিক্ষাদীক্ষা, ব্যক্তিত্ব—আমার ভরসা রাখার পক্ষে যথেষ্টই। তবে তার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া জাগা তো খুবই স্বাভাবিক। আমি নচ্ছার সেকেলে গৃহস্থ নই যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুণ্ডুপাত করব। সৌমেন যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে এক্ষুণি রানুর বাবা যাই বলুক, ফের তার বিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করবই। অবশ্য রানুর মতামতের ওপর নির্ভর করবে সেটা।

আরে তাইতো! কী ভাবছি! আমার বুক ধড়াস করে উঠল। পা দুটো অসম্ভব ভারি লাগল। কাঁপুনি এল। সৌমেন আমার একমাত্র সন্তান সৌমেন! আমি কি তাহলে ইচ্ছার অজান্তে তার মৃত্যু কামনা করি? না, না—সে যেখানেই থাকুক, বেঁচে থাক্। সে যা খুশি করুক, আমার কোন আপত্তি নেই আর—শুধু বেঁচে থাকুক। আজ অব্দি কত বিজ্ঞাপন দিলুম কাগজে, ছবি ছাপলুম, থানায় থানায় জানানো হল, অসনাক্তকৃত সব লাসের শুধু ছবি নয়—প্রত্যক্ষ গিয়ে দেখে এলুম—কতবার কতজনের লাসে সৌমেনকে ভুল দেখলুম। কিছুদিন আগে ন'টা লাসের একটায় ওকে খুঁজে পাওয়ার পরক্ষণে আরেক দাবিদার এসে বলল ও তার মৃগাঙ্ক। অনেক ঝামেলা, পরীক্ষা বিতর্ক—হাল ছেড়ে সরে এলুম—হ্যা, ও মৃগাঙ্কই : সৌমেন নয়।...

তাই মনে হয়, সে পুলিশের ভয়ে কিংবা কোন কারণে গা ঢাকা দিয়েছে। সে খুব শিগ্গির এক সময় দেখা দিয়ে যাবে তার বাবা আর স্ত্রীকে। সে আসবেই। কারণ তার মতো ছেলের পক্ষে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে যাওয়া খুব জরুরী। হয়তো চিঠি লেখার অসুবিধে আছে কিংবা চিঠিতে সব বলা যাবে না—সেটা বিপজ্জনকও হতে পারে? তাই সে আসবে মুখোমুখি কৈফিয়ৎ দিতে। হয়তো চুপিচুপি এসে কড়া নাড়বে, যখন হঠাৎ এমনি ইলেক্ট্রিসিটি ফেল, অন্ধকার রাত, মধ্যরাত নির্জন পথঘাট, বৃষ্টি ঝড়ো বাতাস বইছে—ভিজে পোশাকে সে চুপিচুপি উঠে আসবে তেতলায়। সে লক্ষ্য করবে, এ বাড়ির সব ফ্লাটে তালাচাবি—সব্বাই পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে, কী চমৎকার নির্জনতা সে পেয়ে যাবে..

হ্যাঁ, তাই দারোয়ানকে বলে রেখেছি সিঁড়ির দরজাটা দিনরাত্তির যেন খোলা রাখে। লোকটা ভীতু কিন্তু হৃদয়বান। হৃদয়বত্তা তাকে সিঁড়ির দরজাটা খোলা রাখতে বাধ্য করে—কেবল ভীরুতা গেটের সদরকপাট দুটো বন্ধ করে দিতে হুকুম দ্যায়। এবং একটা জানালা খুলে আমি তাকিয়ে থাকি রাস্তার দিকে—সারা রাত—সারাটি রাত। আমার ঘুম আসে না। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে, সে যদি বা আসে—আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে লজ্জা পাবে, (ছেলেবেলায় বড় অকারণে সৌমেন আমাকে কী ভয় না করত!) রানু দরজা খুলে দেবে—রানুর ঘরে চলে যাবে সে—এবং...

রানু চলে গেল কখন? কী সব হচ্ছে বলছিল না? তাই তো! এলাকার সম্ভবত কোন প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটা জখম করে দিয়ে কারা কী সব করছে যে! বারবার বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে। কাদের সঙ্গে কাদের মারামারি হয় কে জানে! আমি কোন খবর রাখিনে। খবর না রাখাটাই আমার কাল হয়েছে হয়তো। আমার ছেলের খবরও তো আমি রাখতুম না রাখি নি, তাই এই যন্ত্রণা সইতে হল।

আমাকে ফের জানলায় যেতে হবে। রানু এসে সরিয়ে দিয়েছে আমার জায়গা থেকে। আরে বাঃ আলো জ্বলে উঠল। এতক্ষণ যদি সৌমেন রাস্তায় এসে থাকে—আমি নির্ঘাৎ তাকে মিস করেছি। তাহলে এতক্ষণে সে সিঁড়ির ধাপে—চুপিচুপি উঠছে—কড়া নাড়বে ধীরে, চাপা, হয়তো ডাকবে—রানুর নাম ধরেই ডাকবে। ডাকুক, আমি সব টের পেয়ে যাব।...

রানু দত্তরায়

একটা রাতও রেহাই পায় না ওদের কাছে। ওই আবার শুরু হল তাণ্ডব। হয়তো আজ সারা রাত ধরে এসব চলবে। বারবার ঘুমের রেশ কেটে যাবে। রাগ হতে-হতে রাগ হতে-হতে ক্লান্ত হবো এবং ক্লান্ত হতে-হতে ক্লান্ত হতে-হতে দুর্বল হবো। কান্না পাবে। কিন্তু আজ সব কান্নাই যে নিজের কাছে লজ্জা। আত্মধিক্কার এবং গ্লানির ব্যাপার। নিজের অসহায়তা যখন পুরোপুরি ধরা পড়ে যায় তখন মানুষ অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমার ঠাণ্ডা হবার কথা। কিন্তু পারছিনে। ওরা কারা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনে—শুধু মনে হয়, ওদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর জ্বালার প্রদাহ আছে এবং সেই প্রদাহ হঠাৎ—হঠাৎ চরমতায় ফেটে পড়ে কারো-কারো ওপর। তাকে গ্রাস করে নেয়। আমার স্বামীকেও গ্রাস করে নিয়েছে। আর এখানেই আমার সান্ত্বনা যত রাগও তত। সান্ত্বনা—কারণ আমার মতো আরও কত মেয়ের স্বামী, বাবা বা সন্তান এমনি করে তার মুখে পড়েছে; রাগ—কারণ, আমরা কিছু করতে পারছিনে। ক'মাস আগে এত বড় কারখানাটা বন্ধ হয়ে আমার স্বামীর চাকরি গেল। বাড়িভাড়া বাকি পড়তে

লাগল। সংসারে টান ধরল। আমার ভোগীপ্রকৃতির শ্বশুর সঞ্চয়ে পটু ছিলেন না। তাঁর পেনশনের টাকায় চলে হয়তো যাচ্ছে কিন্তু এ কি মানুষের বেঁচে থাকা? আমার কষ্ট হয়। ভিতরটা ছটপট করে। বাইরে বেরিয়ে কিছু একটা যোগাড় করে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শ্বশুরমশাই আবার বড্ড গোঁড়া আর সংকীর্ণমনা। হয়তো প্রচণ্ড রকমের ভীতুও। স্বামীর জন্যে অনেকটা ছুটোছুটি করব ঠিক করেছিলুম হয়তো ঠিকই তার খোঁজ পেয়ে যেতাম—কিন্তু শ্বশুরমশাই আমাকে কোথাও একা যেতে দেবেন না! মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা একটা বন্দীত্ব। একটা খাঁচায় আটকে গেছি নিজের অজান্তে। আর ওই স্বার্থপর বুড়োটা আমাকে তার শূন্য সিন্দুকের ওপর যখ বসিয়ে রেখেছে!

নাঃ, আর পারছিনে। অসহ্য লাগছে। এবার আমি পালাবই পালাব। কেন আর এখানে থাকব শুনি? এই শূন্যতা আর মিথ্যে প্রতীক্ষা এই একঘেয়ে দিনরাত্তির...ওঃ! তাছাড়া বাড়ি ছেড়ে সব ভাড়াটে পরিবারগুলো পালিয়ে গেল একে-একে। পাড়াটাও নাকি খালি হয়ে যাচ্ছে। শুধু পড়ে রয়েছে কিছু বুড়োবুড়ি আর কিছু কাচ্চা-বাচ্চা! মাঝে মাঝে শুধু ওই বোমা ফাটার আওয়াজ গুলির শব্দ অস্পষ্ট দু-চারবার গর্জন বা আর্তনাদ ছাড়া বিকট স্তব্ধতা সব সময় স্থির হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ বা কারা সাঁৎ-সাঁৎ করে চলে যায় রাস্তায়। আর কোন লোক নেই। এই নিঃঝুম যক্ষপুরীর মধ্যে আমার বাইশ বছরের তাজা প্রাণটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি থাকব না—পালাব।

কিন্তু যাবো কোথায়? বাবা-মা আমার ওপর ভিতরে-ভিতরে চটে আছেন। তাঁদের মনোনীত পাত্রকে আমি অপমান করেছিলুম। তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অন্যকে চুপিচুপি বিয়ে করে ফেল্লুম। রেজেস্ট্রির পর সব জানিয়ে দিলুম দু পক্ষকে। আমার বাড়িতে বেশ কিছুদিন ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটে গেল। আমার স্বামীর বাড়িতে অবশ্য তেমন কিছু ঘটলই না। ঘটত-যদি আমার শাশুড়ী বেঁচে থাকতেন। কারণ এসব ক্ষেত্রে মেয়েরাই তো মেয়েদের বড়ো শত্রু। আমার মাই আমার বড়ো শত্রু আমি জানি। তাই ওবাড়ি চলে যাবার কথা আর ওঠেই না। শত্রু হাসবে। আর কোথায় যাবো তাহলে? আমি খুঁজি মনে মনে ভাবি, ভাবতে ভাবতে দিনরাত্রি কেটে যায়। তবু আমি পালাবই পালাব। আঃ আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। আর কিছুদিন থাকলে আমি মরে যাব। না না—আমি বেঁচে থাকতে চাই।

যাবার আগে ও কোন কথা বলে যায় নি। হঠাৎ বিকেলে বেরিয়ে গেল চা খেয়ে। কেমন গুম হয়ে ছিল সারাটাদিন। ইদানীং খুব সহজে ও বিরক্ত হতো বলে আমি আর কোন প্রশ্ন করতুম না ওকে। কেমন বদরাগী আর বদমেজাজী হয়ে পড়ছিল ও। ভাবতুম, চাকরি-বাকরির ব্যাপারে ও উদ্বিগ্ন। খুব কম কথা বলত। চুপচাপ বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে। ফেরার কোন ঠিক ছিল না। শ্বশুরমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফিরে এসে তাঁকে কিছু কৈফিয়ৎ দিত। আমাকে দিত না। তার দরকারও ছিল না।

রাতের দিকে ওর স্পর্শ পেতে চাইতুম। আমার রক্তমাংস চঞ্চল হয়ে উঠত অভ্যাসে। ও আস্তে ঠেলে পাশ ফিরে বলত গরম বড্ড একটু সরে শোও তো রানু!

আমার কান্না পেত তবে কি আমার ওপর ও কোন কারণে রাগ করেছে? মিথ্যে সন্দেহ? অবিশ্বাস কিছু? কেউ কি ওর কান ভারি করেছে? কিন্তু ঈশ্বর জানেন মনে না হই—দেহে তো আমি নিষ্পাপ। আমি কাঁদতুম চুপি-চুপি।

আশ্চর্য, ও ঠিকই টের পেয়ে যেত। হঠাৎ ঘুরে দুহাতে জড়িতে ধরে চুমু খেত আর বলত, না রানু না—তোমার উপর আমার কোন রাগ নেই। কারো ওপর নেই। আমার সব রাগ দুঃখ নিজের ওপর। নিজেকে আমি আর বইতে পারছি নে। তুমি বিশ্বাস করো—আমার বড় জ্বালা রানু অসম্ভব জ্বালা।

আমি নারীর স্বাভাবিক প্রেরণাদাত্রী ভূমিকায় বলতুম, তোমার সব জ্বালা আমাকে দাও।

পাগল!...বলে ও চুপ করে যেত। ওর জড়িয়ে ধরা বাহু দুটো শিথিল হয়ে যেত। তারপর ও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত।

জানতুম ও তাকিয়ে আছে। কিছু ভাবছে। বলতুম কী হয়েছে বলবে না লক্ষ্মীটি? তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বলো।

ও কোন জবাব দিত না। কখনও বলত, কিছু না।

ভাবতুম ওর কত কষ্ট সবটাই নিছক টাকা-পয়সা সংক্রান্ত। বেকারদের হয়তো এমনি সব হয়। বলতুম ভেবো না—একটা কিছু পেয়ে যাবেই।...

চলে যাবার আগের রাতে—যেন ঘুমের ঘোরে কয়েকবার একটা কথা উচ্চারণ করেছিল। আমি তখনও ঘুমোইনি। কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিলাম। এক ঝলক রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল হৃদ্‌পিণ্ডে। কী বলছে ও?...

ট্রেটর্...আমি ট্রেটর্...ট্রেটর্...ওঃ আমি ট্রেটর্..

কী যেন বুঝলুম—অথবা বুঝলুম না। ওর রহস্যময় কালো পর্দাটা হঠাৎ যেন কিছু ফাঁক হয়ে গেল। অথবা সবই আমার ভুল ধারণা, ভুল শোনা। আমার রক্ত তবু এক হিম হয়ে গেল, উরু ভারি হল, ক্রমে মাথার ভিতরটা বরফ হতে থাকল! নিঃসাড় পড়ে রইলুম।

কথাটা আজও শ্বশুরমশাইকে বলি নি। বলা সঙ্গত মনে করি নি। আমি জানি কী ঘটেছে। মিথ্যে শাঁখাসিঁদুর আর সধবার বেশ আমার, মিথ্যে বউ সেজে থাকা অন্যের সংসারে—ওর আর ফেরা হবে না।

তবু রক্তের ভিতর প্রতীক্ষার কাঁটা খচখচ করে ওঠে। সিঁড়ির বিশাল খোলে ঘুরপাক খায় হাওয়া। শব্দ ওঠে। কড়ানাড়ার মতো লাগে। ধড়মড় করে উঠে বসি। ছুটে যাই দরজার দিকে। দরজা খুলতে গিয়ে ঠিক করে নেই, ঠিক কী বলব। তারপর খুলি। আবছায়ায় হলুদ কিছু রেখা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যায়। নিছক শূন্যতার

কাঁপন থেকে ফুরিয়ে যায় একটা প্রতিভাস। আর পিছনে দৌড়ে আসেন শ্বশুরমশাই। অস্ফুট কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলেন, এল? সমু এল? সমু না? কে? বউমা ও বউমা! কথা বলছ না কেন?

আমি কী বলব? শুধু বলি বাতাস এবং সরে আসি। পিছু ফিরতেই বসবার ঘরে ওই ছবিটা চোখে পড়ে। রাগে ক্ষোভে দুঃখে ওটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। যে নেই তার নিশ্চল প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে বলতে হচ্ছে করে, ট্রেটর! বিশ্বাসহন্তা!...

৪. দীপক মিত্র

যে দরজা খুলল তাকে আমি চিনিনে। কিন্তু তার শরীরের পাশ দিয়ে ঘরের ভিতর উঁচু টুলে রাখা মস্তো ছবিটা কার জানি। তাকে ভালোই চিনি। মুহূর্তে আমার মাথার ভিতর আগুন দপ্ করে উঠল। কান দিয়ে গরম গ্যাস বেরিয়ে গেল। চোখ দুটো ফুলে উঠল। সৌমেন! এই সৌমেনের ঘর! এবং অবশেষে এখানেই আমি এসে পড়েছি!

আমার চমকটা এই মহিলার চোখে পড়ল কি না বুঝলুম না। কিন্তু উনিও আমাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। কাঁপানো গলায়—একপা পিছিয়ে বললেন, কা-কাকে চাই?

সামলে নিয়েছিলুম। ঠাণ্ডা স্বরে বললুম, আজ রাতের মতো এখানে থাকব। চেঁচামেচি করবেন না। কোন লাভ হবে না। কোন ক্ষতি করব না আপনাদের। শুধু এই রাতটা...

আশ্চর্য সরে পিছিয়ে গেলেন মহিলাটি। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলুম। এগিয়ে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়লুম। বললুম এক গ্লাস জল দিন। স্রেফ জল। এত রাতে আর খাবার জন্যে উত্যক্ত করব না। একটা মাদুর থাকলে দেবেন। এখানেই শোব।

কোন কথা বললেন না উনি। সৌমেনের বউ? তাহলে এখনও সধবার বেশ কেন? তাহলে কি এরা এখনও খবরটা পায় নি?

পকেটে হাত রেখেছিলুম—পাছে গোলমাল করলে ওটা বের করে ভয় পাইয়ে দিতে হয়। দরকার হবে না। হাত বের করলুম। ঘরের ভিতরটা লক্ষ্য করছিলুম। দুপাশে দুটো ঘর। ময়লা ছেঁড়া পর্দা দরজায়। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই এঘরে। একটা র‍্যাকে কিছু বই। একটা টেবিলে দুটো চেয়ার। দেয়ালে ক্যালেণ্ডার। আর টুলে সৌমেনের ছবিটা। ছবিটার দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এখনও সৌমেন বলছে, তোর চেহারায় কোন খুনীর আদল নেই। তোকে ভয় করিনে, দীপু!...

খুব শিগগির জল এসে গেল। ওর দিকে না তাকিয়ে ঢকঢক করে জল খেলুম। তারপর গ্লাসটা রাখতে যাচ্ছিলুম নিচে উনি হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি ডেকে বললুম, শুনুন!

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ঘরে আর কে কে আছে?

আমি আর বাবা।

ওই ছবি যার—সে কোথায়?

জানিনে।

আপনি কে?

বাড়ির বউ।

ওই ছবিটা তাহলে আপনার স্বমীর?

হুঁ।

একটু চুপ থাকলুম।

সৌমেনের বউ বলল, আর কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ—বাবা যাকে বললেন, তিনি আপনার শ্বশুরমশাই নিশ্চয়?

হুঁ।

আপনার স্বামী নেই কেন?

জানিনে।...আপনাকে বিছানা এনে দিই।

চলে যাচ্ছিল সৌমেনের বউ। ঠিক তক্ষুণি পাশের ঘরের পর্দা তুলে আচমকা সেই বুড়ো গেরিলাটা এসে পড়ল।...কে, কে এসেছে? সমু?...কে-কে তুমি? কে আপনি? কথা বলছেন না কেন? বউমা, কে, এ?

সৌমেনের বউ বলল, আঃ চুপ করুন বাবা। উনি আপনার ছেলের বন্ধু—ওর খবর এনেছেন।

আমি চমকে উঠলুম। হৃদ্‌পিণ্ড ধকধক করতে থাকল। ও কি সব জেনেশুনে বলছে—নাকি নির্বোধ শ্বশুরকে উত্যক্ত করতে চাইছে না? ওর দিকে তাকালুম। কী নিষ্পলক চাহনি, কী উজ্জ্বলতা। আর ঠোঁটের কোণায় ওই চুপিচুপি হাসির রেখাটা কেন? আমার রিভলবারটা হয়তো পকেটের ভিতর মরচে ধরে জ্যাম হয়ে গেল। নষ্ট ট্রিগার তার। শেষ গুলিটা ভিজে।

চাপা গলায় বুড়ো লোকটি ঝুঁকে এল, সমু কেমন আছে বাবা? কোথায় আছে সে? কী করছে? এক্কেবারে ছেলেমানুষ বরাবর—ভয় পাবার কী ছিল এত? আমি পুলিশের বড়কর্তার কাছে যেতুম—আমি রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার—

বাধা দিয়ে বললুম, ওর ভয় পুলিশকে নয়। আপনার ছেলে ছিল ট্রেটর-বিশ্বাসঘাতকতাই...

খবর্দার! বুড়ো গরিলাটা গর্জে উঠল।

আমি হাসলুম।...আপনার বউমাকে জিজ্ঞেস করুন।

সৌমেনের বউ আমাকে অবাক করে বলল, হ্যাঁ বাবা। উনি ঠিকই বলছেন।

অসম্ভব! এ লোকটা মিথ্যেবাদী...বুড়ো চেঁচামেচি শুরু করল।...মিথ্যুক, বদমাশ, জোচ্চোর সব! আমি কাকেও বিশ্বাস করিনে। সব্বাই ট্রেটর। সব্বাই বিশ্বাসঘাতক।

সৌমেনের বউ এগিয়ে এসে বলল, আঃ কী হচ্ছে বাবা চুপ করুন।

বুড়ো আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে বলল, এক্ষুণি বেরিয়ে যান আপনি। কে বলেছিল এ মিথ্যে খবর দিতে? চলে যান বলছি! আমার সমু বিশ্বাসঘাতক?...

এবার পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে উঠে দাঁড়ালুম।...বেশি চেঁচাবেন না। যান, নিজের ঘরে চলে যান। আমি রত্তিরটা এখানে থাকব। উত্যক্ত করলে প্রাণটা খোয়াবেন, বলে দিচ্ছি।...দেখুন আপনার শ্বশুরকে নিয়ে যান তো ওঘরে। আমার মাথার কিছু ঠিক নেই। এই ওল্ড ফুল! চুপ! ডোণ্ট শ্যাউট!

বুড়ো কয়েক মুহূর্ত আমার অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে দুহাতে মুখ ঢাকল। কেঁদে ফেলল। বসে পড়ল। জড়ানো স্বলে বলল, মারো,---আমাকে বরং মেরেই ফেলো। সমুর কী হয়েছে, এবার বেশ বুঝতে পারছি। আমার বেঁচে কোনো লাভ নেই।

সৌমেনের বউ শ্বশুরকে সামলাচ্ছিল। এবার অদ্ভুত হাসল সে।...কী হল? পারবেন না? গুলি নেই আর? নাকি খেলনার জিনিস? আসলে বুঝতে পারছি। আপনি আর খোলস ছেড়ে বেরোতে পারছেন না। তাড়া খেয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই না?

রাগে আমার মাথার ঠিক ছিল না। বললুম, সৌমেনের মতো ছেলের জন্ম যে দিয়েছে, আমার ঘৃণা তার ওপরই বেশি। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত—শুধু একটু আশ্রয় আর একটুখানি ঘুমের বদলে সব দিতে পারি।

বুড়োকে টেনে পাশের ঘরে নিয়ে গেল ও তারপর ফিরে এল। নিজের ঘরে গেল। বিছানা নিয়ে এল। মেঝেয় পরিপাটি বিছিয়ে দিয়ে বলল, শুয়ে পড়ুন। আমারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ। আর...

বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বললুম থামলেন কেন? আর?

আপনাকে ধন্যবাদ।...বলে দ্রুত ঘরে চলে গেল সৌমেনের বউ।

আমার ঘুম এল না। ওই ছবিটা! সৌমেন! খালের ধারে তার শ্বাসনলীটা আমিই কেটে দিয়েছিলুম। লাসটা পুড়িয়ে ফেলেছিলুম। এবং আবছা শব্দে অনুমান করছি ওঘরে কী ঘটছে...যেটুকু কাজ বাকী ছিল তা নিষ্পন্ন হচ্ছে চুপিসাড়ে। সৌমেনের বউ শাঁখা ভাঙছে। সিঁদুর মুছছে। বাক্স থেকে সৌমেনের ধুতি বের করে পরছে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কান্নার শব্দ বাড়ছে। ধূপের ধোঁওয়ার মতো,

কুয়াসার মতো, সর্বগ্রাসী সঞ্চরণশীল সেই বিলাপ আস্তে আস্তে দরজার ফাটল দিয়ে এগিয়ে এল আর এগিয়ে এল।

কতক্ষণ আমি কান চেপে পড়ে রইলুম। তবু মনে হল, এক শোকাকুল পৃথিবী থেকে কিছুতেই পালানো যাচ্ছে না। আর ওই মহাকায় অজগর সাপটা—বিলাপের সাপ পাকে পাকে জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলেছে। একটু বাতাস চাই, একটুখানি বাতাস!

তারপর ভোরের আগে একটু ঘুমের আমেজ এল। স্বপ্ন দেখলুম। হাজার হাজার সৌমেনের ছবি পড়ে যাচ্ছে চারপাশে। ঢেকে ফেলছে পৃথিবীকে। পড়ন্ত তাসের মতো স্তূপাকার বিশৃঙ্খল সৌমেনদের মধ্যে আর আমার পথ খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।...

দেশ, ১৫ শ্রাবণ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

মতি নন্দী (১৯৩২—)

উত্তর কলকাতায় এক বনেদী পরিবারে জন্ম। অটোমোবিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী। স্টেট ট্রান্সপোরটে দু বছর শিক্ষানবিশীর পর বি.এ. পাশ করে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। খ্যাতনামা স্পোর্টস জার্নালিস্ট। 'ছাদ' গল্প (১৯৫৬) লিখে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর লেখার ভঙ্গি ঋজু, বাহুল্যবর্জিত। রূঢ় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাতেই তিনি অভ্যস্ত। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের নিপুণ রূপকার।

শেষ বিকেলের দুটি মুখ

হাওড়া স্টেশনের বিরাট টিনের চালার নিচে দাঁড়িয়ে দুইবোন বারবার চারধারে তাকাল। প্রতিটি মানুষের মুখ লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। কেউই তেমন করে তাদের দেখে না, সবাই ব্যস্ত, সকলেরই কোন না কোন কাজ আছে। তাদেরও আছে।

ওরা স্টেশনের বিরাট চালার নিচে, গমগমে শব্দ ও ব্যস্ততার মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছে। সারা স্টেশন জুড়ে কে কথা বলছে। দুইবোন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। হঠাৎ কথা বন্ধ হল। ছোটবোন আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে।' ওরা দুজনে তাকাল সস্প্যানের মতো লাউডস্পিকারটার দিকে।

ছোটবোন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'এখন কি করব?'

বড়বোন এধারে তাকাবার ভান করে দেখে নিল একবার। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাদা চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছে। এবার ফুঁ দিয়ে দিয়ে হাত থেকে চুল ঝেড়ে ফেলবে।

বড়বোন বলল, 'চল ওই দিকটায়।'

ওরা গমগমে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে উত্তর দিকে এগোল। টিকিট ঘরের খুপরিতে মানুষের সারি, তার পাশ কটিয়ে, ঢালাও মেঝেতে ছড়ানো মানুষ শুয়ে আর বসে, তাদের পাশ কাটিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে মানুষ তাদের পাশ কাটিয়ে, দুইবোন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরে এল। একটা বেঞ্চের ধার ঘেঁসে দুজনে বসল। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। সার দিয়ে বাস দাঁড়িয়ে। ঘরের মধ্যে ফিকে আলো। ভ্যাপসা গন্ধ। জলের কল। টিকিটের জন্য মেয়েদের সারি। আর অপেক্ষারত দূরের যাত্রী।

'দিদি জল খাব।'

'খেয়ে আয়।'

ছোটবোনের দিকে নজর রাখল। ঝুঁকে কল টিপে জল খাচ্ছে। বড়বোন অস্বস্তিবোধ করল। ছোটবোনের জামাটা পাঁজরার কাছে ফেঁসে গেছে। ঘটি হাতে দাঁড়ান লোকটা একদৃষ্টে কি দেখছে?

'তুফান এক্সপ্রেস আজ লেট।'

মুখ ফেরাল বড়বোন। তার পাশের মহিলাটি কথা বললেন। 'কতক্ষণ যে বসে থাকতে হবে।'

'কেউ বুঝি আসবেন?'

উনি হাসলেন। হাসতে হাসতে সারা ঘরে চোখ মেলে বললেন, 'চিঠি পেলুম গতকাল পৌঁছবে। এসে ঘুরে গেছি, আসে নি।'

বড়বোন উঠে দাঁড়াল। ছোটবোনকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

'যাবেন কোথাও, না কারুর জন্যে এসেছেন?'

'না, আমরা যাব বলে এসেছি।'

বড়বোন কথা বাড়াল না। স্টেশনের বিরাট চালার নিচে মানুষ আর শব্দের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ছোটবোনকে খুঁজল। পা পা এগিয়ে স্টেশনের বহু সদর গেটগুলির একটিতে পৌঁছল। এখান থেকে হাওড়ার ব্রিজ দেখা যায়। ওই ব্রিজটা পার হলে কলকাতা। কলকাতার একটি গলিতে তাদের বাড়ি। সেই বাড়ির একতলায় একটা ঘরে মা, দাদা, ভাই আর বোনের সঙ্গে সে থাকে। শীতের দিনে শীত আর গ্রীষ্মের দিনে গরম তাদের ঘরে থেবড়ে বসে থাকে। যত দক্ষিণের হাওয়া সব ছাদের উপর দিয়ে চলে যায়। হাওয়া যায়, মেঘ যায়, রোদ যায় আর বিকেল যায়। গা-ধুয়ে আর বিকেলে ছাদে ওঠা হবে না।

নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল। এখানে কেমন যেন একটা গন্ধ বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় দাদা একশিশি এনেছিল, অনেকটা সেই রকম। খালি শিশিটা ছোটবোন রেখে দিয়েছিল। কোথায় গেল ছোটাবোন?

□

'দিল্লী দেখো, আগ্রা দেখো' বলতো আর হাতল ঘোরাত—কুতবমিনার, তাজমহলের ছবি, একে একে ঘুরে চলে যেত। লোকটা একঘেয়ে সুরে চেঁচাত আর হাতলটা একটু আস্তে ঘোরাতে বললে সর্দিটানার মতো মুখ করে হাসত। স্টেশনের থামে লটকানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে ছোটবোনের সেই লোকটাকে মনে পড়ল। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিল্লী-আগ্রা সে কখনো দেখেছে কিনা। লোকটা কথার জবাব না দিয়ে, বাক্সের ফোকরে চোখ লাগানো উটকো মাথাগুলোকে, হাত দিয়ে মাছির মতো তাড়াতে লেগে যায়। সেই লোকটাকে ছোটবোনের এখন মনে পড়ল। অনেকদিন পরে পাড়ার এক নতুন বাইস্কোপও এল। সেই লোকটা কেন আসে না, এই কথা ছোটবোন অনেক দিন অনেক রাত ভেবেছে। ভাবলেই কুতুবমিনার, তাজমহল, হাওয়াই জাহাজ আর জটায়ুর যুদ্ধ চোখের সামনে দিয়ে সারি বেঁধে চলে যায়। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখতে সে একেবারে গা ঘেঁষে এসেছিল বউটির। নজর পড়তে বুঝল তার দিকেই তাকিয়ে। ছবিতে ইংরেজি অক্ষর লেখা। বিড়বিড় করে সে অক্ষর

পড়ে। আড়চোখে বউটির দিকে তাকায়। ওর কাপড় থেকেই মিষ্টি গন্ধটা আসছে। আস্তে আস্তে লম্বা শ্বাস টানল ছোটবোন। চকোলেট মোড়া কাগজে এমন গন্ধ থাকে।

'মোটেই অত সুন্দর নয়।'...

ছোটবোন ঘাড় ফেরাল। বউটি ছবির দিকে তকিয়ে।

'গেল পূজোয় আমরা গেছলুম। বাব্বা! যাতায়াতের কি কষ্ট আর হোটেলের কি চড়া রেট।'

ছোটবোনের ইচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে মিষ্টি গন্ধটা চুষে নিয়ে জমা করে রাখে বুকের মধ্যে। বলল, 'সুন্দর নয় বললেন যে, ওখানে কি এমন—'

'মোটেই না। ওসব বন-বাদারের ছবি, সেখানে যায় কে। তার চেয়ে বরং ওই ছবিটা কোনারকের ছবিটা, ওখানে সত্যি দেখবার জিনিস আছে।'

'আপনি গেছেন?'

'আমার নন্দাই গেছল।'

'এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

'রানীগঞ্জ।'

'কার কাছে যাচ্ছেন?'

এবার বউটি হাসল। ছবিতে যেমন সুন্দর করে হাসে। তারপর কি একটা বলতে গিয়ে, না বলে আবার হাসল। তাই দেখে ছোটবোনও হাসল।

'সামনের বছর উনি ছুটি পেলে, কাশ্মীর বেড়াতে যাব আমরা।'

'দিদি ট্রেন সাত নম্বর থেকে ছাড়বে, তাড়াতাড়ি।'

ছুটতে ছুটতে এসে হাফপ্যান্ট-পরা ছেলেটি সুটকেশটা তুলে নিল। বেতের ঝুড়িটা হাতে ঝুলিয়ে বউটি বলল, আচ্ছা চলি।

ওরা চলে যাচ্ছে। ছোটবোন গুটিগুটি এগিয়ে, কোলাপসিবল রেলিংয়ে হাত রেখে সাত নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়ানো ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

□

এত শব্দ তবু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। থামের গা ঘেঁষে লোহার মতো সে দাঁড়িয়ে। মাথায় লাল টুপি, খাকি পোশাকের লোকটা এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে তার দিকেই আসছে। বড়বোন এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। লোকটা চলে গেল পাশ দিয়ে। যাবার সময় একবার তাকিয়েছিল। বড়বোন ভাবল, বিশ্রামঘরে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভালো। হয়তো ছোটবোন এখন সেখানে বসে আছে।

বেঞ্চ ভর্তি। বড়বোন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সেই মহিলাটি কোথা থেকে ঘুরে এলেন। বসার জায়গা না পেয়ে তার কাছে এসে বলল, 'নাঃ এখনো আসে নি।'

'আসছেন কে?'

নেহাত একটা কথা বলতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করা, করে তাকিয়ে থাকল। আর থাকতে থাকতে সে দেখল, অতবড় চোখদুটো, যা দুটো মুখের আয়তনে মানায়, কেমন মানানসই হয়ে উঠল; থুতনির নিচে বয়সের ভাঁজ কাঁপল।

'কে আবার, কেউ না।'

অন্যসুরে হুবহু সেই কথা। জ্বালা করে উঠল মাথার মধ্যেটা। ন মাসিমা দুটো টাকা দিয়ে বলেছিল, 'অত ঘন-ঘন এলে আমিই বা পারি কি করে।' ঘরে তখন পাশের বাড়ির কে যেন ছিল। ফিরে আসার সময় বড়বোন নমাসিমাকে বলতে শুনেছিল, 'কে আবার, কেউ না।'

'তিরিশ টাকা বেশি পাবে বলে দেড়শো মাইল দূরে ছুটল চাকরি করতে। কি যে দরকার ছিল বুঝি না। স্কুল থেকে আমি যা পাই আর ও যদি কিছু একটা জুটিয়ে নিত, তাহলে সাতটা লোকের সংসার খুব চলে যেত।'

বড়বোন মাথা নাড়ল।

'আমার কথা তো কখনো শোনে না। আজ আট বচ্ছর দেখে আসছি। অথচ আমার টাকা বিয়ের আগে ছোঁবে না।'

'উনি কোথায় চাকরি করেন?'

'ডি. ভি. সি.-তে।'

'আমার দাদা ওখানে চেষ্টা করেছিল, পায় নি।

'সেকি, ও-ই তো কত লোককে চেষ্টা করে চাকরি করিয়ে দিয়েছে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করব। আছেন তো এখানে, না ট্রেনের সময় হয়ে গেছে?'

'না না আমার ট্রেনের সময় হয় নি, আমি থাকব।'

বড়বোন এখন আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না, শুধু তার বুকের মধ্যের কথাটা ছাড়া—আমি থাকব। আমি যাব না।

'আমি আর একবার বরং দেখে আসি।'

মহিলাটি চলে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে গেল সে। মহিলাটি অত মানুষের মধ্যে আড়াল হয়ে গেছে। বড়বোন পিছিয়ে এল। স্টেশনের ফটকে এসে দাঁড়াল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। স্ট্যাণ্ডে বাসের মধ্যে অফিস ফেরৎ মানুষরা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। মরচেধরা কৌটোর মতো তাদের মুখ। রোদ্দুরের আঁচ লেগেছে হাওড়া ব্রিজে। ষ্টিমার গম্ভীর ভোঁ বাজাল। পিঠকুঁজো ঠেলাওলা দুলতে দুলতে ব্রিজের চড়াইয়ে উঠছে। বাস থেকে নেমে ড্রাইভার আস্তে আস্তে আকাশে বিড়ির ধোঁয়া ছুঁড়তে লাগল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। লিলুয়ায় সরকারী আশ্রম আছে মেয়েদের। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে পুলিশ প্রথমে ওখানে নিয়ে রাখত। 'বলব আমরা এখানে থাকব, আমাদের বাড়ি নেই, কেউ নেই। পারবি বলতে?' বলতে বলতে দাদার মুখটা এই বিকেলের মতো হয়ে গেছল।

বড়বোন আবার স্টেশনের চালার নিচে ফিরে এল।

কোলাপ্‌সিবল রেলিং ধরে ছোটবোন দেখছে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। ট্রেনের জানলার মুখগুলো প্লাটফর্মের দিকে তকিয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। এমন করে তারও চলে যেতে ইচ্ছে করল। লাইনের উপর আড়াআড়ি একটা ব্রিজ। প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে রাস্তাটা উঁচু হয়ে ব্রিজে উঠেছে। থলি হাতে তিনটি মানুষ রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওরা যেন পাহাড়ে উঠছে। তারপর সে ভাবল বড়বোন অপেক্ষা করছে।

বিশ্রামঘরে বড়বোনকে দেখতে না পেয়ে সে চালার নিচে ফিরে এল। ওজনযন্ত্রে এক বৃদ্ধ ওজন মাপল। তাই দেখল। বৃদ্ধ কার্ড পড়ে হনহন করে চলে গেল।

'আর তিন মিনিট বাকি অথচ এখনো এসে পৌঁছল না, কি ইর্‌রেস্পনসিবল!'

ছোটবোন মুখ ফিরিয়ে দেখল। ছ-সাতটি ছেলেমেয়ের এক দল।

'ওর জন্য অপেক্ষা করলে, আমরাও ট্রেন মিস্‌ করব।'

'তাহলে?'

ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ব্যস্ত হয়ে গেল। একটু পরেই, প্রায় ছুটে এলো চশমা চোখে একটি মেয়ে। খুব রোগা, দেখে মনে হয় যেন ক্লাশ সেভেনে পড়ে। ওকে দেখেই ছোটবোন বুঝল এর কথাই ওই দলটা বলছিল।

'ওরা এইমাত্র চলে গেল।'

'চলে গেল।'

মেয়েটি হাতের চামড়ার ব্যাগটা খুব জোরে চেপে ধরল। চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে চেপে বসাল। তারপর এমনভাবে তাকাল, যেন জিজ্ঞাসা করছে এবার আমি কি করব?

'একা যেতে পারবেন না?'

'পারব না কেন, তবে ওদের সঙ্গে থাকলে বাড়ি চিন্তে অসুবিধে হত না।' এই বলেই মেয়েটি বলে উঠল, 'আরে!'

ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে এল। সেই ছেলেমেয়েদের দলে ছোটবোন একেও দেখেছিল।

'আপনি কি এই আসছেন?' ছেলেটি বলল।

'হ্যাঁ, আপনি?'

'আমিও।'

'তাহলে!' ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে। ইস্‌, একটা মিছিলে ট্রামটা আটকে গিয়ে এই কাণ্ড হল।'

'এই প্রসেশন কবে যে বন্ধ হবে। যাকগে, এখন কি করবেন? যাওয়া তো হল না।'

'বাড়িতে বলে এসেছি ফিরতে রাত দশটা এগারোটা হতে পারে, বিয়ে বাড়ির

ব্যবস্থা তো। এখন ফিরে গেলে বাড়িতে হাসাহাসি করবে।'

'চলুন ট্রেনে চেপে ব্যানডেল থেকে ঘুরে আসি।'

'কিন্তু আগে একটু কিছু খেয়ে নেবো।'

ওরা দুজনে চলে গেল। সেই সময় অতবড় স্টেশনের সব আলোগুলো জ্বলে উঠল। একটা ট্রেন এসেছে। পিলপিল করে স্টেশনে মানুষ ঢুকছে। এত মানুষ দেখতে ছোটবোনের ভালো লাগল না। আবার সে বিশ্রামঘরে ফিরে এল।

□

ছোটভাইকে মা চড় মেরে বলেছিল, 'মুখপোড়া আর একটু আগে যেতে পারিস নি?' কাদের বৌভাতে বিনা নিমন্ত্রণে খেতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছে। দিদিদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে হাউ-হাউ করে উঠেছিল। তখন এমনিভাবে ছোট ভাইয়ের মুখটা চ্যাপ্টা দেখাচ্ছিল।

ছবিগুলোর আর একটু কাছে বড়বোন এগিয়ে এল। যারা রেলে কাটা পড়েছে তাদের ছবি। কাঁচের উপর তার নিজের মুখের ছায়া পড়েছে। নিজের মুখ দেখার জন্য একটু পিছিয়ে কোণাচে হয়ে তাকাতেই তার মনে হল, কি বিশ্রি, কি ভয়ঙ্কর। দাদা চিৎকার করে একদিন বলেছিল, 'আমি কি করব, কি করব। চেষ্টা তো করছি।' বড়বোন সারা কাঁচ জুড়ে দাদার মুখ দেখল। ওর মতো মমতায় দুঃখে টলমলিয়ে উঠল। রেলে কাটা-পড়াদের জন্য দুঃখ পেল।

সেই মহিলাটিকে দেখতে পেল বড়বোন। পুরুষটির হাতে সুটকেশ বেডিং, ওরা কথা বলছে না। বড়বোন ছুটে গিয়ে মহিলাটির হাত ধরল।

মহিলা ঘাড় নাড়ল।

'ওর ঠিকানাটা দিন, দাদাকে পাঠাব।'

এই কথা বলে বড়বোন তকিয়ে থাকল আর থাকতে থাকতে দেখল, দুটো মুখের আয়তনে মানায় এমন একজোড়া চোখ, ঝুলেপড়া চিবুক, আর উনুন-ভাঙা মাটির মতো ঠোঁট।

'ওখানে ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে।'

মহিলাটির চলে যাওয়া দেখল বড়বোন। কাঁধে কেউ যেন বেডিং সুটকেশ চাপিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে বড়বোনের ঝিমুনি এল। চোখের পাতা ভার-ভার বোধা হল। কোন রকমে চারধারে চোখ ফেলে সে ভাবল, ছোটবোন বোধহয় অপেক্ষা করছে।

বিশ্রামঘরে ফিরে এস বড়বোন দেখতে পেল, ছোটবোনকে।

ওরা দু-জন পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। একসময় বড়বোন বলল, 'এখানে বসে কি লাভ, চল ওদিকে যাই।'

ওরা আস্তে হেঁটে স্টেশনের আরেক প্রান্তে এল। ছোটবোন বলল, 'এবার আমরা কি করব?'

বড়বোন দাঁড়িয়ে ভাবল। ভেবে বলল, 'এখানে একটু দাঁড়াই।'

রেস্টুরেন্টের দরজা ঠেলে একজোড়া ছেলেমেয়ে বেরোল। ছোটবোন দেখে ভাবল, ওর এবার বেড়াতে যাবে।

থুথু ফেলল, কাশল। পিঠ কুঁজো করে সে ওয়াক তুলল। বড়বোন পিঠে হাত রাখল। বুকের কাছে টেনে আনল।

বলল, 'কিছু বলছিস?'

'না।'

'তোর খিদে পেয়েছে?'

'না।'

আবার রেস্টুরেন্টের দরজা খুলল। শব্দটা শুনল, শুনে ঝিমোতে শুরু করল। ট্রেনের ভেঁপু বাজল। ছোটাবোন বলল, 'শাঁখের মতো শব্দ, না?'

'হ্যাঁ।'

'দিদি মনে আছে তোর, বাবার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা ইঞ্জিনে উঠেছিলুম!'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভারের একটা দাঁত সোনার ছিল। আমায় কোলে করেছিল।'

'সে যখন ইঞ্জিনের সিটি বাজাচ্ছিল, তুই ভয়ে ওর বুকে মুখ লুকিয়েছিলি।'

ছোটবোন হাসল।

বড়বোন বলল, 'ওই দ্যাখ।'

বিয়ে করে বউকে নিয়ে বর বাড়ি চলেছে। নতুন ট্রাঙ্ক, নতুন শয্যা, নতুন গহনা কাপড়। জড়োসড়ো হয়ে বউটি হাঁটছে। বর সিগারেট ফুক-ফুক করে টান দিচ্ছে।

'দিদি চুল দেখেছিস, সামনেটা পাতলা।'

'হ্যাঁ।'

'বরটার কিন্তু অনেক বয়স।'

'হ্যাঁ।'

'দাদার সেই বন্ধু আর এল না কেন রে?'

'কি জানি।'

'খুব সুন্দর করে কথা বলত।'

বড়বোন আর জবাব দিল না।

'একদিন চকলেট এনে দিয়েছিল, মনে আছে?' জবাব না পেয়েও ছোটবোন থামল না, 'মা বলেছিল তোকে বোধহয় পছন্দ হয়েছে।'

'চুপ কর এখন।'

ছোটবোনের চোখ ছলছল করে উঠল। কাশির দমক চাপতে সে কুঁজো হল। মৃদু স্বরে বলল, 'জল খাব।'

'খেয়ে আয়।'

ছোটবোন গেল না। বড়বোনের যেন ঝিমুনি লেগেছে। একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে। তাই লক্ষ্য করে ছোটবোন বলল, 'এবার আমরা কি করব?'

'জানি না।'

'দাদা কি বলে দিয়েছিল?'

বড়বোন ভাবতে চেষ্টা করল।

'ওরা কি এবার আসবে?'

'কেন?'

'তাহলে আমরা এসেছি কি জন্যে?'

বড়বোন চোখ মেলে চারধারে তাকাল। মানুষ, আলো শব্দ দেখেশুনে, আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঝিমোন সুরে বলল, 'আমরা অপেক্ষা করব। ওরা আসবে, জিজ্ঞেস করবে সঙ্গে কে আছে, কোথায় যাবে, কেন যাবে। আমরা দুবোন বেরিয়েছি বোম্বাই যাব, সঙ্গে কেউ নেই, ওখানে সিনেমায় নামব। তখন ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবে। আমরা বলব না। তখন ওরা আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।'

'সেখানে কি করবে?'

'জানি না।'

'দিদি চল পালিয়ে যাই।'

একটু-একটু করে বড়বোনের ঝিমোন ভাবটা কেটে গেল। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'কোথায় পালাব?

'যেখানে হোক।'

'তারপর?'

ছোটবোন শুধু তাকিয়ে রইল। বড়বোন হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে আনল। মুখ নামিয়ে বলল, 'ভয় পেয়েছিস?' ছোটাবোন বুকে মুখ গুঁজে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। ওর পিঠে হাত রেখে বড়বোন নিজেকে সিধে করে রাখল।

তখন একজন ভাবল, মানুষের মুখ মরচেধরা টিনের কৌটার মতো।

আর একজন দেখল, হাসতে হাসতে ট্রেনের মুখ চলে যাচ্ছে।

নির্বাচিত গল্প, ১৯৭১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪—)

জন্ম ফরিদপুরে। কবি ও কথাসাহিত্যিক। কবি সুনীল, না কথাশিল্পী সুনীল—কে বেশি জনপ্রিয় বলা কঠিন। নানা ধরনের চাকরি করেছেন। আমেরিকায় ভ্রমণ করেন ১৯৬০ সালে। প্রচুর লেখেন। কয়েকটি গল্প চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। পরিচিত মধ্যবিত্ত জীবনের নানা আবেগ ও অনুভবকে তিনি হার্দাভঙ্গিতে নিপুণ দক্ষতায় উপস্থিত করেন। ভাষার লাবণ্য, আঙ্গিকের পারিপাট্য, গল্পের টান সুনীলকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

খরা

ছিপদহ থেকে ডালটনগঞ্জ যাবার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। ঝকমকে নতুন স্টেশন ওয়াগন, হঠাৎ খারাপ হবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। ব্রিজ পেরিয়ে এসে চড়াই-এ ওঠবার মুখে দু-তিনবার দুর্বল শব্দ করে গাড়িটা যখন থেমেছিল, তখনো কেউ ভ্রূক্ষেপও করে নি—থেমেছে, আবার তো চলবেই—এই হিসেবে জানলা দিয়ে যে-যার নিজস্ব চোখে প্রকৃতি দেখতে লাগল। মিঃ খেমকা সিগারেট-কেস খুলে এগিয়ে দিলেন। জনে জনে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি-হিন্দী, এমন-কি বাংলাতেও অনুরোধ জানালেন। কেসে আটটা সিগারেট ছিল—একবারেই শেষ হয়ে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেও গাড়ি চলল না, পিছন থেকে একটা ট্রাক এসে হর্ন দিতে লাগল, মিঃ খেমকা তখন নিজেই নেমে গেলেন।

সরু ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তা, নদীর পাড় থেকেই খাড়া। নদী না, নদীর কঙ্কাল, রক্ত-মাংস কিছু নেই। অরুণও নেমে দাঁড়াল, গাড়ির মধ্যে ভ্যাপসা গরম। দুহাত পিছনে ছড়িয়ে বুক চিতিয়ে আড়ামোড়া ভাঙল, শরীরটা চিড়বিড় করছে, স্নান করতে না পারলে অস্বস্তি কাটবে না। নদীতে জল থাকলে এইখানেই নেমে পড়া যেত। গায়েপড়া বাজে-ইয়ার্কির মতন অসহ্য রোদ উঠেছে এই সাড়ে এগারোটার মধ্যেই। এখানে বোধহয় অনেকেরই গাড়ি খারাপ হয়, কিংবা ইচ্ছে করে থামে, কেননা পাহাড়ের চাঙাড়ে অনেক শিক্ষিত হাতের লেখা কাঠকয়লা, চকখড়ির। চকখড়ি পায় কোথা থেকে, বেড়াতে বেরুবার সময় লোকে পকেটে চকখড়ি নিয়ে আসে নাকি? সবচেয়ে জ্বলজ্বলে লেখাটি এই—মন্দিরা যোগচিহ্ন, লালকলম, সমান সমান চিহ্ন, হেভেন। অরুণ অস্ফুষ্ট স্বরে বলল, গুড হেভেন্স। হাল।

ড্রাইভার বনেট তুলছে, সেখানেই খেমকার উঁকিমারা মাথা। গাড়ির ভেতর থেকে হেরল্ড ট্রিবিউনের লাহিড়ী বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হেই খেমকা, হোয়াট দা হেল ইউ...

খেমকা অত্যন্ত সপ্রতিভ, কখনো বিচলিত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে বলল, লেটস্ ডু ওয়ান থিং—গাড়িটা যখন ট্রাবল দিচ্ছে, তখন আমরা নেমে যাই, কাছেই

রূপা টুংরি ডাকবাংলো ওখানেই আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই।

ততক্ষণে আরো তিন-চারজন নেমে এসেছে। লাহিড়ীর কোনোদিনই সকালে মেজাজ ভালো থাকে না, সকালের দিকেই সে প্রায় প্রতিবাক্যে 'হেল' উচ্চারণ করে, অরুণ লক্ষ্য করেছে। লাহিড়ী মুখ বিকৃত করে ঘড়ি দেখল, ঘড়িতে সময় দেখার জন্য নয়, তারিখ। বলল, আজ এইটথ্, মাই গুডনেস, আজই আমায় পাটনা পৌঁছতে হবে—তোমাদের টাটা কোম্পানি এই ঝরঝরে লক্কর গাড়ি দিয়েছে—

খেমকা হা-হা করে হাসল। বলল, একেবারে ব্রাণ্ড নিউ গাড়ি, সেইজন্যই ট্রাবল দিচ্ছে। চলুন, চলুন, ইটস আ' নাইস্ লিটল বাংলাউ, আপনার ভালো লাগবে, মিঃ রুঙ্গাচারি, হোয়াট ডুয়ু সাজেস্ট?

রুঙ্গাচারির আপত্তি নেই, আর কারুরই বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু লাহিড়ী সবচেয়ে বড় ইংরেজি কাগজের লোক, সুতরাং তার মেজাজই সবচেয়ে বেশি। সে বিড়বিড় করতে লাগল, ডালটনগঞ্জের ডি এম-এর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল তিনটের সময়...যত সব...বাংলো কত দূরে, এখন রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটবে?

এইতো কাছেই। দেখা যাচ্ছে।

সেখানে খাবার জিনিসপত্র সব পাওয়া যাবে? এ তল্লাটে কোথাও খাবার নেই।

লিভ দ্যাট টু মি, আমারও সঙ্গেও প্রভিসান্স আছে, কোন অসুবিধে হবে না।

খেমকা কিছুতেই অপ্রস্তুত বোধ করে না। লাহিড়ীর সঙ্গে সহাস্য মুখে কথা বলছিল, এবার ড্রাইভারের দিকে ফিরে মুখখানা সম্পূর্ণ বদলে একটা কর্কশ মুখোশ পরে নিল, ক্রুদ্ধ গলায় ড্রাইভারকে কি সব ধমকে পর মুহূর্তে মুখোশখানা খুলে আবার হাসিমুখে লাহিড়ীকে বলল, মাঝে মাঝে এই আনরুটিণ্ড ইনসিডেণ্ট আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে! চলুন।

গাড়ির ক্লীনার মালপত্র বার করে পিছন পিছন বয়ে নিয়ে এল। এক কেস বীয়ার ও তিন বোতল স্কচ তখনো বাকী আছে, সসেজও সব ফুরোয় নি, সেই দিকে চোরাচোখে দেখে লাহিড়ীর মুখের রেখা সামান্য বদলাল।

বাংলোয় দুখানা ঘর, পরিচ্ছন্ন বাথরুম, তিনজন আরদালি। একটু আগেই একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দলবল নিয়ে এখান থেকে গেছেন, সেইজন্য আরদালিরা এখনো উর্দি খোলে নি। খেমকা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন সাবলীল দ্রুততায় অবিলম্বে সব ব্যবস্থা করে ফেলল, কিছুতেই তিনটের বেশি মুর্গি জোগাড় করা গেল না এই আফেসোস প্রকাশ করতে করতে সে বীয়ারের বোতল খুলতে লাগল। লাহিড়ীর কোঁচকানো ভুরু একটু সরল হয়েছে, টেবিলের ওপর আড়াআড়ি পা দুটো তুলে বলল, ওহে খেমকা, এদিকে কাছাকাছি তোমাদের টাটা কোম্পানির কোনো লঙ্গরখানা-টঙ্গরখানা আছে নাকি?

না, এ দিকে নেই। আমরা চারটে পয়েণ্টে রিলিফ দিচ্ছি, কাল যেটা দেখলেন সেটা—

যাক্ বাঁচিয়েছে। যা অত্যাচার করেছ এ তিন দিন!

টর্‌চার? মিঃ লাহিড়ী, ইউ মাস্ট ফেস লাইফ। আপনারা জার্নালিস্টরা—

সকালবেলা মুখ-খিস্তি করিও না। লাইফ—(ছাপার অযোগ্য)—নাও, ঢালো।

দেশের কি অবস্থা তা আপানারা স্বচক্ষে দেখবেন না? বিদেশী রিপোর্টাররা পর্যন্ত—

দেশের অবস্থা দেখবার জন্য তোমাদের এত গরজ কেন হ্যাঁ?

মেলা বক্‌বক্ করো না! ভালগার! এই অরুণ, তোর কাছে চারমিনার থাকে তো একটা দে।

খেমকার সিগারেট-কেস আবার ভর্তি। সে ফটাস করে খুলে এগিয়ে দিতেই লাহিড়ী বলল, তোমার ঐ গোল্ডফ্লেক খেতে খেতে মুখ একেবারে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। ঘাস্! দে অরুণ, চারমিনার দে।

অরুণ দূর থেকে প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, লাহিড়ীদা, আজ এখানে থেকে গেলে হয় না? জায়গাটা বেশ নিরিবিলি।

তোর আর কি, সাতদিন যত ইচ্ছে ছুটি মারবি। আমার পরশুই কলকাতায় গিয়ে প্লেন ধরতে হবে, একটা দিন অবশ্য—মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে গেল, ভাল্লাগে না—

খেমকা বলল, সত্যি সহ্য করা যায় না। এমন করুণ দৃশ্য—

কোনটে করুণ? কোনটে? অ্যাঁ।

লাহিড়ী পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। বিশাল চেহারার চওড়া মুখ লাহিড়ীর, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। এক হিসেবে তার মুখখানা শিশুর মতন রাগ, বিস্ময়, বিরক্তি, হতাশা—এ-সব অভিব্যাক্তিগুলো স্পষ্ট ফুটে ওঠে। এখন অভেজাল বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কোনটে করুণ? অ্যাঁ?

বোম্বে ট্রিবিউনের দেশপাণ্ডে বলল, মিঃ লাহিড়ী, ডিড য়্যু নোটিশ—আমি একটা স্ন্যাপ নিয়ে রেখেছি, বেত্‌লা রিলিফ সেণ্টার...লাইনে বসে থাকতে থাকতেই একটা বুঢ়িটর কোলে মাথা রেকে একটা বুঢ়্ঢা মারা গেল—নিজের চোখে মানুষ এ-সব দেখতে পারে? জয়প্রকাশজীকে দেখলুম বারবার ঘাম মুছছেন, আমিও চোখ বুজে ফেলেছিলুম।

রঙ্গাচারি হাসতে হাসতে বলল, চোখ বোজার আগে ক্যামেরায় ছবিটা তো ঠিকই তুলে নিয়েছ! এখন এ ছবিটা টাইমস কিংবা গার্ডিয়ানকে বিক্রি করবে—

দেশপাণ্ডে তীব্র কণ্ঠে বলল, কভি নেই। আমি আমার দেশের এইসব লজ্জার ছবি কখনো বিদেশীদের কাছে বেচি না।

লাহিড়ী মন দিয়ে শুনছিল, এবার বলল, এটা করুণ দৃশ্য? তার চেয়ে আমাদের অবস্থা করুণ না? এই শালা খেমকা—

খেমকা ঠোঁটমাখা হাসি সমেত নকল ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, আরে আমি কি দোষ করলুম।

তুমিই তো শালা যত নষ্টের মূল।

—কেন? দেশে কি হচ্ছে তা আপনারা—

—দেশে কি হচ্ছে, আমরা নিজের গরজে দেখব। কিংবা আমাদের কাগজ আমাদের দেখতে পাঠাবে। তুমি নেমন্তন্ন করে কেন দেখাতে এনেছ হে? নিজেরা দান-খয়রাত করছ, তাই আবার ঢাক পিটিয়ে দেখানো চাই। নেমন্তন্ন করে এনে কেউ মানুষ-মরা দেখায়? দিনরাত স্কচ খাওয়াচ্ছ। আরামে রেখেছ—আর মাঝে মাঝে একবার করে গিয়ে মানুষ-মরা দেখে আসা—হরিবল, ভালগার—শালা, তোমাদের এগুলো খাচ্ছি বলেই যে তোমাদের পছন্দ করি, তা ভেবো না। নেশাখোর লোক, ভালো মাল দেখলে ছাড়তে পারি না, তা বলে এতখানি অত্যাচার।

খেমকা সম্পর্ণ ভঙ্গি বদলে, মৃদু হাততালি দিয়ে বলল, চমৎকার বলেছেন, আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু আমারও তো চাকরি—

লাহিড়ী চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দার বাইরে থুতু ফেলল। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল। চশমাটা খুলতেই মুখের চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেল তার, সেই অসহায় ধরনের মুখে বলল, সত্যি, ভাল্লাগে না, দ্যাখো গে রান্না হয়েছে কিনা, খিদে পেয়েছে। আর একটু নেশা ধরে গেলে আর খেতেই ইচ্ছে করবে না।

ডাকবাংলোর উঠোনে মস্ত বড়ো ইঁদারা, দলে দলে লোক সেখানে আসছে জল নিতে। একজন আরদালি সেখানে দাঁড়িয়ে খবরদারি করছে, একজন যাতে এক কলসির বেশি জল না নেয়, অরুণ সেই দিকে চেয়ে ছিল। লাহিড়ী তার কাছে এসে বলল, কি দেখছিস? মেয়েছেলে? সাত বছর আগে একবার এই পালামৌতে এসেছিলুম, তখন আমার বয়েস তোর সমান, সেবার দেখেছিলুম এই ওঁরাও মেয়েগুলির কি স্বাস্থ্য! এখন দ্যাখ, একটা মেয়েরও পাছা নেই, বুক নেই—

অরুণ কথা না বলে লাহিড়ীর মুখের দিকে চেয়ে হাসল। লাহিড়ী আবার বলল, তা হলে কি ভাষা ভেবে নিচ্ছিস? তোদের বাংলা কাগজে তো আবার খুব ফালাউ কবিত্ব করতে হয়। নে, আমি বলে দিচ্ছি, লিখবি, অগণিত জনতার মুখে মুখে বিষাদের ছবি...না ছবি না, ছবি কথাটা পুরোনো, ঘাম, বিষাদের ঘাম, আরো ভালো হয় বিষাদের স্বেদ, ফার্স্টক্লাশ, রোদ, বধির রোদ্দুর, নে চমৎকার হেডিং পর্যন্ত বলে দিচ্ছি—আকাশে বধির রোদ্দুর, নিচে বিষাদের স্বেদ—পোয়েট্রি!

অরুণ কথা না বলে আবার হাসল। এই হাসিটা একটু অন্য রকম। লাহিড়ী সেটা লক্ষ্য করল। বলল, একটু বেশি বক্‌বক্ করছি, না? সিলি অ্যাণ্ড স্টুপিড! ভেবে দাখ ট্রাজেডিটা, হাজার-হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে ধুঁকছে—আর আমাদের কাজ

কি, সেটা বর্ণনা করার সময় কোন্ ভাষাটা হবে, তাই নিয়ে মাথা ঘামানো, তাই না? ভাল্লাগে না!

লাহিড়ীদা, কাছাকাছি কোথায় যেন একজন সাধু এসে খুব কাজ করছেন শুনেছিলুম।

সাধু! কিসের সাধু?

বোম্বে থেকে কোন সাধু এসে নাকি রোজ এক হাজার লোককে খাওয়াচ্ছেন। সাধুর বড়লোক ভক্তরা টাকা আর চাল পাঠাচ্ছে, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। চলুন না যখন এখানে থাকাই হল, তখন ব্যাপারটা কভার করে আসি?

সাধু লোক খাওয়াচ্ছে, তাতে তোর আমার কিরে শালা?

সে নাকি এক এলাহি কাণ্ড। আপনাদের ইংরিজি কাগজের পক্ষে বেশ ভালো স্টোরি হয়।

আঃ, চুপ কর না! বীয়রটা এতো তেতো, আঃ আমাশায় পাঁচন খাচ্ছি যে...ভেজাল দিয়েছে বোধহয়—

বীয়ার তো একটু তেতো হবেই।

বাজে বকিস্ না। তুই দুধের বাচ্চা, তুই আমাকে শেখাবি বীয়ার তেতো কি না।

লাহিড়ী মুখটা কুঁকড়ে রইলেন। চশমা খোলা অসহায় মুখ।

একবার এর কাছে একবার ওর কাছে যাচ্ছে অবোল-তাবোল বকবক করছে অনররত, অন্য কেউ কিছু বলতে গেলেই চেচাচ্ছে, আঃ চুপ কর না। স্টপ হাউলিং, উইল য়্যু? হঠাৎ লাহিড়ী খেমকার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠে বলল, এই শালা খেমকা, তোর নামে আমি রুস্তমজীর কাছে লাগাব। তোকে আমি রাঁচিতে ট্রান্সফার করাব।

খেমকা বসেছে বারান্দার একেবারে ধার ঘেঁষে, তার চোখে মুখে রোদ্দুর, মুখখানা সেই সুবাদে জলন্ত, মিষ্টি সুরে খেমকা বলল, তা যদি করেন, বুঝব আমার ভালোর জন্যই করেছেন। ইউ আর ওলওয়েজ মাই ফ্রেণ্ড।

ফ্রেণ্ড না কচু!

ওলওয়েজ! কিন্তু, এই মুহূর্তে আমার দোষটা কি?

লাহিড়ী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। তীব্র চোখে তাকিয়ে খেমকার দোষ খুঁজছে। এ দিকে ও দিকে তাকালো, চোখে পড়ল নিজেরই হাতের খালি গ্লাস। বলল, খালি তখন থেকে দিশী বীয়ার খাওয়াচ্ছো, স্কচগুলো কি তোমার মাগকে খাওয়াবে? অ্যাঁ?

খেমকা ঝটিতি উঠে টেবিলের তলা থেকে স্কচ বার করে বলল, আমি লক্ষ্য করেছি মন খারাপ হলে আপনি হুইস্কির বদলে বীয়ার খেতেই ভলোবাসেন, সেইজন্য—

আমার মন খারাপ তোমায় কে বলেছে, গাণ্ডু? আমার খিদে পেয়েছে। তখন থেকে বলছি খাবারের ব্যবস্থা করতে—

খাবার এখনই প্রস্তুত। ধপধপে সাদা সরু চালের ভাত, টিনের মাখন, আলুভাজা আর গরম মুর্গির ঝোল। রুঙ্গাচারি ফিসফিস করে অরুণকে বলল, এই কদিনের মধ্যে আজকের চালটাই সবেচেয়ে ভালো। সবচেয়ে খরা অঞ্চলে আমরা সবচেয়ে ভালো চাল পেলাম—তাই না?

অরুণ বলল, মুর্গির স্বাদও খুব ভালো। রেঁধেছে যা—

একটু বেশি ঝাল দিয়েছে।

তখন সবেমাত্র একটা বেজেছে, লাহিড়ীর এর মধ্যেই চুরচুরে নেশা। আঙুল দিয়ে খাবার ঘাঁটাঘাঁটি করছে, কিছুই খাবার দিকে মন নেই। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এসেছে—আজ সারাদিন ওর এ রকমই চলবে। অথচ অরুণ দেখেছে, ঐ মানুষটাই যখন রিপোর্ট টাইপ করতে বসে তখন অন্য রকম চেহারা। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর ভাষার জোর, কি একাগ্র মুখ তখন। অরুণ বলল, লাহিড়ীদা, আপনি কিছুই খাচ্ছে না।

না-ধুৎ! কি খবো—ভাল্লাগে না, পচা—মুর্গির মাংসটা পচা।

খেমকা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলল, জ্যান্ত মুর্গি পচা? হাঃ-হাঃ সকলেই হেসে উঠল। লাহিড়ী ক্রুদ্ধ গলায় বলল, হোয়াটস্ ফানি? অ্যাঁ? আলবাৎ পচা! ধ্যাৎ—

লাহিড়ী আঙুল দিয়ে ভাত আর মাংস মেঝেতে ছড়াতে লাগল দেখে দেশপাণ্ডে বলল, দাদা, না খাবেন তো থাক, নষ্ট করবেন না খাবার।

বেশ করব নষ্ট করব। তোমার তাতে কি?

এটা অন্যায়! এত লোক খেতে পাচ্ছে না, আর আমরা এ রকম পেট ভরে খাচ্ছি সেটাই তো অন্যায়, তার ওপর আবার নষ্ট করা—

আঃ, চুপ কর না। বেশ করব নষ্ট করব।

কোনো মানে হয় না। বাংলোর বেয়ারারা খেতে পারে—কিংবা কোনো ভিখিরিকে দিলে।

সাট্ আপ্! আমি কিছু শুনতে চাই না। খেতে পাচ্ছে না, ভিখিরি—ভাল্লাগে না, আর সহ্য করতে পারি না। নতুন নাকি...আগে বুঝি না খেয়ে কেউ....আবার ডেকে দেখানো। এই খেমকা, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি—আজ সারাদিন এখানে কেউ ও-সব খেতে না পাওয়া-টাওয়ার কথা বলতে পারবে না! এনাফ! আজ সারাদিন ছুটি, বুইলে! আজ দুর্ভিক্ষ থেকে ছুটি, বুইলে তো সবাই, আজ শুধু মদ আর মেয়েছেলের গল্প করব—খবর্দার কেউ আর ও-সব কথা—

তার দরকার হবে না মিঃ লাহিড়ী, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, খেয়ে উঠেই আমরা স্টার্ট করতে পারব।

মাইরি আর-কি! খেয়ে উঠেই আমি এখন তোমার ঐ ঝকাং ঝকাং গাড়িতে উঠছি আর-কি! আজ আমরা এখানে থাকব!

কিন্তু আপনি বলছিলেন পরশু কলকাতায় আপনাকে প্লেন ধরতে হবে।

আমার প্লেন ধরতে হবে তো, তোমার অত ভাবনা কিসের? বলছি তো আজ ছুটি।

দিল্লির সাংবাদিক দুজন অবশ্য তখনই চলে যেতে চায়। দেশপাণ্ডেরও থাকার ইচ্ছে নেই। তার তোলা ছবিগুলো টাট্‌কা ছাড়তে না পারলে মূল্য থাকবে না। শেষ পর্যন্ত চারজন চলে গেল। বাকি চারজন রয়ে গেল, গাড়ি আবার ফিরে আসবে।

বারান্দায় ইজি-চেয়ারে ওরা বসেছে। লাহিড়ী আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলেছে, জোর করে অন্যদের গ্লাসেও ঢালিয়েছে। অ্যালকোহল এখন রক্তে মিশেছে। শরীরে সব ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্তের সঙ্গে ছুটছে অ্যালকোহল, লাহিড়ী একেবার ছটফট করছে। একবার চেয়ার ছেড়ে উঠছে, কখনো পায়চারি করছে, আবার বসছে। খাঁ-খাঁ করছে রোদ, এই রদ্দুরের মধ্যে হাওয়া উঠলে আলৌকিক শব্দ হয়। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে সেই শব্দকারী হাওয়া।

ইঁদারা থেকে জল নেবার জন্য তখনো অনবরত নারী-পুরুষ আসছে। কপিকলের ঘড়ঘড় শব্দ, ওদের দুর্বোধ্য ভাষায় ঝগড়া। লাহিড়ী নিজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, কি সব চুপচাপ কেন? গল্প হোক। এই রুঙ্গাচারি, এবার যে রাশিয়া থেকে ঘুরে এলে, ওখানে মেয়েছেলে কি রকম? পাওয়া যায়?

রুঙ্গাচারি হাই তুলে বলল, আমার খুঁজে দেখার সময় হয় নি। এমন টাইট প্রোগ্রাম ছিল!

তুমি মেয়েছেলের খোঁজ করো নি, তাই বিশ্বাস করব? সেবার জার্মানিতে গিয়ে তো, বলো না, সেই একটা গল্পই বলো না।

আপনি বলুন।

আমি আর কি বলব! জুল্পিগুলো সব পেকে গেল এই যা দুঃখু, এখন আর—এই অরুণ, তোর কাঁচা বয়েস, বিয়ে তো করিস নি! প্রেম-ট্রেমের দু-একটা গল্প ছাড় না।

লাহিড়ীদা, আপনি বরং আপনার সেই স্পেনের অ্যাফেয়ারটা।

রামযশ সিং অত্যন্ত সিরিয়াস ধরনের লোক। কারুর ইণ্টারভিউ নেবার সময় ছাড়া সহজে মুখ খোলে না। মদও খেয়ে যায় চুপচাপ। রুঙ্গাচারি তাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, বিহারের কত পার্সেণ্ট পপুলেশন ড্রাউট অ্যাফেকটেড?

রামযশ সিং সংক্ষেপে বলল, ফিফটি-ফোর পার্সেণ্ট, এখন পর্যন্ত।

স্টার্ভেসানে মৃত্যুর সংখ্যা?

কোন অফিসিয়াল রেকর্ড নেই। আন-অফিসিয়ালি—

লাহিড়ী হুংকার দিয়ে উঠল, আবার ঐ কথা? পাগল করে ছাড়বে দেখছি? বললুম না আজ ছুটি! একদিনের জন্যও চাকরি ভুলতে পারো না!

মিঃ লাহিড়ী, এটা শুধু চাকরির ইণ্টারেস্ট নয়। হিউম্যান ইণ্টরেস্ট।

স্যাট আপ! কোনো কথা শুনতে চাই না।

নো ইউজ আরগুইঁ উইথ আ ড্রাঙ্ক—

মোটেই ড্রাঙ্ক নই! পরের পয়সায় মদ মুর্গি পেঁদিয়ে এখন আবার হিউম্যান ইন্টারেস্ট! বুল শীট! এখন মেয়েছেলের গল্প হবে। মদ-মাংসের পর মেয়েছেলের গল্পই ঠিক।

বলুন না, আমরা তো শুনতে রাজিই আছি।

লাস্ট ইয়ারের জানুয়ারিতে, ম্যাড্রিডে ছিলাম তখন, হোটেলে—রাত্তির—বেলা—মেয়েটা বাথটবে গা ডুবিয়ে ছিল—আমি নক্ করতেই তোয়ালে জড়িয়ে—আমার তখন প্রচণ্ড নেশা—এই দ্যাখো, ঘুমোচ্ছে—এই রুঙ্গাচারি—এই।

রুঙ্গাচারির দিব্যি নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লাহিড়ী তিন-চারবার তাকে চেঁচিয়ে ডাকলো, কোনা সাড়া নেই। টলতে টলতে লাহিড়ী এগিয়ে গিয়ে তার চুলে টান মেরে বলল, এই শালা, রুঙ্গাচারি। রুঙ্গাচারি ধড়ফড় করে উঠে বলল, এঃ ঘুম এসে গিয়েছিল—। দেখুন না, খেমকাও ঘুমোচ্ছে—

শালা খেমকার নামে আমি রুস্তমজীর কাছে লাগাব! এই (ছাপার অযোগ্য) খেমকা—

খেমকা চোখ খুলে বলল, আমি ঘুমোচ্ছি না। এমনি চোখ বুজে আছি, আপনি বলুন না, আমি শুনেছি! তারপর সেই তোয়ালে জড়ানো মেয়ে—

আমি একটানে তোয়ালেটা খুলে নিলুম! অমনি দেখলুম, জগ-জননীর রূপ, ওফ্! বাজী ফেলে বলতে পারি, ওরকম মেয়ে কোটিতে একটা নেই—সারা গায়ে ছুরির ধার। বুক কি—দুখানা সার্চলাইট, আর উরু—মেয়েটা প্রথমেই কি বলল, বলল? মেয়েটা তখন আমায় কি বলল?

কে জবাব দেবে! তিনজনের নাক দিয়ে ফিচফিচে ঘুমের নিশ্বাস। মাথা হেলিয়ে সব ঘুমোচ্ছে। একমাত্র অরুণ জেগে। অল্প হাসছে।

লাহিড়ীর মুখে স্পষ্ট বেদনার ছায়া। চোখ বিস্ফারিত করে বলল, সব ঘুমিয়ে পড়ল, অ্যাঁ? পুরুষমানুষ? মেয়েছেলের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে? হিউম্যান ইন্টারেস্ট! শালারা—

অরুণ বলল, লাহিড়ীদা, আপনি বলুন না। কি বলল মেয়েটা?

শুনবি! আমার হাতে তোয়ালে, মেয়েটা ঠ্যাকারে হেসে বলল, আমার পিঠটা ভিজে আছে, মুছে দাও। আমি তখন—ধ্যাৎ, ভাল্লাগে না! তিনতিনটে মোষের নাক ডাকা—এর মধ্যে ওসব গল্প হয়! চল, উঠে পড়ি, একটু ঘুরে আসি।

কোথায় আর যাবেন এই রোদ্দুরে! বসুন না। লাহিড়ীদা, আপনার জন্ম হয়েছিল কোথায়?

এলাহাবাদে। আমার বাবা ওখানে প্রফেসর ছিলেন। কেন, তা তোর কি দরকার?

এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম।

ঐ হুইস্কির বোতলটা এ দিকে নিয়ে আয় তো! আচ্ছা, থাক্, আর খাবো না, ভাল্লাগছে না। এখন কি করি বল তো?

আপনিও ঘুমিয়ে পড়ুন না।

দুপুরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমোবো? ধুৎ! তার চেয়ে চলে গেলেই হত দেখছি—এই কতকগুলো নাকডাকা মোষের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা—তুই এখন কি করবি?

কিছু না। আমি এখানেই চুপচাপ বসে থাকব। আমার অনেকগুলো কথা মনে পড়ল। এখানে এসে—

কি কথা? প্রেমিকা—

না না। আমি জন্মেছিলুম পূর্ববঙ্গে। বাংলা দেশে সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের বছরে। ১৯৪৩ সালে—আমি পূর্ববঙ্গেই ছিলুম—সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছে হঠাৎ

তখন তো তুই বাচ্চা ছেলে ছিলি!

হ্যাঁ। আমার খুব পেটের অসুখ ছিল, খিদেও পেতো সব সময়। সারাদিন শুধু খাই-খাই করতুম আর কাঁদতুম। বাড়ির লোককে খুব কষ্ট দিয়েছি।

আ মেলো। হঠাৎ এখানে এসে তোর সে কথা মনে পড়ছে কেন?

বাবা কলকাতায় মাস্টারি করতেন, সে আমলের ব্যাপার তো জানেন, বাবা মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাতেন, তখন পূর্ববাংলায় আমাদের গ্রামে চালের মণ ছাপ্পান্ন টাকা! বাড়িতে পাঁচজন লোক। সারাদিনে একবার মাত্র ভাত ফ্যান মিশিয়ে খাবার জুটত আমাদের। আর আলুসেদ্ধ। পকেটে আলুসেদ্ধ রাখতুম সব সময়—তখন ক্লাস ফোরে পড়ি, ইস্কুলে গিয়েও পকেট থেকে আলুসেদ্ধ বার করে খেতুম। ক্লাসে সব ছেলেই বাড়ি থেকে আলুসেদ্ধ আনত—বেঞ্চির উপর নুন—আমার সহ্য হত না, পেটের অসুখের রুগী তো, ফেনাভাত সহ্য হত না, আলুসেদ্ধ সহ্য হত না, তবু খিদে, মাকে জ্বালাতুম, মা খেতে বসলে মা'র খাবার কেড়ে খেতুম।

লাহিড়ী অকারণে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। বলতে লাগল, বুঝেছি বুঝেছি! লাহিড়ী সেখান থেকে উঠে বারান্দার কোণে চলে গেল, অন্য দিকে চেয়ে বলল, বুঝেছি, তোর মা বেঁচে নেই, না?

না আমার মা সেই বছরই টি.বি.-তে মারা যান। রাক্ষুসে খিদে ছিল আমার। পেটে কিছু সহ্য হত না। তবু মায়ের খাবার কেড়ে খেতুম। মা কারুকে কিছু না বলে রোজই না খেয়ে থাকতেন। সেই থেকেই মায়ের টি.বি. হয়। তখন কিছু বুঝতুম না—এখন সব মনে পড়েছে। কাল লঙ্গরখানায় লাইন দেখে হঠাৎ কিরকম যেন লাগল। একটু মজাই লাগল বলতে গেলে। মনে হল, কি আশ্চর্যভাবে, আমি তো ঠিক বেঁচে গেছি।

লাহিড়ী হুংকার দিয়ে উঠল, মজা লাগল মানে! এটা কি মজার ব্যাপার?

অরুণ সেইরকমই দুর্বোধ্যভাবে হেসে বলল, হ্যাঁ। সেই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে আমিও তো মরে যেতে পারতুম! মরি নি। আমার মাকে মেরে ফেলে আমি বেঁচে আছি। বেঁচে থাকাটাই একটা মজার ব্যাপার না?

লাহিড়ী সিগারেটের শেষ টুকরোটা আঙুলের ওপর রেখে টুসকি মেরে দূরে ছুঁড়ে দিল। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সাগুলো নিয়ে ঝনঝন করল। একহাত রাখল মাথার চুলে। হঠাৎ লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নামল নিচে, একটা ফুল ছিঁড়ল। চেঁচিয়ে বলল, যা, অরুণ, তুই ঘরে যা—কিছুক্ষণ ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাক্ বরং। ভালো লাগবে।

অরুণ চোখ দিয়ে লাহিড়ীর গতি অনুসরণ করছিল। জবাব দিল, না ঠিক আছে, এখানেই বেশ ভালো লাগছে।

লাহিড়ী এগিয়ে গেল ইঁদারাটার দিকে। একটা মেয়ে সদ্য কলসীতে জল ভরে ফিরছে, তাকে বলল, দে তো মাঝিন্, একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে নি!

মেয়েটা একটু আড়ষ্টভাবে দাঁড়াল, তাকালো লাহিড়ীর নেশাগ্রস্ত লাল চোখের দিকে। তারপর কাঁখ থেকেই কলসীটা বাঁকিয়ে ঢেলে দিল খানিকটা জল অঞ্জলি পেতে টলটলে ঠাণ্ডা জল নিয়ে লাহিড়ী ঝাপটা মেরে তার চশমা-খোলা মুখটা ধুয়ে নিল। আবার চেয়ে নিয়ে খানিকটা জল খেয়েও ফেলল। তারপর মেয়েটিকে বলল, আয় তোকে আবার জল ভরে দিচ্ছি।

আরদালিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক হ্যায় তুম্ যাও। আমিই এদের সকলকে জল তুলে দিচ্ছি।

উঁকি মেরে দেখল, কুয়োর অনেক নিচে জল তা হোক, ফুরোবে না।

নির্বাচিত গল্প, ১৯৭২

প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪—)

জন্ম ঢাকায়। আঞ্চলিক জীবনকে অবলম্বন করে উপন্যাস লিখে সাহিত্যজীবন শুরু করেন। 'পূর্বপার্বত্য' উপন্যাস তাঁকে চিহ্নিত করে দেয়। তাঁর উচ্চাশী উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকা' (দু পর্ব) একালের বাঙালী জীবনের ক্রনিকল্। তাঁর গল্প অবলম্বনে কয়েকটি ছবি হয়েছে। হার্দ্যভঙ্গিতে নিবিড় আন্তরিকতায় তিনি কাহিনীকে উপস্থিত করেন। কাহিনীবয়নে ও চরিত্রচিত্রণে তাঁর সমান নৈপুণ্য।

বাঁচার জন্য

মাঘ মাস শেষ হয়ে এল। তবু শীত যাবার নাম করে না তার ওপর আজ সকাল থেকেই আকাশের এ-কোণে ও-কোণে পাথরের চাঙড়ার মতন মেঘ ঝুলে আছে। মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু রোদ দেখা দেয়, মেঘাচ্ছন্ন ভারী আকাশ আচমকা চমক দিয়ে ওঠে, পরক্ষণেই আভাটুকু নিভে যায়।

বিষ্টুপদ যখন উত্তরের মাঠে এসে পৌঁছুল, শীতের বেলা হেলে গেছে। গাছপালার ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে।

বিষ্টুপদর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ঢিবির মতন মোটা নাকটায় অঢলধারে ঘোলাটে চোখ। ভুরু নেই বললেই হয়। কালচে পুরু ঠোঁট নিচের দিকে ঝুলে আছে। ভাঙা গলা তার। অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা। গায়ে খসখসে কালো চামড়া থেকে খই উড়ছে। সব মিলিয়ে একটা বাজে পোড়া তালগাছ যেন। লোকটার সার গায়ে মোটা মোটা চওড়া হাড় শুধু। এই কাঠামোয় একটু যদি মাংস লাগত, বিষ্টুপদ পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড বলশালী একটা মানুষ হয়ে উঠতে পারত।

আচ্ছাদন বলতে তার কোমরে নোংরা চিটচিটে নেংটি আর হাজার গণ্ডা তালি দেওয়া চিত্র-বিচিত্র জামা। মাথায় গামছা বাঁধা। এ ছাড়া কাঁধে একটা টাঙি রয়েছে বিষ্টুর। কোমরে ধারাল দা গোঁজা।

আজ তিন দিন কাজ নেই বিষ্টুপদর। কাজ নেই, কাজেই রোজাগরও নেই। তার মতন ভূমিহীন দিন-মজুরের ঘরে কাঁড়ি-কাঁড়ি সোনাদানা জমানো থাকে না যে বসে বসে খেতে পারবেন। দু-চার দানা যা চালটাল ছিল কাল পর্যন্ত চলেছে। আজ যদি কিছু জোটাতে পারে, বউ ছেলেপুলে খেতে পাবে। নইলে উপোষ।

ঘুম থেকে উঠেই কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল বিষ্টুপদ। কিন্তু কোথায় কাজ? ঘুরে ঘুরে যখন সে ক্লান্ত আর হতাশ সেই সময় উত্তরের এই মাঠটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

উত্তরের এই মাঠ অনেকবার বিষ্টুপদকে বাঁচিয়েছে। এখান থেকে কোনবার ফলপাকুড়, কোনবার শাকপাতা, কোনবার পাখিটাখি, কোনবার মেঠো কচ্ছপ, কোনবার

খরগোশ নিয়ে গিয়ে ছেলেপুলের প্রাণরক্ষা করেছে সে। আজও আশায় আশায় এসেছে।

মাঠে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিষ্টুপদ। জায়গাটা নির্জন। ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে যতদূর চোখ যায় ঘাসেভরা জমি। এই শীতে ঘাস অবশ্য সজীব সতেজ উজ্জ্বল নেই, বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়, গাছগাছালি। মাঠের ভেতর দিয়ে একটা খালও গেছে।

চারদিক দেখতে দেখতে এক সময় হাঁটতে শুরু করল বিষ্টুপদ। এই পড়ন্ত বেলায় মাথার ওপর ঝাঁক-ঝাঁক পাখি উড়ছে। বিষ্টুপদ ভাবল, গুলতিটা যদি নিয়ে আসত! আকাশ থেকে খুব সহজেই দু-একটা পাখি নামানো যেত। না, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

চলতে চলতে যে ঝোপ অথবা গাছ সামনে পড়ছে, তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে বিষ্টুপদ। ঘাসের জমিতেও তার কাম্য তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না।

অনেকক্ষণ হাঁটবার পর হঠাৎ মাঠের মাঝখানে খালের দিকে নজর যেতেই থমকে গেল বিষ্টুপদ। খালের পাড়ে একটা মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন তাকেই দেখছে।

বিষ্টুপদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে থেকে দশ পা হাঁটলেই মেয়েমানুষটিকে ধরা যায়। এত কাছে বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মেয়েমানুষটির চোখ ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ।

এই নির্জন মাঠে শীতের অবেলায় কোথা থেকে এল। মেয়েমানুষটি! বিষ্টুপদ ভেবে পেল না। সে-ও তাকিয়েই আছে। মেয়েমানুষটির রঙ শ্যামলা, গোলগাল ভাঁটা গড়ন, বোঁচা নাক, পুষ্ট বুক। স্বাস্থ্য এত উদ্দাম আর অঢেল যে পরনের খাটো শাড়িটায় বাগ মানছে না। তার হাতে একটা বড় কাটারি।

অনেকক্ষণ পর বিষ্টুপদ শুধলো, 'তুমি কে গো মেইয়েছেলে?'

তীক্ষ্ণ চাপা গলায় মেয়েমানুষটি বলল, 'যেই হই না। তুমি এখেন থেকেঙ (থেকে) যাও দিকিন।'

যাও কইলেই যাওয়া যায় নাকিন? এখানে আমার কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'সে আছে।' বলে একটু থামল বিষ্টুপদ। তারপর আবার বলল, 'এই নির্জন মাঠে একা-একা তুমি এয়েছ?'

মেয়েমানুষটি বলল, 'আমারও কাজ আছে।'

নিজের অজান্তেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল বিষ্টুপদ। মেয়েমানুষটি তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, এক পাও এগুবে নি ব্যাটাছেলে। কাটারি চালিয়ে দেবো কিন্তু।'

বিষ্টুপদ চমকে উঠল। লক্ষ্য করল, একটু আগের ভয় আর নেই মেয়েমানুষটার।

তার চোখের তারা এখন দপদপ করছে।

ভয়ে ভয়ে বিষ্টুপদ বলল, 'বেশ তোমার য্যাখন ইচ্ছে নয়, এগুব না। কিন্তু তুমি মানুষটা কুথাকার, কতুথেঙে (কোথা থেকে) এখেনে এলে, তা কইতে দোষটা কী?'

কি ভেবে মেয়েমানুষটি কিছু নরম হল, 'আমি তালডাঙায় থাকি। হোই উত্তুরে...'

'সি তো অনেক দূর, পেরায় দু কোশ রাস্তা হবে।'

'হ্যাঁ'—

'অদ্দূর থেঙে এয়েছ!'

'দরকার পড়লে আসতে হবে নি?'

'দরকারটা কী, কও না?'

মেয়েমানুষটি বলল, 'অত য্যাখন জানবার ইচ্ছে, শোন। আমি শাগপাতা ফলপাকড়ের তরে (জন্যে) এখেনে এয়েছি।'

বিষ্টুপদ অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়রে সুরে বলে, কী আশ্চয্যি। আমিও তো ঐসবের তরেই (জন্য) এয়েছি।'

মেয়েমানুষটির চোখের তারা আবার দপদপিয়ে উঠল, 'মিছে কথা।'

'মাইরি কইছি, মিছে কথা নয়—' বিষ্টুপদ আকুলভাবে বলতে লাগল, 'ভগবানের দিব্যি। সকাল থেঙে ছেলেপুলা উপুষ দিয়ে আছে। তিন দিন এক পয়সা রোজকার নেই। এই মাঠে থেঙে কিছু না নিয়ে ঘরে ফিরলে বাচ্চাকাচ্চা বাঁচবে নি।'

বিষ্টুপদর কণ্ঠস্বর শুনে তার আকুলতা দেখে কথাটা বিশ্বাস করল মেয়েমানুষটি। বলল, 'কুনো খারাপ মতলব লেই তো তোমার?'

'অই দ্যাখো; ভগবানের দিব্যি দিয়ে কইলাম। বেশ, কাছে এইগে (এগিয়ে) এস, তোমায় গা ছুঁয়ে কইছি।'

'গা ছুঁতে হবে নি। তা ঘর কুথায় তোমার?'

'পয়ারপুরে—হোই দক্ষিণে—'দক্ষিণ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল বিষ্টুপদ।

'তোমার ঘরও তো অনেক দূর। তিনয়দ্দিন টেঁকা যায়।'

এবড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁত বার করে বিষ্টুপদ হাসল, 'হ্যাঁ। ঐ যে তুমি কইলে দরকার পড়লে দূর থেকেও আসতে হয়...'

মেয়েমানুষটি বলল, 'তা বটে।'

বিষ্টুপদ বলল, 'এত কথাবাত্তা হল। কিন্তু কেউ কারো নাম জানি না। আমার নামটে বিষ্টুপদ। তোমার?'

'নিশি—নিশিবালা।'

একটু চুপ। তারপর বিষ্টুপদ বলল, এট্টা কথা কইব মেইয়েমানুষ—'

'কী?'

'তুমি যার তরে (জন্যে) এয়েছ, আমিও তার তরেই এইছি। এসো না দুজন

একত্তর (একসঙ্গে) শাগপাতা ফলপাকড় খুঁজি। শীতের বেলা, এক্ষুণি সন্‌ঝে নেমে যাবে। তুমি যুবতী মেইয়েছেলে, একা-একা মাঠে ঘুরে বেড়ানো ঠিক লয়।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নিশি বলল, 'সেই ভালো। চল, তোমার সঙ্গেই যাই।' সে নিজে থেকেই বিষ্টুপদর কাছে এগিয়ে এল।

তারপর মাঠের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দুজনে একটা অলিখিত চুক্তি করে ফেলল। এখানে যা পাওয়া যাবে তারা সমান দুভাগ করে নেবে।

এই মাঠের প্রতিটি ঝোপ-ঝাড়, প্রতিটি খানাখন্দে বিষ্টুপদ আর নিশি হানা দিতে লাগল। কিন্তু গোটা চারেক ছোটছোট মেঠো কচ্ছপ ছাড়া কিছুই মিলল না। ওগুলোর শক্ত খোলা ছাড়ালে কতটুকু আর মাংস পাওয়া যাবে?

মুখ বুজে তারা হাঁটছিল না খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কখনও নিশি শুধোয়, 'ঘরে তোমার কে কে আছে গো ব্যাটাছেলে?' এই অল্প সময়টুকুর ভেতর বিষ্টুপদ সম্বন্ধে তার মন থেকে সন্দেহ আর ভয় কেটে গেছে। তাকে মোটামুটি বিশ্বাস করতে পেরেছে নিশি।

বিষ্টুপদ বলে, 'ছেলেপুলা আর মাগ।'

'কটা ছেলেপুলা?'

'তিনটে। দুটো মরদ ছেলে আর একটা মেইয়ে।'

'তা হলে পাঁচজনের সোম্‌সার তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কী কর তুমি?'

'মজুর খাটি।'

'ওতে চলে?'

'চলে আর কই। পেরায় দিনই আধপেটা খাই, লইলে উপুষ।'

একটু ভেবে নিশি বলে, 'জমিন-টমিন আছে?'

বিষ্টুপদ বলে, 'জমিন কুথায় পাব?'

'শুধু গতরের ওপর ভরসা করে তাইলে বাঁচা।'

'হ্যাঁ।'

'সি যে বড্ড কষ্ট।'

'কষ্ট হলে আর কী করা। এমনি করে যদিন টেঁকা যায়।'

কখনও বিষ্টুপদ শুধোয়, 'আমার কথাই শুধু শুনবে? তোমার কথা কও...'

নিশি বলে 'আমার আবার নতুন কথা আছে নাকিন? গতরের ওপর আমারও ভরসা।'

'সি (তো) কি আর বুঝতে পারি নি ভেবেছ? ঠিকই পেরেছি। আমি সি কথা শুদোচ্ছি না গো মেইয়েছেলে...'

'তবে কী শুদাচ্ছো?'

ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গিনীকে এক পলক দেখে নিল বিষ্টুপদ। তারপর বলল, 'শাঁখাসিঁদুর দেখছি না। মেইয়েছেলের কি এ্যাখনও বে' (বিয়ে) হয় নি?'

অন্যমনস্কের মতন নিশি বলল, 'হয়েছিল।'

'তা হলে?'

বিষ্টুপদ কি জানতে চায় নিশি বুঝতে পারল। বিয়ে হয়েছিল অথচ তার হাতে শাঁখা নেই, কপালে সিঁদুর নেই। তাই হয়তো বিষ্টুপদর ধান্দা লেগেছে। ভারী বিষণ্ণ গলায় নিশি বলল, 'আমার মদ্দটা লেই।'

জিভের ডগায় আক্ষেপসূচক শব্দ করল বিষ্টুপদ। দুঃখের গলায় বলল, 'আহা গো, এই বয়সেই সোয়ামী খোয়ালে?'

নিশি উত্তর দিল না।

বিষ্টুপদ আবার বলল, 'তা কী হয়েছিল? রোগ-ব্যায়রাম?

নিশি বলল, 'না। জোতদারদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মরেছে। পেটে সড়কি চালিয়ে দিয়েছিল ওরা, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছিল। সি চোখে দেখা যায় না গো—' বলতে বলতে হঠাৎ এই জনহীন স্তব্ধ প্রান্তরকে চমকে দিয়ে গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল, 'অ বাবা গো, আমার অত বড় জোয়ান মদ্দটাকে ওরা মেরে ফেললে গো।'

বিষ্টুপদ একটু দ্বিধা করল। তারপর নিশির রুক্ষ চুলে হাত বুলাতে বুলাতে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'কেঁদো নি মেইয়েছেলে, কেঁদো নি। ক্ষেতি (ক্ষতি) যা হবার তা হয়ে গেছে।'

অনেকক্ষণ পর শোকাচ্ছ্বাস শান্ত হলে বিষ্টুপদ শুধলো, 'ছেলেপুলা ক'টা গো তোমার?'

আবছা গলায় নিশি বলল, 'লেই।'

'তবু রক্ষে।'

নিশি চুপ করে রইল।

বিষ্টুপদ আবার শুধোল, 'সোম্সারে আর কেউ আছে?'

বুড়ী শাউড়ী আছে। দিন-রাত্তির হাঁ করেই থাকে; বড্ড খিদে বুড়ীর। অত বড় পাহাড়ের পানা মতো ছেলেটাকে খেল তবু খিদে মেটে না। ওর হাঁ বুজোতে বুজোতে আমিই একদিন সাবাড় হয়ে যাব।'

'জমিন-টমিন আছে?'

'থাকলে কি আর শাগপাতার তরে মাঠে মাঠে ঘুরে মরছি!'

দুজনে খুঁজছে খুঁজেই যাচ্ছে। কিন্তু জননীর মতন এই বিশাল মাঠ আজ বড় কৃপণ, বড় নির্দয়। চারটে মেঠো কচ্ছপের পর গোটা পাঁচেক পাকা বেল ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কিছুই পাওয়া যায় নি। আধাআধি করলে ভাগে আর কতটুকু বা পড়বে?

ওদিকে শীতের বেলা আরো হেলে পড়েছে। রোদ-টোদ এখন আর নেই। সূর্যটা পশ্চিমদিকের ঘন গাছ-পালার আড়ালে কখন টুপ করে নেমে গেছে, বিষ্টুপদ বা নিশি টের পায় নি। দ্রুত চারদিক ছায়াচ্ছন্ন, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

সকাল থেকেই আকাশের এধারে-ওধারে মেঘের চাঙড়া ঝুলছিল; হঠাৎ সেগুলো অনেকখানি নেমে এসেছে যেন। ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। তার ওপর কনকনে উত্তুরে বাতাস। চামড়া মাংস ভেদ করে বাতাসটা একেবারে হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। ঠাণ্ডা তৃণভূমি থেকে হিম উঠে আসছিল।

ডান পাশ থেকে নিশি বলল, 'আজ বড্ড শীত, লয়?'

অন্যমনস্কের মতন বিষ্টুপদ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'আবার বিষ্টিও শুরু হল।'

'হ্যাঁ।'

বিষ্টুপদ নিশির কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু মনে-মনে অন্য কথা ভাবছিল। ভাগের ভাগ দুটো কচ্ছপ আর আড়াইখানা বেল বাড়িতে নিয়ে কার মুখে দেবে? সে বলল, 'আরো কিছু না হলে তো চলবে নি মেইয়েছেলে। আমার সোম্‌সারে আবার পাঁচটা মুখ।'

নিশি বলল, 'ঠিক কথা। কিন্তু সন্‌ঝে নেমে এল; বিষ্টিও পড়তে নেগেছে। এখন আর কিছু কি পাওয়া যাবে?' তার চোখে-মুখে গলার স্বরে সন্দেহ।

'দেখি—' বলতে বলতেই বিষ্টুপদের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সামনে আঙুল বাড়িয়ে ঈষৎ উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী গো?'

নিশি সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'শোর (শূকর) মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'মড়াটা উখেনে কী করছে?'

ভালো করে লক্ষ্য করল বিষ্টুপদ। তারপর বলল, 'মাটি খুঁড়ছে।'

নিশি জানাল, শূয়োরটা যখন মাটি খুঁড়ছে তখন নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে। মাটির তলায় কিছু না পেলে অকারণে ওরা খোঁড়ে না।

বিষ্টুপদ বলল, 'চল না, এইগে দেখি।' তার মাথায় বিদ্যুৎ-চমকানির মতন অন্য একটা চিন্তা খেলতে শুরু করেছে। কিছুই যখন পাওয়া গেল না তখন শূয়োরটাকে হত্যা করবে বিষ্টুপদ। জানোয়ারটার ওজন কম করে মণখানেক। নিশিবালাকে অর্ধেক ভাগ দিয়ে যা মাংস পাওয়া যাবে, তিন-চার দিন তারা পাঁচটা প্রাণী ফেলে-ছড়িয়ে খেলেও শেষ করতে পারবে না। তিন-চারটে দিন বেঁচে থাকতে পারলে, তার পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে।

মনের কথাটা নিশিকে জানাতে সে ভীত সুরে বলল, 'কথাটা ভালো। কিন্তন—'

'কী?'

'অত বড় ধুমসো জাওন্নারের (জানোয়ারের) সঙ্গে পারবে নি ব্যাটাছেলে। তার ওপর ঢ্যামনাটা যদি দাঁতাল হয়। রক্ষে রাখবে না।'

বিষ্টুপদ বলল, 'আমার টাঙি আছে, দা আছে।'

নিশি বলল, 'টাঙি দা দিয়ে ঐ যমটাকে ঘায়েল করতে লারবে।'

মরিয়ার মতন বিষ্টুপদ বলল, 'লারি লারব। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি। না খেইয়ে মরার চাইতে শোরের সঙ্গে একটা লড়াই দি না—' নিশিকে আর কিছু ভাববার বা বলবার সময় না দিয়ে বিষ্টুপদ এগিয়ে গেল। নিশি আর কী করে, তার পিছু নিল।

কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল ওটা দাঁতাল না তবে বুনো শূয়োর। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জন্তুটা অনেকখানি জায়গা গর্ত করে ফেলেছে। গর্তের ভেতর তাকাতেই চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল বিষ্টুপদর। একটা প্রকাণ্ড খামআলুর অর্ধেক মতন মাটির তলায় পোঁতা, বাকি অর্ধেক ওপরে মাথা তুলে আছে বোঝা গেল, শূয়োরটাই মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে খাম আলুটাকে বার করেছে।

বিষ্টুপদ আন্দাজ করল, আলুটার ওজন কম করে দশ সেরের মতন হবে। শূয়োরটাকে মারতে না পারলেও শুধু আলুটাও যদি পাওয়া যায়, তা-ও কম না। মনে-মনে হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলল, শূয়োরের সঙ্গে রক্তারক্তিতে কাজ নেই। ওটাকে তাড়িয়ে আলুটাকেই বরং নেওয়া যাক।

পেছন থেকে লোভী গলায় নিশি বলে উঠল, 'কত বড় খামআলু, দেখেছ ব্যাটাছেলে—'

'বিষ্টুপদ বলল, হ্যাঁ।'

আপন মনে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছিল শূয়োরটা। মানুষের গলার আওয়াজে চমকে মুখ তুলল। শূয়োরটার ছোট-ছোট চোখ ঘোলাটে লাল। সারা গায়ে আর মুখে মাটি মাখা।

বিষ্টুপদ ওটাকে তাড়াবার জন্য মুখের ভেতর শব্দ করে উঠল, 'উর-রা-রা, ইট-ইট-হোই—'

শূয়োরটা নড়ল না, একদৃষ্টে বিষ্টুপদের দিকে তকিয়ে থাকল। তার ছোট-ছোট চোখে সন্দেহ ঘন হতে লাগল।

বিষ্টুপদ আবার শব্দ করল। তার সঙ্গে-সঙ্গে নিশিও। কিন্তু শূয়োরটা অনড়।

বিষ্টুপদ বলল, 'শালা খচ্চর আছে। নড়বে বলে মনে হয় না।'

নিশি বলল, 'আমরা খামআলুটা নোব, বুঝিন টের পেয়েছে।'

'তা হবে।' বিষ্টুপদ বলতে লাগল, 'হল্লা করে কিছু হবে নি মেইয়েছেলে। শালার ব্যাটার টাঙির কোপ খাবার তরে গা গুলোচ্ছে।' বলেই এগিয়ে কাঁধ থেকে টাঙিটা নামিয়ে শূয়োরটার ঘাড়ের কাছে কোপ ঝাড়ল।

কোপটা ঠিকমতো লাগে নি। শূয়োরটার ঘাড় থেকে একটুখানি ছাল ছিঁড়ে গেল

মাত্র। হিংস্র কুটিল চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জন্তুটা হঠাৎ তেড়ে এল।

আচমকা এরকম তাড়া করবে, বিষ্টুপদরা ভাবতে পারে নি। তারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল।

অনেকদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শূয়োরটা আবার খামআলুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিষ্টুপদরা কিন্তু দমল না, একটুপর তারাও শূয়োরটার কাছে ফিরে এল। এসেই আবার কোপ লাগাল বিষ্টুপদ। এবার পিঠের কাছে অনেকটা কেটে গেল। রক্তাক্ত জানোয়ারটা আবার বিষ্টুপদদের তাড়া করল।

তাড়া খেয়ে বিষ্টুপদরা দূরে চলে যায়। তারপর ফিরে এসে সুবিধা মতন শূয়োরটাকে একটা করে ঘা দেয়। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল।

এদিকে শীতের সন্ধ্যে আরো নিবিড় হয়েছে। গাছ-গাছালির ফাঁকে ছায়া ঘন হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। খানিক আগে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল; এখন বেশ জোরেই নেমেছে। তার সঙ্গে উত্তরে হাওয়া তো আছেই।

নিশি হতাশই হয়ে পড়েছে। সে বলল, 'ছাড়ান দাও ব্যাটাছেলে। ওই যমের মুখ থেকে তুমি খামআলু লিতে পারবে।'

বিষ্টুপদর জেদ চেপে গিয়েছিল। সে বলল, 'কক্ষুণো না; খামআলু না নিয়ে আমি নড়ছি না। সুবিদে হলে আলুটাও লোব, শোরের ছানাকেও শেষ করব। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে। এবারে দুজনে উটার সামনে দেঁড়াব নি; আমি সামনে দেঁড়াব, তুমি উটার পেছনে। আমায় যঁদিন তাড়া লাগায় তুমি পেছু থেকে কোপ ঝাড়বে। তোমায় তাড়া লাগালে আমি কোপ ঝাড়ব।'

পরিকল্পনা অনুযায়ী বিষ্টুপদ আর নিশি শূয়োরটার সামনে—পেছনে দাঁড়াল। শূয়োরটা কী বুঝল, কে জানে। হয়তো আন্দাজ করল।' আর এত কষ্টের খামআলুটার দাবীদার জুটেছে।

আঘাত হানবার আগেই শূয়োরটা হঠাৎ ঘাড় গুঁজে বিষ্টুপদর দিকে ছুটে এল। জন্তুটা এত দ্রুত চলে এসেছে যে, আত্মরক্ষার সময় পাওয়া গেল না। সকাল থেকে পেটে একটা দানাও পড়ে নি বিষ্টুপদর। শরীরটা এমনিতেই দুর্বল হয়ে আছে। মণখানেক ওজনের শূয়োরটার ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ে গেল তারপরেই অনুভব করল উরুর ভেতর ধারাল দাঁত ঢুকে যাচ্ছে।

বিষ্টুপদ চিৎকার করে উঠল, 'মেরে ফ্যালল, মেরে ফ্যালল। মেরে ফ্যালল। বাঁচাও—' বলতে বলতেই তার হাত কোমরের কাছে চলে গেল। ধারাল দাটা একটানে খুলে নিয়ে জন্তুটার নাকের কাছে সমস্ত শক্তিতে ঘা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

ওদিকে পেছন থেকে ছুটে এসে নিশি শূয়োরটাকে কোপাতে শুরু করেছে। ক্ষতবিক্ষত জানোয়ার বিষ্টুপদকে ছেড়ে পেছনে ফিরে নিশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

টাল সামলাতে না পেরে সেও ছিটকে পড়ল; শূয়োরের দাঁতে তার শাড়ি তার দেহ ফালা-ফালা হয়ে যেতে লাগল সেই অবস্থাতেই অন্ধের মতন হাতের কাটারিটা চালিয়ে যাচ্ছে।

উরু বেশ জখম হয়েছিল বিষ্টুপদর; চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। কিন্তু তা নিয়ে বসে থাকলো না সে। উন্মাদের মতো ছুটে শূয়োরটার মাথায় এক টাঙ্গির কোপ ঝাড়তে লাগল। নিশিকে ছেড়ে শূয়োরটা আবার বিষ্টুপদকে তেড়ে এল। মাটি থেকে উঠে নিশির পিছন দিক থেকে আক্রমণ করল।

শূয়োরটা আঘাত খেয়ে একবার যায় বিষ্টুপদর দিকে, তার পরেই ছোটে নিশির দিকে। দেখতে শীতের ঝাপ্সা বেলা শেষে এই নির্জন প্রান্তর পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে উঠল। খাদ্যের জন্য দুই মানব-মানবী আর এক হিংস্র জন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর মুখের কাছে টাঙ্গির প্রচণ্ড ঘা খেয়ে শূয়োরটা প্রাণ-ফাটানো চিৎকার করে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে তীরের মতন পশ্চিমদিকের জঙ্গলের ভেতর ছুটতে-ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শূয়োরটা পালিয়ে যাবার পর বিষ্টুপদ আর নিশি অনেকক্ষণ নির্জীবের মতন পড়ে থাকল। তারপর ধুঁকতে-ধুঁকতে উঠে খামআলুর বাকিটা খুঁড়ে বার করে ফেলল।

খামআলু, কচ্ছপ আর বেল এক জায়গায় জড়ো করে ওরা ভাগাভাগি করতে যাবে, সেই সময় বৃষ্টিটা ঝেঁপে এল। যতক্ষণ লড়াই চলছিল, বুঝতে পারা যায় নি। উত্তেজনা আর আদিম হিংস্রতা ছাড়া শরীর বা মনে তখন অন্য বোধ ছিল না। এখন বিষ্টুপদ টের পেতে লাগল, ভীষণ শীত করছে। হাড়ের ভেতর থেকে দুরন্ত কাঁপুনি উঠে আসছে। দাঁতে খিল লেগে যাচ্ছে যেন।

বিষ্টুপদ বলল, 'কী নচ্ছার বিষ্টি এল গো—'

নিশি কাঁপতে-কাঁপতে বলল, 'এখানে দেঁড়িয়ে থাকলে নিঘ্ঘাৎ মরে যাব ব্যাটাছেলে। এট্টা কিছু ব্যাওস্থা কর।'

'কুথায় যাওয়া যায় বল দিকিনি—'

কি ভেবে নিশি বলল, 'পশ্চিম দিকে একটা শ্মশানঘাট রয়েছে না? সেখানে তো এট্টা ঘর আছে। চল, সেখেনে যাই।

বিষ্টুপদর মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চল—'

দুজনে দৌড়তে-দৌড়তে শ্মশানের চালা ঘরে চলে এল। ঘরটা শবযাত্রীদের বসবাসের জন্য এক-সময় তোলা হয়েছিল।

গায়ের রক্ত মুছে নিশি আর বিষ্টুপদ বসে বসে কিছুক্ষণ হাঁপাল। তারপর বিষ্টুপদই বলল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে মেইয়েছেলে।'

নিশি বলল, 'আমারও।'

'খাওয়ার যোগাড় করি এস।'

খামআলুর খানিকটা কেটে ফেলল নিশি, বিষ্টুপদ একটা কচ্ছপের খোসা ছাড়িয়ে মাংস বার করল।

কিছুক্ষণ আগে কারা একটা মড়া পুড়িয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে আগুন এনে মাংস আর আলু ঝলসে নিল দুজনে তারপর খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলল।

বিষ্টুপদ বলল, 'সারাদিন পর এই পেটে পড়ল।'

নিশি বলল, 'আমারও।'

'খাওয়া হল; এখন যদি এট্টা বিড়ি পাওয়া যেত।'

'হ্যাঁ আমারও পানের বড্ড সখ। যদিন পেতাম গো।'

এদিকে বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। আকাশ ফালা-ফালা করে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

নিশি বলল, 'এ বিষ্টি আজ ছাড়বে নি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ—' বিষ্টুপদ মাথা নাড়ল।

'আজ রাত্তিরটা এখানেই কাটাতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

আরো কিছুক্ষণ পর বিষ্টুপদ বলল, 'বসে থেকে আর কী হবে? আমি শুয়ে পড়লাম।'

নিশি বলল, 'আমিও শোব।'

দুজনে ঘরের দুদিকে শুয়ে পড়ল। মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব।

রাত আরো গাঢ় হলে নিশি হঠাৎ, 'ব্যাটাছেলে—'

ঘরের দূরপ্রান্ত থেকে বিষ্টুপদ সাড়া দিল, 'কী কইছ?'

'আমার কাছে এস।'

'কেন?'

'বড্ড শীত; আমায় একটু জড়িয়ে ধর দিকিন।'

এই দুর্যোগ-ভরা শীতের রাতে পরস্পরের দেহ উতপ্ত রাখবার জন্য নিশি আর বিষ্টুপদ জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকল।

পরের দিন সকালবেলা, কচ্ছপ আর যুদ্ধ-করে-জেতা খামআলুটা ভাগাভাগি করে নিশি গেল উত্তরে, বিষ্টুপদ দক্ষিণে।

শারদীয় অমৃত, ১৯৭০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫—)
জন্ম ময়মনসিংহে (বাংলাদেশ)। 'জলতরঙ্গ' গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পান ছোটগল্পকার রূপে। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বাস্তব আর মগ্নচেতনার টানা-পোড়েন লক্ষ্য করার মতো। শীর্ষেন্দুর গল্পে অস্থিরতা নেই, আছে স্থির বিশ্বাস, আস্তিকতাবোধ, মগ্নচেতনায় আস্থা। আত্মজৈবনিক ঢঙে রচিত গল্পে তিনি অন্তর্লোকের গভীরে সত্যের অন্বেষণ করেন।

আমাকে দেখুন

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানীতে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম, তারপর জমাট ভীড়ের ভিতরে আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে এতদূর চলে এসেছি! বাসের রডগুলো বড় উঁচুতে—আমি বেঁটে মানুষ—অতদূর নাগাল পাই না। আমি সীটের পিছন দিক ধরে দাঁড়াই, তারপর গা ছেড়ে দিই। বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশেপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশেপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ আমার ওজন এত কম যে, কারো গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সীট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দুধারে পাহাড়ের মতো উঁচু-উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ্য করছে না কেউ। এটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দেখে, কিন্তু লক্ষ্য করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনো ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই, আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়ে নি—টেঁকো মানুষকেও কেউ কেউ দেখে। তার ওপর আমার মুখখানা—সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর—আমার নাক থ্যাবড়া নয় ছোটও নয়, চোখ বড়ও নয়। আবার কুৎকুতেও নয়। কাজেই এই যে এসে ভীড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না, কিংবা, দেখলেও লক্ষ্য করছেন না—আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই-একদিন পর আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর

কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাবো সেই কারণেই কিছু নমস্কারী কাপড়-চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিউ মার্কেটে যাবে?' আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনো অর্থ হয় না, বরাবর আমরা বাসার কাছে কাটারায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফঃস্বলের মেয়ে নিউ মার্কেট দেখে নি। আর দুই নম্বর কারণ হল আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশী হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা তখন তাদের ভুরু একটু ঊর্ধ্বগায় হবে। কিন্তু ঐ নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকানপসার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। সে কোনো দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে চোখ রেখে এক—পা এক—পা করে হাঁটে। আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরির চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সব কিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ্য না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে একসময়ে আমি একদম থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পসারের দিকে তার বিহ্বল চোখ আর গার্ড অফ অনার দেওয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গী। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভীড় ঠেলে একা হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে কথাও বলছিল বটে আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আছি কিনা সে লক্ষ্য করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিত ভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করার একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলকধাঁধার মতো গলিগুলো আছে তারমধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি চট করে তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফঃস্বলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ্য করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আর উঁকি মেরে দেখলাম, আমার বউটা কান্নামুখে চারদিকে চাইতে চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনো বারই চিনতে পারল না। উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমাকেই পেরিয়ে

গেল। তখন আমি ভাবলাম মফঃস্বলের এই মেয়েটা খুব ঘড়েল, আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে পেরে এখন ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না, কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম—এই যে! ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখেটেখে তারপর ভীষণ জোরে শ্বাস ফেলে কেঁপে কেঁপে হেসে বলল—তুমি! তুমি! কোথায় ছিলে তুমি! আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি! আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হল ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময়ে ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে এ লুকোচুরি খেলার সময়ে আমি বারবার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি ওর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না, কিন্তু আমি বারবার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল—সত্যি! তাহলে তুমি আর কখনো লুকিও না। এরকম করাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কণ্ডাক্টার এখানেই আমি নেমে যাবো...দেখি দাদা...দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে...ঐ দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কণ্ডাক্টার বাস ছাড়ার ঘণ্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসো মতো লোকটা অনড় হয়ে রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশমাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ্য করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায়-ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালোই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। বর্ষাকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালোই লাগছে। ঐ তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দেখ আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিশ, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাও নি, আর একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি হাতখানা ভেঙে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতালায় উঠছি এই লিফটটা বোধহয় একশো বছরের পুরোন। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল্—ঠিক একখানা খোলামালা খাঁচার মতো, মাঝে মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট বেয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছদিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটোটিই দেখেছিলে—যখন আমার বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ, যখন আমার ভালো করে বুড়োটে ছাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী! সত্যিই জিজ্ঞেস করি তাহলে এক্ষুণি রামস্বরূপ হাঁ হাঁ করে হেসে উঠে বলবে—আরে জরুর,

আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনোকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না! আমি চিরকাল—সেই ছেলেবেলা থেকেই অরিন্দম বসু।

আমার চাকরি ব্যাঙ্কে। দোতালায় আমার অফিস। আগে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, গত দশ বছর ধরে আমি বসছি ক্যাশ-এ। আমি খুব চটপট টাকা গুনতে পারি, হিসাবেও আমি খুব পাকা। তাই ক্যাশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। হলেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দশ বছর ধরে আমি দক্ষতার সঙ্গে ক্যাশের কাজ করছি। কখনো পেমেন্টে, কখনো রিসিভিঙে। পেমেন্টেই বেশি, কারণ ওখানেই সবচেয়ে সতর্ক লোকের দরকার হয়। একটা তারের খাঁচার মধ্যে আমি বসি, আমার বুকের কাছে থাকে অনেক খোপওলা একটা ড্রয়ার। তার কোনটায় কত টাকার নোট, আর কোনটায় কোন্ খুচরো পয়সা রয়েছে, তা আমি নির্ভুলভাবে চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পেমেন্টের সময়ে আমি ড্রয়ার খুলে গুনে টাকা বের করি, তারপর ড্রয়ার বন্ধ করি, তারপর আবার গুনি, আবার...টাকা দিয়ে পরের পেমেন্টের জন্য হাত বাড়াই, টোকেন নিয়ে আবার ড্রয়ার খুলি, টাকা বের করে গুনে...তারপর একইভাবে চলতে থাকে। সামনে ঘুলঘুলিটা দিয়ে যারা আমাকে দেখে তাদের সম্ভবত খুবই ক্লান্তিকর লাগে আমার ব্যবহার—ইস্ লোকটা কী একঘেয়েভাবে কাজ করছে—কী একঘেয়ে! ঘুলঘুলি দিয়ে তারা আমাকে দেখে, কিন্তু মনে রাখে না। রামবাবু আমাদের পুরোনো বড় খদ্দের—প্রকাণ্ড কারখানা আছে, এজেন্টও তাঁকে খাতির করে। খুব খুঁতখুঁতে লোক, বেশির ভাগ সময়েই লোক না পাঠিয়ে নিজেই এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে যান। আমি কতবার তাঁকে পেমেন্ট দিয়েছি, তিনি ঘুলঘুলি দিয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়েছেন। একবার আমার বড় শালা কলকাতায় বেড়াতে এসে অনেক টাকা উড়িয়েছিল। সেবার সে আমাকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রীটের বড় একটা রেস্তরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি রামবাবু। একা বসে আছেন, হাতে সাদা স্বচ্ছ জিন, খুব স্বপ্নালু চোখ। সত্যি বলতে কী আমি ভাগ্যোন্নতির কথা বড় একটা ভাবি না। অন্তত সে কারণে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার মনেই হয় নি। আমি পুরোনো চেনা লোক দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রামবাবু ভ্রূ তুলে বললেন—কোথায় দেখেছি বলুন তো! মনেই পড়ছে না। তখন আমার শালার সামনে ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। লোকটা যদি সত্যিই চিনতে না পারে, যদি সত্যিই তেমন অহংকারী হয়ে থাকে লোকটা—তবে আমার বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে আমার ব্যাঙ্কের নাম বললাম, বললাম যে আমি ক্যাশ-এ...সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জিনএর মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর মুখ, প্রসন্ন হেসে বললেন—চিনেছি। কী জানেন, ঐ ঘুলঘুলি আর ঐ খাঁচা ওর মধ্যে দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই হঠাৎ এ জায়গায়—বুঝলেন না! আসল কথা হল এ পারশপেকটিভ—ওটা ছাড়া মানুষের আর আছেটা কী যে, তাকে চেনা যাবে? ঐ খাঁচার মধ্যে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেমন

আপনি, তেমনি দেখুন এই কোট-প্যান্টটাই আর টাক মাথা—এর মধ্যে দিয়ে আমি। এসব থেকে যদি আলাদা করে নেন, তবে দেখবেন আপনি আর আমি—আমাদের কোনো সত্যিকারের পরিচয়ই নেই। এই দেখুন না, একটু আগেই আমি পারসপেকটিভের কথাই ভাবছিলাম। ছেলেবেলা আমরা থাকতাম রেলকলোনীতে। আমার বাবার ছিল টালিক্লার্কের চাকরি। কাটিহারে আমাদের রেল কোয়ার্টারে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে আসত, তার সৎ মা বলে বাসায় আদর ছিল না, আমাদের বাসায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে আমার মায়ের পাশটিতে সে এসে মাঝে মাঝে বসত। জড়োসড়ো হয়ে ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে পরোটা বেলে দিত, কখনো আমার কাঁদুনে ছোট বোনটাকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াতো। মা আমাকে বলত—ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। সেই শুনে সেই মেয়েটাকে আমি ভালো করে দেখতাম—আর কী যে নেশা লেগে যেত। কী করুণ কৃশ খড়িওঠা মুখখানা—আর কী তিরতিরে সুন্দর। যেন পৃথিবীতে বেশিদিন থাকবে বলেও আসে নি। রামবাবু এটুকু বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আর আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তারপর কী হল, সে কী মরে গেল? রামবাবু মাথা নাড়লেন—না, না, মরবে কেন। তাকে আমি বিয়ে করেছি বড় হয়ে। সে এখনো আমার বউ। ইয়া পেল্লায় মোটা হয়ে গেছে। বদ-মেজাজী, আমাকে খুব শাসনে রাখে। কিন্তু যখন দেখি ফ্রিজ খুলছে, গয়না হাঁটকাচ্ছে, চাকরদের বকছে কিংবা সোফারকে বলছে গাড়ি বের করতে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ সেই বেলা—যার অসুখের সময় মা দুটো কমলালেবু দিয়ে এসেছিল বলে এক গাল হেসেছিল। আজ দেখুন, খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি ওর সঙ্গে। মনটা খিঁচড়ে ছিল—সেই ভালোবাসা কোথায় উবে গেছে এখন। কিন্তু এখানে নির্জনে বসে সেই পুরোনো দিন, উনুনের ধারে বসে থাকা, ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে ওর বসার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আমার মায়ের মুখ...সে মুখ বড় মায়ামমতায় ওর বসার দীন ভঙ্গিটুকু চেয়ে দেখছে। অমনি আবার এখন ভালোবাসায় আমার মন ভরে উঠেছে। বাসায় ফিরে গিয়েই এখন ওর রাগ ভাঙাবো। বুঝলেন না...বলে রামবাবু সেই সাদা স্বচ্ছ জিন্ মুখে নিয়ে হাসলেন, বললেন—ঐ যে ঘুলঘুলিটা—যেটার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখি সেটাই আসল—ঐ ঘুলঘুলিটা...

এই যে তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের ছেলেটা এখন পেমেণ্টের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পিতলের টোকেনটা ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকছে কাউণ্টারের কাঠে, ও আমাকে চেনে। ওর বাবার আছে পুরোনো গাড়ি কেনা-বেচা ব্যবসা। আগে ওর বাবা আসত, আজকাল ও আসছে ব্যাঙ্কে। মাঝে মধ্যে চোখ পড়লে আমি হেসে জিজ্ঞেস করি—কী, বাবা ভালো তো! ও খুশি হয়ে ঘাড় কাৎ করে বলে—হ্যাঁ—। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, একদিন যদি হঠাৎ করে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং মোটামুটি সাধারণ চেহারার কোনো লোককে বসিয়ে দেওয়া হয় এ জায়গায়,

তবে ও বুঝতেই পারবে না তফাৎটা। তখনো ও অন্যমনস্কভাবে পিতলের টোকেনটা ঠুকবে কাঠের কাউণ্টারে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকবে, চোখে চোখ পড়লে সেই নতুন লোকটার দিকে চেয়ে পরিচিতের মতো একটু হাসবে। ভুলটা ধরা পড়তে একটু সময় লাগবে ওর। কারণ, ও তো সত্যিই কখনো আমাকে দেখে না। ও হয়তো ওর নতুন প্রেমিকাটির কথা ভাবছে এখন, ভাবছে শীগগীরই ও একটা স্কুটার কিনবে। ও ঘাড় ফিরিয়ে রিসেপসনের মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকাল, তারপর ঘড়ি দেখল। একবার টোকেনটার নম্বর দেখে নিল, ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দেখল আমার দুখানা হাত ক্লান্তিকরভাবে মোটা একগোছা টাকা গুনছে। ও আমার মুখটা একপলক দেখেই চোখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি জানি ও আমাকে দেখল না। আর পনেরো মিনিট পরেই দুটো বাজবে। তখন আমি ক্যাশ বন্ধ করে নিচে যাবো টিফিন করতে। তখন যদি ও আমাকে রাস্তায় দেখতে পায়, আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থিন এরারুট আর ভাঁড়ের চা খাচ্ছি, তখন কি আমাকে চিনবে ও।

কলা কত করে হে? চল্লিশ পয়সা জোড়া—বলো কী? হ্যাঁ হ্যাঁ, মর্তমান যে তা আমি জানি, মর্তমান কি আমি চিনি না? ঐ সুন্দর হলুদ রঙ, মসৃণ গা প্রকাণ্ড চেহারা—মর্তমান দেখলেই চেনা যায়। তা আজ অবশ্য আমার কলা খাওয়ার তারিখ নয়। গতকালই তো খেয়েছি। আমি দুদিন পর-পর কলা খাই। দাও একটা। না, না ঐ একটাই—এই যে কুড়ি পয়সা ভাই। আহা বেশ কলা। চমৎকার, খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ খোসাটা হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। দশ-পনেরো মিনিট একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। কলার খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনো যুদ্ধবিগ্রহ করে নি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয় নি এদের, এমন কি খুব কঠিন কোনো কাজও এরা সমাধা করে নি সবাই মিলে। জাতটা মরে আসছে আস্তে আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে, চলছে—একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই—ঊনিশশো ঊনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু'হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রীক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষ'ও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে আমাকে দেখুন। এই যে আমি—অরিন্দম বসু—অরিন্দম বসু—এই যে না-লম্বা, না-রোগা, না-ফর্সা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রীক রো নই, ভারতবর্ষও নই—ঐ শব্দগুলোর সঙ্গে অরিন্দম বসু—এই শব্দটার একটু তফাৎ আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনো ধরতে পারবেন?

যাক্ গে সে সব কথা। মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাঙ্কের ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেয়,

কেউ কেউ মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিয়ে যায়। কিন্তু লোক বদল হলেও তারা অবিকল ঐভাবে হাত বাড়িয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনার কথাই ধরুন না—আমার বউ হেঁটে হেঁটে আমাকে খুঁজছে—আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভাবছে—কি আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়।

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথে মাঝখানে রেখে দিলাম! উদাসীন মশাইরা, যদি এর ওপর কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সম্বিত ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন—কোথায় কোন্ রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে—দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে—হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভালো'—তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন—এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে ঊনিশশো ঊনসত্তর সালের ষোলোই জুলাই—আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন—এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হল। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোসা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করি নি।

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন! আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা! ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোখা মানুষ ওতে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে এক সময়ে। ওদের খুব ভালো যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যে সব মানুষগুলো হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যত দূর সম্ভব অন্যের মুখ—যেন যে কোনো জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি—আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাবো বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ঐদিকে—না?

দেখুন কী আহাম্মক ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনো গোল হয় নি। ঐ ছেলেটা—হায়, ঈশ্বর কে ওকে

ঐ লাল সোনালী জার্সি পরিয়েছে! ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিন তো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে। আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে। তার ওপর এই দেখুন ফালতু টিমটা। আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট—কী সাংঘাতিক! ওদিকে আর আট কি, ন' মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কি করে হবে! ক্ষুদে টিমটার সব খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেয়াল তৈরি করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে? ঐ যে ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল—আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি—এই আমাকে দেখ, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপোর্ট করে আসছি। জিতলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু তুমি কি বোঝো সে সব? তুমি তো জানোই না যে, আমি—এই ভীড়ের মধ্যে বিশেষ একজন—কী রকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখেছি। অবশ্য তাতে কার কী যায় আসে! আমি কাঁদি কিংবা হাসি—কিংবা যাই করি—কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হল না। রেফারি লম্বাটানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কী রকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালোবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি—লাফিয়েছি কেঁদেছি—চাপড়ে দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোখা। তাতে কারো কিছু এসে যায় না। এই যে আমি সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত—ভালো করে ভাত খেতে পারি নি উত্তেজনায়—এতেই বা কার কী এসে যায়।

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লীগ-টেবিলে আপনার টিমের অবস্থান ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে! সাড়ে ঊনত্রিশ ফুট লংজাম্প দিচ্ছে মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোটে হেরে যাচ্ছে আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড় দেরি করছে। তাই, আমি—অরিন্দম বসু, ব্যাঙ্কের ক্যাশ ক্লার্ক—আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ঐ যে দোতালার বারান্দায় রেলিঙের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোটো ছেলেটা—হাপু। বড় দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে—রথের মেলায় যাবো বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ঐ যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য।

ঝাঁকড়া চুলের নিচে জ্বলজ্বল করছে দুখানা চোখ, আমি এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুরদারকরে নেমে এলো—ওর মা ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে—হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু—উউ। এক গাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়—কত দেরী করলে বাবা, যাবে না? হ্যাঁ মশাই, বাইরে থেকে ফিরে এলে—এই আপনজনদের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর নরম গা। মুখ ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান নিচ্ছি যেন। বললাম—যাবো বাবা, বড় খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল—শীগগীর করো। ওর মা ধমক দিতেই বড় মায়ায় বললাম—আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ! আসলে ওর ঐ নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড় ভালো লাগে আমার।

বড় দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম—ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিক মতো মেলা দেখতে পাবে। ও কেবল এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে—ওটা কি বাবা! আর ঔখানে! আমি ওকে দেখিয়ে দিই—ওটা নাগরদোলা। ঐটা সার্কাসের তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ।

আস্ত একটা পাঁপড়ভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ঐ যে দেখা যাচ্ছে তাকে—আকাশের কাছাকাছি উঠে হি-হি করে হেসে হাত নাড়ছে—সাঁই করে নেমে আসছে আবার—আবার উঠে যাচ্ছে—সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখালাম ভীষণ শব্দে ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘণ্টার সার্কাস দেখলাম দু'জন। দুই মাথাওলা মানুষ, সিংগিং ডল, আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা ঘেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ঐ তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে! দোকানে সাজান একগাদা হুইশল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ও, এয়ার গান আর রঙচঙ বল দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে...ক্রমে ভীড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু...আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম—খামোখা একটা পয়েণ্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ—ওরা কি পৌঁছুতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হল, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভীড়ের মধ্যে এক সেকেণ্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুণি টুপ করে আড়াল হয়ে গেল। হাপু-উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম...

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড় দুরন্ত ছেলে। দেখেন নি? ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, জুলজুলে দুটো দুষ্টু চোখ...না, না ঐ পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়—যদিও অনেকটা একই রকম দেখতে। না, তার চেহারার কোনো বিশেষ কিছু চিহ্ন আমার মনে পড়ছে না—খুবই সাধারণ চেহারা অনেকটা আমার মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়েসরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত—এই হাজার ছেলে—মেয়ের মধ্যে ঠিক কোন্ জন—ঠিক কোন্ জন আমার হাপু—আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এত জনের মধ্যে কোন্ জন—ঠিক কোন্ জন—বুঝলেন না, ওর মাও একবার ঠিক করতে পারে নি—। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে, এই আমি—এই আমিই ওর বাবা—। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে—কাইণ্ডলি, ভুলে যাবেন না—

দেবেশ রায় (১৯৩৬—)

জন্ম : বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারায়। ষাটের দশকে বাংলা ছোট গল্প আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। বিখ্যাত উপন্যাস 'মফস্বলী বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। উপস্থাপনা ও ভাষার ব্যবহারে সবিশেষ মনোযোগী। ১৯৬৯-এ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দেবেশ রায়ের গল্প' প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'যযাতি', প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে।

পশ্চাৎভূমি

বাতাস ছিল এলোমেলো—সারাটা দিন। সারাটা দিন চৈত্র মাসের মতো বাতাস ছিল এলোমেলো—সারাটা দিন। ক্লাস শেষ করে কমনরুমে যাবার সময় বিনয়ের চোখ পড়েছে তাদের ইস্কুলের উত্তরের বাড়িটার ওপরে। কমনরুম থেকে ক্লাসে যাবার সময় বিনয়ের চোখে পড়েছে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের মাথা—কবরখানাটা এখান থেকে দেখা যায় না, যার পুব-দক্ষিণ কোণায় ঐ গাছটা।

সেই বাতাসে শরীরের জলীয় অংশ অতিরিক্ত পরিমাণে উবে যাওয়ার সমগ্র চামড়াটা শুষ্ক, খরখরে। মুখে হাত বোলালে জ্বর গন্ধ। কিংবা কাপড়-চোপড় যদি পরিষ্কার হত, ধোপদুরস্ত, আজকের ভাঙা, দাড়িটা আজকের কামানো—তবে এতটা শুষ্ক খরখরে লাগত না।

ইস্কুলের উত্তরের বাড়িটার মাথায় আকাশ ছাড়া কোনোদিন কিছু ছিল না। ইউক্যালিপটাস গাছের চেয়ে উঁচু কিছু ছিল না। সেই আকাশ আর ইউক্যালিপটাস সম্পূর্ণ না-থেকে শূন্যতাকে প্রতিভাত করল, গুরুদশাগ্রস্তের উপস্থিতির পেছনে শূন্যতার মতো। কিছু যেন ওখানে ছিল, এখন নেই—সমাপ্ত যাত্রার আসরের মতো। এই শূন্যতাকে বিনয় নিজের সঙ্গে এত মিলিয়ে ফেলেছিল যে, এই বে-মাস বসন্তের হাওয়ায় তার যেমন চঞ্চল আনন্দিত ও হৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল তা হতে না-পেরে, দেহে ও মনে একদা-বর্তমান, সম্প্রতি অতীত কোনো অনুভূতির জের টানছিল। মাঠে অশোক ছেলেদের নিয়ে ক্রিকেট পিটছে। অশোকের পরনের প্যাণ্ট আর উইকেটের পেছনে তার প্রস্তুত-ভঙ্গিই বিশেষ করে বিনয়ের মনোহরণ করেছিল। বিনয় কালো বোর্ডে সাদা চক দিয়ে নিজের হাতে আঁকা গাছের ডালে উড়তে-উদ্যত একটি পাখির দিকে তাকিয়ে ছিল, তারপর, দরজায় এলোমেলো বাতাসটার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। দাড়িটা যদি আজকের সকালের কামানো হত, বা জামা কাপড়টা যদি আজকের ধোপভাঙা, তবে, বসন্তের এ-বাতাসকে সে আমন্ত্রণ হিসেবে গ্রহণ করত। জলীয় পদার্থ শুকিয়ে যাওয়া মুখে ফাটা গালে বাতাস লাগিয়ে চোখ কুঁচকে বিনয় যেন নিজেকে অপচয় করছিল। বসন্তের বাতাস দক্ষিণমলয়। এটা উত্তর বাঙলা, দক্ষিণ

দিকে সমুদ্র, সমুদ্রের তীরে কলকাতা। কলকাতা থেকে এ-বাতাস আসছে—এমন একটা সিদ্ধান্ত যেন বিনয়কে অপচয়িত হবার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। পরবর্তী ক্লাসে তাই সে বোর্ডে এঁকেছিল নিছক ডিশের ওপর কাপ।

সন্ধ্যাবেলায় বাতাস পড়ন্ত। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম চাঁদে বিলম্বিত। পড়ন্ত বাতাসে রাত্রির কঠোরতর শীত। পথের ধুলোবালি পরিষ্কার।

স্যাণ্ডেলটার এমন এক অবস্থা, চলতে গেলে পদশব্দের একটি বিশিষ্ট ধ্বনি জাগে, ল্যাংচানো, যা জনতার পদশব্দের অশ্রুত থাকে, অথচ সান্ধ্য-জনহীনতার সুযোগে এখন বিনয়ের কানে স্পষ্ট। ল্যাংচানো পদধ্বনি কানে আসছে, গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ভাঙা ঘুমে যেমন ঘড়ির শব্দ—অভ্যস্ত, ব্যাতিক্রমহীন, অর্থশূন্য। এত একঘেয়ে, নিশ্চিত ও বিরক্তিহীন যে বিনয়ের মনে হলো এ থামবে না, চলবেই। বিনয় হঠাৎ একবার থামল। পদশব্দ থামল। তবে, এ শব্দ আমারি পায়ের। আমারি পথ চলার। আমারই। এই সিদ্ধান্তে এসে বিনয় আবার চলতে লাগল। ল্যাংচানো বিরক্তিহীন, অভ্যস্ত, বদলাবে না, থামবে না। এখুনি স্যাণ্ডেলটা ঠিক করে নেব, এখুনি। চারপাশে এবং সামনে চাইল। উপায় নেই। কলকাতা হলে সবার পায়ের শব্দে আমার শব্দ ঢেকে যেত—এখানে আর কারো পায়ের শব্দ নেই। মুমূর্ষু রোগী যেমন বিকারের ঝোঁকে শরীর সঙ্কুচিত-প্রসারিত, হাত সঞ্চালিত ও চোখ বিস্ফারিত করে অত্যন্ত অপরিহার্য নিতান্ত আবশ্যক কিছু অনির্দেশ্য দাবি জানিয়ে পরমুহূর্তেই নেতিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, তেমনি করেই জুতো সারানোর দাবিটাতে চঞ্চল ও ব্যস্ত হয়ে বিনয় পরমুহূর্তেই নেতিয়ে পড়ল। ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। একই শব্দ, একই। অন্ধকার হোক আর আলোকিতই হোক, কৃষ্ণ-শুক্ল যে পক্ষই হোক, দাড়ি কামানো হোক চাই না—হোক—একই শব্দ। যদি জনতা থাকত—। নেই—। অতএব—। ছ্যাকরা গাড়ি চলুক, গরুর গাড়ি চলুক, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ কাঁদুক, ক্যাঁক্‌র কাঁদুক, মাননেওয়ালা নেই, খবরদার নেই, কোই নেহি নোকর, কোই নেহি মালিক, সব হ্যায় পাবলিক, ছ্যা—কর ছ্যাক। জ্বরাক্রান্ত রোগীর মতো কতকগুলি কর্কশ ধ্বনি উচ্চারণ করে বিনয় যেন নিজের অনুভূতিগুলোকে মুক্তি দিতে চাইল, আর পায়ের শব্দ থেকে তার মনে এল, এ-পায়ের শব্দ থামাবার কোনো প্রক্রিয়া তার জানা নেই, এ শহরটার জানা নেই, অতএব ছ্যা—কর ছ্যাক চলুক।

নিজের সারাদিনের অনুভূতিকে বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায়, পথচলার বেলায়, ঐ ভাষায় প্রকাশ করে বিনয়ের তলপেট থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত ভক-ভক হাসির একটা বমির মতো ভাব জট পাকাল।

হাসবার লোকাচার ভুলে বিনয় প্রাণপণে একটা মাতালের মতো হেসে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল, বোধহয়, হাসিতে দুর্গন্ধ শোঁকবার মতলবে। উদগারের প্রথম চেষ্টার সময় সে থামল না, কারণ তখন সে চিন্তা করছিল—অন্নপ্রাশনের পর থেকে

কম জিনিস তো আর পেটে জমেনি। পচে পচে, ঢোল। আঃ হাঃ কেয়াবাৎ, লাগাও পেঁয়াজ—আলুকাবাব, সাঁঝবেলা—। ভাবনাটা শেষ করতে করতে সে তিন-চারবার ঢেকুর তুলতে গিয়েছে, গলনালীতে একটা টান লেগেছে, ভাবনা শেষ করে দু-একবার চেষ্টার পর একটা ঢেকুর তুলল, মুখ হাঁ করতে ভুলে গেছে বলে গন্ধ শোঁকা হলো না, এবার মুখ হাঁ করে বার দুয়েক চেষ্টার পর—আহা কী হচ্ছে—বলে নিজেকে ধমকে সে আবার পথ চলা শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আওয়াজটা উঠল। ছ্যা—কর ছ্যাক, ছ্যা—কর ছ্যাক। শব্দটা না শোনার ভাব করে বিনয় ভাবল—চলছি, কিন্তু কোথায় তা তো ভাবছি না, ভেবেছি? না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময়তো ভাবি নি। সকালবেলায় চা খাওয়ার মতো কি সন্ধ্যাবেলাতে সুধীরদার বাড়িতে যেতেই হবে? কি হবে গিয়ে, হয়তো কাগজটা আর-একবার পড়ব। কিংবা বাইরের চৌকিটায় শুয়ে থাকব, কিংবা, ওই মেয়েটার নাম যেন কি? গোলাপ, টগর যূঁই কি? মেনি বেড়াল টেড়াল কি?

বিনয় ভাবনায় সুত্র হারিয়ে ফেলল। এবং সূত্র ছিঁড়ে যাবার পরই সে আর-একটা সুতো পেল। ছ্যা—কর ছ্যাক, ছ্যা—কর ছ্যাক, যে-পদশব্দ সম্বন্ধে সে অচেতন ছিল, কোন এক ফাঁকে তা তাকে আবার আক্রমণ করেছে। ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। যাব না, যাব না. সুধীরদার বাড়িতে যাব না। গলিটা সামনে এসে গেছে। তাই আরো-একবার বিনয় নিজেকে শোনাল—যাব না, যাব না, কিছুতেই যাব না। গলিটা এসে গেল। বাঁয়ে না-বেঁকে, যাব না যাব না বলতে বলতে আরো দু এক পা গিয়ে, বিনয় থেমে নিজেকে ধমকাল—কী হচ্ছে, যত সব, তাও তো সুধীরদার বাড়ি আছে, যাই, নইলে তো সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকতে হত।

বিনয় বাঁয়ে বেঁকল। ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। এ এক আচ্ছা জ্বালা তো। সব কথা গুলিয়ে দিচ্ছে। আজ গিয়ে বাবুইয়ের গানের খাতায় ছবি এঁকে দেবো। হ্যাঁ, মেয়েটার নাম বাবুই। বালিকার নাম বাবুই। ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। একই শব্দ। একই। অন্ধকার হোক আর আলোকিতই হোক। সুধীরবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি এসে বিনয় প্রথমে দুঃখিত বোধ করল।. কলকাতার জন্য সে খুব কাতর হলো। মা-বাবা ভাই-বোন ভর্তি এখানকার বাড়ি থেকে, বন্ধু বান্ধবেরা ভর্তি ওখানকার কফি হৌস থেকে. লোকভর্তি সেখানকার ট্রামে করে সে এইখানে নামল। গেট খুলবার জন্য একঘেয়ে পদশব্দটাকে কিছুক্ষণের জন্য থামাল। গেট খুলতে খুলতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে গেল। তারপর আবার ছ্যা—কর ছ্যাক, ছ্যা—কর ছ্যাক। একই শব্দ।

বিনয় যেন এমন এক নাবিক, কলকাতা বন্দরে জাহাজ নোঙরের পর সন্ধ্যা কাটাতে যাকে বাঙলা-আসাম থেকে মধ্যপ্রদেশ বিস্তৃত পশ্চাৎভূমিতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আর সেই একই শব্দ। অমাবস্যা হোক আর পূর্ণিমা হোক, শীত হোক আর গ্রীষ্ম হোক, দৃশ্য একই। স্থির দৃশ্য একই। স্থির দৃশ্য, নাকি চলচ্চিত্র। চিরকেলে আকাশ, চাঁদ, নক্ষত্র ও বৃক্ষের সঙ্গে আর যারা এ-দৃশ্য রচনা করে, তারাও নিষ্প্রাণ; অথচ এই স্থির পটে তাদের অভিনয় করার কথা ছিল। আর এই পাত্র-পাত্রীগুলো সব জীবনের অনুকরণ করতে শিখেছে। অনুকরণে শিল্প হয় না। যদি এরা শিল্প রচনা করত, তবে এই স্থির সনাতন দৃশ্যপটেই কতো ট্র্যাজেডি বা কমেডি ঘটত। তা নয়, সব প্রহসন হয়ে গেল—হায় রে।

একই। আলো হোক আর অন্ধকার হোক কৃষ্ণপক্ষ হলে মাঝরাতে দৃশ্য বদলাবে, বদলটা অবিশ্যি সন্ধ্যাবেলার তুলনায়। শুক্লপক্ষের প্রথম রাত আর কৃষ্ণপক্ষের শেষরাত প্রাগৈতিহাসিক। পূব-দক্ষিণ কোণার আমগাছটায় শীতকালে রোদ বিলম্বিত। রোদ খুঁজে নিয়ে বসা যায়, চাঁদ খুঁজে? রান্না ঘরটা লম্বায় খুব ছোট নয়, কিন্তু বেঁটে। বেঁটেও নয় খুব। মাথার টিনগুলো বদলানো হয় নি। বড় মেয়ের বিয়ের সময় সুধীরবাবু মেঝে বাঁধিয়েছিলেন। আর তখন যে-রেলিঙ দিয়েছিলেন, সেটা প্রায় চাল ছুঁই-ছুঁই। দম আটকানো গোছের। বারান্দার এক কোণ ঘিরে হবিষ্যি—সুধীরবাবুর মায়ের। রান্না ঘরটা পূব ভিটেয়, পশ্চিমমুখে। উত্তরের ভিটেয় দু-কুঠারি-অলা একটা আর দক্ষিনে লম্বা আরো-একটা ঘর।

সেই একই দৃশ্য, একই। আলো হোক আর অন্ধকার হোক। সকালের দৃশ্যগুলো বদলে যায়। শরৎকালে বোধহয় সকালের একটা ঈষৎ-স্থির রূপ আছে—তাছাড়া তো সে চলমান। চলন্ত ছুটন্ত সকাল নিয়ত বদলায়, বদলায়, বদলায়। দুপুরটা ডুবসাঁতার। বিকেল থাকতে নেই, নেই। শ... নারকেল তেলের গন্ধ, মুড়ির বাটির গায়ে, মিনুকে বিকেলে চুলও বাঁধতে হয়, চুল না বেঁধে পথেই বা মিনু যায় কি করে, অথচ পথে তো মিনুকে যেতেই হবে, মিনু যে পঞ্চদশী। দাদাকে, স্কুল থেকে ফেরার পর মিনুর দাদাকে, আমাকে, বিনয়কে, গুড়-মুড়ি খেতে না-দিয়ে সে যায়ই বা কি করে। তাই মিনুর হাতের নারকেল তেল গন্ধ বিলায় আমার মুড়ির বাটিতে। আহা, মিনুটার কী কষ্ট, মিনুটার কী জ্বালা। সন্ধ্যাবেলা, এখন এই সন্ধ্যায় আতুর ঘরের বাইরের নীরবতা। চরাচরে? নাকি বন্দরের পশ্চাৎভূমি চিরকালই এমন শ্মশানসদৃশ। নাকি এই বাড়িতে? সে কি আমার বাড়িতে? নাকি আমার মনে ছ্যা—কর ছ্যাক। ছ্যা—কর ছ্যাক। সবাই চলছে। এই বাড়িটা। আর আমরা এই বাড়ি-গাড়ির যাত্রী। কখন যে ইস্টিশন আসবে।

দু-কুঠারি-অলা উত্তরের ঘরের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকবার টিনের দরজা। ঘরটার তিনদিকে অনেকগুলো জানলা, পশ্চিমদিকের দেয়ালে লাগানো বাবুইয়ের টেবিলে একটা সরস্বতীর ছবি আর মাথা ধরার ওষুধ। বালিকার মাথা ধরে। পড়ার টেবিলের ওপর লণ্ঠনের আলো, বাবুইয়ের বাসা দিয়ে ঢাকা, আলোটা দেখা যায় না। কিন্তু

পঞ্চদশী বা ষোড়শীর চারপাশ দিয়ে আলোটা স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়। পশ্চিমের জানলাগুলো বন্ধ, পূবের জানলাগুলো খোলা, বাবুই পূবের জানলায় পেছন ফিরে বসে। তাই বালিকার মুখের চারপাশ দিয়ে আলোর স্রোত পূবের জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কোনো দর্শক থাকলে দেখত—বাবুইয়ের টেবিল-লণ্ঠনের আলো পূবের জানলা গলে এই টিনের দরজার ওপরে একটা কুয়াশার মতো আলোর আভা রচনা করেছে। যদি কোনো দর্শক থাকত, সে দেখত—ঐ লণ্ঠনের, আলোর সামনে বাবুইয়ের মুখের সীমারেখা দেখা যাচ্ছে (সেটাই কি পবিত্রতার বলয়? অথচ সে-রেখায় গোলত্বের ইঙ্গিত, ঈষৎ ভাঙচুরে অবয়বের বিশেষত্ব), আর তাতে অনেক উড়ো চুল। বাবুই জানে না ও একটা ছবি, ছবি জানে না সে একটা ছবি, দর্শক জানে মানুষ ছবি হয়, কবি জানে ছবি মানুষ হয় বাবুই গান গায়—তুমি কি কেবলি ছবি?

টিনের দরজা দিয়ে ঢুকে কুয়োপাড়ের বেড়া আর উত্তরের দেয়ালের মাঝখানে অন্ধকার বাঁশের বেড়ায় আঁকা একটা জানলা ও তার শিক। জানলার সামনে টেবিল, টেবিলের সামনে চন্দন। চন্দনের আঙুলের ডগা দাঁতের আগায়। পশ্চিমের দিকে পেছন করে পূবের দিকে মুখ করে চন্দন। লণ্ঠনের আলো তার মুখে আলোছায়া ফেলে চরিত্র রচনা করেছে। আলো-অন্ধকারের স্বেচ্ছাকৃত পতনে কী চরিত্র আসে? লণ্ঠনটা ডানদিকে, চন্দনের নাকটা উঁচু, তাই বাঁ চোখের কোণে অন্ধকার। স্যাণ্ডেগেঞ্জি, চওড়া কব্জি। খেলোয়াড়দের মতো ছোট চুল। চোয়াল দৃঢ়, চোখ অমন অদৃঢ় কেন? নখের আগা ছেঁড়ে কেন চন্দন? সম্মুখের জানলা দিয়ে বহির্গত আলোকস্রোতে অপসৃয়মান মানুষের মুণ্ডু-ধড় নেই। চন্দন ভীত?

অতঃপর একটুকরো উঠোনের বাঁয়ে রান্নাঘর, রান্নাঘরের বারান্দায় হবিষ্যিঘরের ভেতর কুপির অসংযত শিখা, ছায়া ফেলে—মোছে, আলো ফেলে—মোছে, বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সুতোর মতো আলোর রান্নাঘরের নিচু চালটারও ছায়া পড়তে পারত, যদি ছায়া ধরবার জন্য আকাশটা নিচে নামতে পারত, নিচে, ঠিক চালটার মাথার ওপরে। বারান্দার এক কোণে ঘুঁটে, কাঠ বস্তা, কয়লা—অন্ধকারে জড়াজড়ি, আলোর আকস্মিকতায় ত্রস্ত গল্পের সরাইখানার পথিকদের মালপত্রের মতো। হবিষ্যিঘরের ভেতর একটা ছোট আগুনের সামনে খাবার তৈরি করে সুধীরবাবুর স্ত্রী। কুপির পরিচিত আলোয় চৈত্রের বাতাসের মতো শিহরণে সুধীরবাবুর তিরিশ বৎসরব্যাপী স্ত্রী অপরিচিত হয়ে যায় কেন?

গোধুলিতে চরাচর স্পষ্ট। সন্ধ্যায় অপসৃত। ভাবো। সন্ধ্যাবেলা। ভাবো। ভাবতেই হবে, সন্ধ্যাবেলায়। আমি এবার ভাবব, বৌদির সঙ্গে দুটো কথার-কথা বলে, দক্ষিণঘরের বারান্দার চৌকির ওপর শুয়ে ভাবব—কী—কী ভাবব ভেবেছিলাম, আর এখন কী ভাবনা ভাবছি।

"কে?" বৌদির গলা শুনেই চোখ দুটো বোঝা যায়। ছোট উঁচু, পিঁড়ির ওপর

হাঁটু দুটো তুলে বসে, হাঁটুর ওপর বাহুর ভর, ডান হাতে খুন্তি জাতীয় কিছু। বাঁ হাতে কি? পায়ের শব্দ শুনেই কোমরের থেকে ওপরের অংশটা সোজা করে তুলেছেন, গলাটাও উঁচুও করে।

"আমি বিনয়"—রান্নাঘরের সিঁড়িতে বিনয় পা দেয়।

"বিনয়? এসো। বাড়ির সবাই ভালো তো"—বিনয়ের জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদির উর্ধ্বাঙ্গ শিথিল, বাঁ হাতে খড়ি ঠেলেন উনুনে। ফুলকি কয়েকটা, চোখ কুঁচকে মুখ সরানো, উত্থাপিত প্রশ্নের ভঙ্গি এতোক্ষণে মুখে ফুটিয়ে বিনয়ের দিকে চান। বিনয় সর্বদা এ প্রশ্নের জবাবে একটা "হুঁ" বলে চৌকাঠে বসে। বৌদি এ-প্রশ্ন কেন করেন, প্রতিদিন? অভ্যাসে? প্রতিটি দিনের কথা এক, এক। বেলা সেটা বোধহয় বোঝেন না। তাঁর মনের ঘনিষ্ঠতাই কণ্ঠে দূরত্বের সুর আনে।

"বো-সো"—উপবিষ্ট বিনয়কে বৌদি। বিনয় একটা কাঠি সংগ্রহ করার জন্য হাত প্রসারিত করে। টুকরোটা হাতে নিয়ে মেঝেতে আঁকি-বুঁকি কাটে। বৌদি কাঠিটাও দেখেন, আঁকিবুঁকিটাও। বিনয় কাঠিটা ফেলে দেয়।

"ইস্কুলে গিয়েছিলে?"—বৌদির প্রশ্ন। এরপর প্রশ্ন হবে, কী দিয়ে ভাত খেলে, তার আগেই উঠব। আর একজন কেউ এলে বৌদি ভালো আড্ডা মারতে পারবেন। তাঁর নিজের কোনো কথা নেই। বাপের বাড়ি থেকে তিরিশ বছর আগে যে কথাকটি শিখে এসেছিলেন—পাঁচ বছরেই তা ফুরিয়ে গেছে। এখানে, এই গেঁয়ো শহরটিতে, কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কথা যেখানে জন্মায়, সেই জায়গাটা বৌদির তৈরি হয় নি। বৌদি এমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? ভদ্রমহিলার চেহারায় একটা কৈশোর আছে, যা দেখলে বোঝা যায়, বাবুই-চন্দন-সোনা-রূপা-মীরা—এ নামগুলো তিনি রাখলেন কি করে। এখন তা নেই, কেন? উনুনের পাড়ে গরম? চোখে ধোঁয়া?

"সুবীর আসে নি?" বিনয় দাঁড়িয়ে বৌদিকে।

"না। চললে কোথায়?" বৌদি উনুনের দিকে চেয়ে বিনয়কে।

"ও-ঘরে আছি—সুধীরদা ফেরেন নি?"

"টুইশানিতে গেছেন।"

কি যেন ভাবব ঠিক করেছিলাম? সন্ধ্যাবেলায় ভাবনার ইতিহাস। প্রথম অধ্যায়—সোনা-রূপা-মীরা তথ্যের অভাব। দ্বিতীয় অধ্যায়—বাবুই। তৃতীয় অধ্যায়—আমি। চতুর্থ অধ্যায়—বৌদি। পঞ্চম অধ্যায়—সুধীরদা। বাবুই কী ভাবে?

বাবুই বলেছিল সুচিত্রা মিত্রের একটা ছবি এঁকে দিতে। দিই নি, দেবো না। বাবুই তুই পড়া ছাড়, গান ছাড়, কাপড়-চোপড় কাচ, রান্নাঘর ধো, হাতে হলুদের গন্ধ হোক, গায়ে মেখে লাল-সালুর স্বাগতমের নিচে দিয়ে বিগতম হ। নইলে তুই মরবি। যা, মর। হাসি পেল বিনয়ের, পেটে নয়, ঠোঁটে। বাবুই বসু---মরতে আসছে, বাঁচাবে কে? সন্ধ্যাবেলায় ঐসব কুভাবনা ভাবতে মানা, দক্ষিণ দুয়োরে যেতে মানা। দক্ষিণ

দরজা খুলে, মরেছ গো মরেছ। বিনয় বহুদিনের শয্যাশায়ী রোগীর ওষ্ঠের হাসির মতো নিজের হাসিটাকে দেখতে পেল। তাই কেমন রোগক্লান্ত ভাবনা ভাবল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সরস্বতীর ছবির পাশে মাথা-ধরার ওষুধের দিকে তাকিয়ে বাবুই কি সুচিত্রা মিত্রের কথা ভাবে? ভাবে। আবার এখন যা বয়েস, অন্য ভাবনাও ভাবে। সব ভাবনা জড়িয়ে মনটা বড়সড় হয়, মনটা বড় হয়ে হয়ে...। বাবুই সুচিত্রা মিত্রের ছবি চেয়েছে, আঁকব—তার আগে ওই গানটা শুনতে হবে—আর রেখো না আঁধারে মোরে দেখতে দাও—বাবুই, তোর 'আপনারে' কোথায়? আমায় দেখাবি? আমার 'আপনারে' ফক্কা। সারাজীবন শূন্য খোঁজা, হায় রে।

"বিনয়, চা দেবো?"

"না।"

বেলা এতক্ষণ কি বিচিত্রভাবে কিছু ভাবছিলেন না? না। বেলা চিন্তা নয়, শরীর। চৈতন্য নয়, অস্তিত্ব। আমিও তাই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে ব্যক্তি নগরে থাকে। আমার ছাব্বিশ বছরের পাপ আছে। আমি পঞ্চদশী সরলতা চেয়েছিলাম। বাবুই গানটা গা তো—'আমার আপনারে দেখতে দাও।'

এখানে স্টিমুলাস শরীরের। মনের? কোথায়? মন—একটুকরো ঘাস, এত কোমল, সরু—মন, তুমি কোথায়? ও মন, তুমি কোথায়? মন রে, তুই আমার দেহে আয়! আয়! আয় রে! আমার শুকনো দেহে ঝড় নেমে আয়। মন নেমে আয়! আয়!

মনের প্রসঙ্গে ঝড়ের কথা ভাবতেই আকাশ-সমুদ্র-পাহাড় সব মিলেমিশে তার মনে এক আশ্চর্য ছবি তৈরি করল। এত সব ছোটখাটো চেঁচামেচি শুনতে শুনতে বড় কিছু হারিয়ে যায়। বড়, বিস্তৃত, ওয়াইড, ওয়াইল্ড (ওয়াইডের সঙ্গে মিলবশতই ওয়াইল্ড এল, বিনয় তা বুঝেও সেটাকে নাকচ করল না), ওয়াইডের মধ্যে তো ওয়াইল্ডনেস থাকেই—কিছু না-থাকলে ছবি আঁকার ইচ্ছে জন্মাবে কোত্থেকে? এখানকার ছবি, লণ্ঠনের চারপাশে ভুতুড়ে মুখ, শিশুদের, চেনা যাবে না, মানুষের শরীরের রেখার ইঙ্গিত, রঙ; লাইনের আলোয় উজ্জ্বল রঙে ছায়া পড়ে, কিংবা বৌদির-কোমর থেকে ওপরের অংশের হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে ওঠা, কোনো পদশব্দে, দ্রোণলতার মতো রেখা, দুপায়ের মাঝে মুখগোঁজা কুকুর হঠাৎ চোখ তোলে, জন্তুও সুন্দর, চোখে মানুষী, কিন্তু বৌদির চেহারার সেই কৈশোরটা গেল কোথায়? বিনয় চোখ বুজে যেন খোদিত মূর্তির লুপ্ত রেখা খোঁজে। কোন রেখায় বৌদির কৈশোর?

খুব চড়া রঙে বড় কিছু, চওড়া কিছু, মস্ত কিছু, মস্ত কিছু। সম্মুখে সমস্ত বিষয়ের রেখা সঙ্কীর্ণ ও বর্ণ নিষ্প্রাণ। সুচিত্রা মিত্রের ছবিতে বাবুই কী দেখতে চায়। আমি কী দেখতে চাই! দেখতে দাও। আমার আপনারে।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা যক্ষপুরী—(অস্পষ্ট আলো, ত্রিকোণ আলো-ছায়া-

পাতে কখনো স্বর্ণস্তম্ভের, ক্বচিত্র মানুষ-শরীরের ইঙ্গিত, নন্দিনীর প্রসারিত কটি আঙুল, রক্তকরবীগুচ্ছের লাল-অসম্ভব জটিল, অসম্ভব, না); অবনীন্দ্রনাথের শাজাহান—(বড় মেলানকোলি, বিষণ্ণ, ফিগারগুলো যেন আছে কি নেই, রেখাগুলো যেন মুছে যেতে পারে, শীতকালে যেমন আয়নার ওপর নিঃশ্বাসের পরদা—সূক্ষ্ম, সয় না, সয় না); রবীন্দ্রনাথের নৃত্য—(প্রাচীন মিশরীয় এলিমেণ্টালিটি, হাতের আর পায়ের সরল ভঙ্গিতে; এলিমেণ্টালিটিই তো চাই, আহ্, এ-লি-মে-ণ্টা-ল, হ্রিক্রমন্ত্রোচ্চারণ, এ-লি-মে-ণ্টা-ল, লাউড রেখা কিন্তু রঙ এত জটিল কেন, ভঙ্গি ক্রমশ শয়তানের আরতির মতো কেন, আর মুখে যেন মৃতদেহের আধারের ওপর আঁকা গাত্র-চিত্রের অমানুষিকতা, মরে যাওয়া বেঁচে ওঠা কই, লাউড রঙে, লাউড রেখায়—বাবুই, এ-জন্যই তো তোর গান এত ভালোবাসি, লাউড গলা, উদার উদাত্ত, সুচিত্রার মতো, বাবুই, তুই সুচিত্রা মিত্র হবি। বাবুই, তুই সুচিত্রা মিত্র হবি?); নন্দলাল বসুর শিব—(না, না নাগো, না। অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে, এ-বড় দারুণ পরমাদ, প্রমাদ-না, না, নাগো না); যামিনী রায়ের জন্মাষ্টমী—(মরি মরি, বঙ্কিম-মুরলী ত্রিভঙ্গ মুরারী, ত্রিভঙ্গ কোথায়? শুধু এক হাঁটু বাঁকা, তাতে সমস্ত শরীরের ভার ঢলের মতো নেমেছে, বন্যার মতো; শালগাছের মতো ঋজুতা, একটি মাছের মতো চোখ, পুরো চোখটাই একটি পুরো মাছের মতো, স্বচ্ছতা, এত সরলতা, এত বিস্ময় আমার বইবার ক্ষমতা নেই); ভ্যান গগের ক্রোস অন দি স্টিম—(আহ্ আমায় বাঁচাও, আমি সইতে পারিনে এ-যন্ত্রণা, কালো কাক, আকাশের গতি, উদ্‌গ্রীব, পাখায়-পাখায় শৃঙ্খল, ঝড়, নিচে মহাকাব্যের নদী, হায়, এ আমি সইতে পারিনে, কে আছে আমায় বাঁচাও, হায় কে আমায় বাঁচাবে, কালো কাকের পাখার আড়ালে সূর্য নিরুদ্দেশ, এ অন্ধকারের টানে নিচের স্রোত কূলপ্লাবী, আমি অকূলেতে ভাসতে নারি, আমায় কূল দাও, বাসা দাও, বাবুই, তুমি কোথায়, কাকগুলো রক্তচোষা হয়ে যায়, আমার বুকে আর রক্ত নেই গো ওই কালো আঁধারে আমার খুনে মহাকাব্যের দরিয়া লাল হয়ে গেল—বাবুই তুমি কোথায়, মন তুমি কোথায়, আমার পাঁজড়া হয়ে যায়); নন্দলালের অর্জুন, অর্জুন. আহা, শায়িত অর্জুন, রাফ ড্রয়িঙ, রাফ রেখা, বিরাট মুখ, বিরাট বুক, উরু গোলাকারে নেমে গেছে জানুতে, জানু বক্র, এক কনুইয়ের ওপর ভর সে-বাহুর পেশী যেন স্থলপদ্মের পাপড়ি, আর-এক হাত আশ্রয়ের মতো বিদ্রোহের মতো সমস্ত শরীরের পেশীগুলোতে সচকিত ভঙ্গি যেন দুই থাবার মধ্যে মুখগোঁজা সিংহ মর্মরধ্বনিতে চমকে উঠেছে, পিঠ আশ্রয়ের মতো—অশ্বত্থ গাছের কাণ্ড যেন (আমি পেয়েছি গো, এলিমেণ্টাল আর লিরিক, আমি পেয়েছি গো আমি পেয়েছি, আমি ছবি আঁকব।—সমুদ্রের মতো রাফ, চরাচরের মতো সাজানো, এপিকের মতো মহৎ সে লিরিকের মতো করুণ, আমি আঁকব)। বাবুই, আমি অর্জুন।

এই প্রতিজ্ঞার মুহূর্তে বিনয় চোখ খুলে তাকিয়েই আবার বন্ধ করে নিল। মুহূর্তের

মধ্যে চোখ পড়ল রান্নাঘরের ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে গুটিগুটি পোকার মতো আলোর বিন্দু উঠোনে, উঠোনে রান্নাঘরের ছায়া, এ-ঘরের ভেতর থেকে আলো এসে চৌকাঠে গড়িয়েছে ভেজা শাড়ির মতো, ওদিকের দুটো ঘরের আলো কুয়াশার মতো। আমি পেয়েছি গো, আমি আঁকব—এই মন্ত্র জপতে জপতে চোখ খুলে, জপতে জপতেই বন্ধ করে, সে বুঝতে পারল—আর-এক শ্মশানের কান্না অনেক গভীরে, গভীর-রাতে বহু দূরের শিয়ালের ডাকের মতো, শোনা যাচ্ছে। লণ্ঠনের ভূতুরে আলোর চারপাশে ভাঙা রেখায় মুখ, লণ্ঠনের বিবর্ণ আলোতে উজ্জ্বল রঙগুলো ফ্যাকাসে, ভেজা শাড়ির মতো আলো, আলোর পোকার মতো আলো, দ্রোণলতার মতো শরীরের রেখা, হঠাৎ উপস্থিত কৈশোরের হঠাৎ নিরুদ্দেশ, বেড়ায় আঁকা ছায়ার জানলা আর দেয়ালের জানলার মাঝখানে কিশোরের বিব্রত চোখ, পেছন ফেরা কিশোরীর সামনে মাথাধরার ওষুধ বিনয়কে ঘিরে ধরে। করুণভাবে বিনয় যেন বলতে চাইল—আমি প্রসন্ন নারায়ণ বিদ্যালয়ের ড্রয়িঙ শিক্ষক, আমি আঁকব না, আমি ছবি আঁকব না।

"কে? বিনয়কাকা?"

"হুঁ।"

"চুপচাপ শুয়ে ?"

"কী করব, তোর পড়া হয়ে গেল?"

"ধুৎ, পড়তে ভালো লাগে না!"

"কি ভালো লাগে?"

"গান গাইতে।"

"গা।"

"না, মা বকবে।"

"বকবে না, আমি বলছি তো।"

"আজ নরেন কাকাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, ওদের নিচের তলার ব্যানার্জিরা গান শোনার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন।"

"কি কি গাইলি?"

"খুব ভালো লাগছিল।"

"কেন?"

বাবুই কোনো কথা বলে না।

উঠোনে, হবিষ্যিঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলা আলোর পোকার মতো আলো। ওরা দুজন পরস্পরে দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঐ আলোকবিন্দুচিহ্নিত জায়গাটিতেই বদ্ধদৃষ্টি। সেই জটিল রেখাচিত্রের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের মনে পড়ল আজ সারাটা দিন চৈত্রের মতো বাতাস দিয়েছে এলোমেলো। তার ফলে প্রকৃতিতেও তার দেহে একটি শূন্যতা বোধের জন্ম হয়েছে। বাবুই যেন অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা পাচ্ছে ঐ আলোক

বিন্দুচিহ্নিত জায়গাটির দিকে তাকিয়ে। তার চোখে মুখে এমন শোক যা সুদূরতার মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়। ঐ উঠোনটাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে এমন এক নৈশব্দ বিরাজ করতে শুরু করল যা যেকোনো মুহূর্তে শব্দ দীর্ঘশ্বাসে গর্ভপাত ঘটাবে। আর সেই সর্বনাশটাকে প্রতিরোধ করার জন্যই যেন ওরা দুজন চোখমুখের একরকম সঙ্গতভঙ্গিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করল। তখন দুজনেই চোখের সামনে একটা আর্তি নানা রূপ নিয়ে নানা আকারে ভেঙেচুরে আবার নতুন হয়ে নতুন ভাবে ভেঙে আবার নতুন গঠন নিতে লাগল।

হিস্টিরিয়ার রোগী যেমন কিছুক্ষণ অপার্থিব ও অনির্দেশ্যে কিছুর জন্য সংগ্রাম করে পার্থিব ও নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে অসহায়ের মতো তাকায়, ঠিক তেমনি করে এই দুজন এখন পরস্পরের দিকে চাইছে। বিনয় হাসল। যেন এমন কোনো মা—যার বুকে একটুও দুধ নেই। অথচ সন্তানরা দুধ চাইছে এবং একটি পুত্র আর স্বাস্থ্যবতী ও দুগ্ধবতী জননীর সন্ধান পেয়ে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি সে বাবুইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—"কই, বললি না তো, কি হলো নরেনবাবুর বাড়িতে?"

মুখের সম্মুখে হাঁটু আড়াল দিয়ে এতক্ষণ বাবুই নিজেকে গুটিয়ে বসেছিল, এবার সে ভঙ্গি বদলে জোড়াসনে বসল। একবার মাথা ঝাঁকিয়ে চুল-টুল কিছু ঠিক করল। আর, ওর গল্প শোনার জন্য বিনয় নিজের ভঙ্গি পরিবর্তন করল। আর বাবুই যেন জলপায়রা হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ একটা বিষাদের স্রোত পাক খেতে খেতে যেন বাবুইয়ের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, আর বাবুই চড়া গলায় গান ধরল—"নিশীথে কী কয়ে গেল মনে।"

প্রথম পাঁচটি শব্দের মধ্যেই বিষম তাল পড়ে ছন্দিত হয়ে উঠল। প্রথম "কী জানি" ধ্বনিত হলো খাদে, তরল স্বরে; দ্বিতীয় "কী জানি" ধ্বনিত হলো চড়ায়, তরলতর স্বরে। গম্ভীর তরলের বিপরীত সংঘাতে ব্যাকুলতা।

"সে কি ঘুমে"—সরল গম্ভীর 'ঘু'র ঊর্ধ্বগামী 'উ'-তে নিম্নগামী সহসা স্তব্ধ 'মে'-তে উৎ-কীর্ণ মৃগনাভি হরিণী, দ্রোণলতার মতো রেখা।

"সে কি জাগরণে"—জা-গ-রণে—প্রত্যেকটি শব্দের পর একটি করে ছোট্ট তরঙ্গ, আনন্দ-দ্বিধা-সংশয়-আগ্রহ। আবার সেই খাদে নিম্নস্বরে "কী জানি", চোখ বন্ধ। এই উঠোনে অন্ধকারের মতো অস্পষ্ট আলো, আমগাছটার জন্য চাঁদের আলো পৌঁচচ্ছে না।

"নানা কাজে নানা মতে ফিরি ঘরে, ফিরি পথে"—এ-ঘর থেকে ও-ঘর, ও-ঘর থেকে সে-ঘর, পথে, একা, আর সব সময় নিশীথে-দিবসে কী কয়ে গেল কানে। মিনুকে বিকেল ডাকে, আমার মুড়ির বাটিতে নারকেল তেলের গন্ধ। মাকে রাত্রিবেলায়—মা তোমার ঘুম আসে? "সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে"—বুঝি না, জানি না। নিজের শরীরের যে-অংশটা দেখতে পাই, তার অন্তরালে কোথাও নাকি

এই শরীরের অবস্থানের বাইরে কোথাও, হৃদয় নামে একটি স্থান আছে। যদি জানতেম! জানি না, বুঝি না। হাহাকার গো, হাহাকার। "সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়"—গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো একসঙ্গে চারটি ধ্বনি, শেষেরটি বিস্তৃত, "এ কি ভয়," আর সেটি ফিরে যেতে না-যেতে আর-একটা ঢেউ "এ কি জয়"—ঢেউয়ের পর ঢেউ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তটভূমি বিস্রস্ত, একটা প্রচণ্ড প্রার্থনা সমুদ্রতরঙ্গের মতো আঘাতে আঘাতে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে, ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র মাংস গলিয়ে, হাড়ের মজ্জা বের করে শিরার রক্ত বের করে, টকটকে লাল রক্তবর্ণের প্রবালদ্বীপ সৃষ্টির দ্বীপে গড়ে। আহ্ গড়ে, রক্তবর্ণ, আহ্ সৃষ্টি সৃষ্টি। পৃথিবী ভরা বাতাস তোলপাড়—সৃষ্টি। এ-লি-মে-ণ্টা-ল, লি-রি-ক্যা-ল। আমি ছবি আঁকব, আমি গান গাইব, আমি সমুদ্র দেখব। আহা গো বালিকা, গ্রীবা তুলে শুকনো ঠোঁটে কোন আগ্রহে কোন যন্ত্রণায় ক্রুশবিদ্ধ খৃস্টের পদতলে বসে আছ ভক্তের মতো? আহা গো, আমি এই অকাল-বার্ধক্যের ছাব্বিশে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চওড়া পিঠটাকে অ্যাটলাসের মতো রেখে গান শুনি কোন বিষাদে, কোন যন্ত্রণায়—নিশীথে, এ নিশীথে, কী কয়ে গেল মনে—সয় না, সয় না—' সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয় 'আর নয়' 'আর নয়'—স্তিমিত দৃষ্টি, ধ্যানের দৃষ্টি, অর্ধস্তিমিত নয়ন, শিবের ধ্যানের, দুই ভুরুর পাশে দুই লম্বা চুলের রেখা, বাঁশি বাজে, মনমাঝে না বনমাঝে? বাঁশিতে কে ডাকে, কী ডাকে, কী জানি, কী জানি,—"সে কথা কি নানা সুরে বলে মোরে চলো দূরে"—প্রতি চারটি শব্দের ছোট্ট তরঙ্গ, ধ্যানের কথা, অন্তরের কথা, উৎ-কর্ণ, মৃগনাভি হরিণী, প্রার্থনা তরঙ্গে, বিধ্বস্ত তটভূমির আত্মলয়, চলো দূরে দূরে—সমুদ্রসঙ্গমে, দূরে—মধ্য সমুদ্রে দূরে—সমুদ্রের মৃত্তিকায়, দূরে—নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তলে, দূরে—সমুদ্রতলের আকাশে! আমার শিরা থেকে রক্ত বের করে নাও, হাড় থেকে মজ্জা; একটি দৃষ্টির দ্বীপ, প্রবাল-দ্বীপ, রক্তবর্ণ আবেগের দ্বীপ রচনা করো। বাবুই বালিকা, আমার সকল পাপ করজোড়ে তোর পায়ে ঢালি।

পাহাড় থেকে নদী সমুদ্রে যায়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বাহিত পলিমাটিতে একটি দেশ, ভূগোলের একটি নাম, পৃথিবীর কয়েকটি মানুষ—নিসর্গের কয়েকটি শোভা রচনা করো। নদী সমুদ্রে যায় "চলো দূরে" মোহনা গঙ্গার মোহনা, কলকাতা একটি বন্দর, কলকাতা একটি নাম, সমুদ্রের কিনারে, তার পেছনে পাশে আরো কত নাম। কলকাতা, তারপর সমুদ্র। কলকাতা সমুদ্রের নিকটে ভাগীরথী তীরস্থিত একটি বন্দর—আসাম, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ তার পশ্চাৎভূমি। তারপর মধ্যসমুদ্র।

এই অন্ধকারে তারা দুজন রবীন্দ্রনাথের একটি গানের পাণ্ডুলিপি হয়ে যায়—কেটে দেয়া কথা, ভাঙা চরণ, ইতস্তত হস্তাক্ষর। আর অন্তর্বর্তী সুরে ভরাট।

এপ্রিল, ১৯৬০

Printed at Jupiter Offset Works, Shahdara, Delhi-110032